

কোয়ান্টাম বর্ষায়নে গুরুজী ও মা-জীর শুভেচ্ছা বাণী

কোয়ান্টাম পরিবারের প্রিয় সদস্য ও
শুভানুধ্যায়ী,
আসসালামু আলাইকুম।
শুভ কোয়ান্টাম বর্ষায়ন!

১ জানুয়ারি, ২০১৫ কোয়ান্টাম
শুরু করেছে ২৩ তম বছরের
শুভযাত্রা। এক অবিস্মরণীয় অর্জনের
মধ্য দিয়ে পূর্ণ হয়েছে ২২ তম বছর।
মেডিটেশনের নিরাময় ক্ষমতার
স্বীকৃতির প্রতীকী পদক্ষেপ হিসেবে
মেডিটেশন-সেবা থেকে আরোপিত
ভ্যাকু প্রত্যাহার এবং স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়
কর্তৃক হাইপারটেনশন নিয়ন্ত্রণে
মেডিটেশন চর্চাকে উৎসাহিত করতে
জাতীয় নীতিমালা প্রণয়ন জনমনে সৃষ্টি
করেছে নতুন আস্থা। ফলে শুরু হয়েছে
আত্মনির্মাণ ও আলোকিত জীবনের
পথে অভিযাত্রার এক বলিষ্ঠ অধ্যায়।
লাখো কণ্ঠে প্রতিদিন অনুরণিত হচ্ছে
আত্মপ্রত্যয়ের ধ্বনি-যা চাই তা-ই
পাব! আমি পারি আমি করব। লাখো
পরিবারে ভোরের শুভেচ্ছা শব্দ হচ্ছে
সালাম! সালাম! শান্তি! শান্তি!

কোয়ান্টামের এই দুই যুগের
যা-কিছু অর্জন তা সম্ভব হয়েছে
আপনাদের আন্তরিক ও নিরলস
প্রচেষ্টায়। স্রষ্টার সম্ভষ্টির জন্যে সৃষ্টির
সেবায় আপনাদের অর্থ সময় মেধা ও
শ্রমের নিঃস্বার্থ দানের ফলেই সম্ভব
হয়েছে কোয়ান্টাম মেথডের ৩৮০টি
কোর্স। আমরা সক্ষম হয়েছি রক্ত
দিয়ে সাড়ে ছয় লক্ষ মানুষের জীবনে
বাঁচার আশা সঞ্চার করতে। সম্পন্ন
করতে পেরেছি লক্ষাধিক শিশু-
কিশোরের খতনা, বঞ্চিত অবহেলিত
শিশুদের দিতে পেরেছি প্রত্যয়ী মানুষ
হওয়ার সাহস। আসলে ফাউন্ডেশনের
যা-কিছু অর্জন তার পুরো কৃতিত্বটাই
আপনাদের। তাই এই শুভক্ষণে
কোয়ান্টাম পরিবারের সকল
গ্রাজুয়েট, প্রো-মাস্টার, কোয়ান্টিয়ার,
আর্ডেন্টরিয়ার, মোমেন্টরিয়ার,
অর্গানিয়ার, এসোসিয়েট এবং সকল
স্তরের কর্মী ও শুভানুধ্যায়ীদের প্রতি
আমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। পরম
প্রভু আমাদের সবার কল্যাণময়
কাজকে সৎকর্ম হিসেবে কবুল করুন।

পরম করুণাময় নতুন বছরে
আমাদের জন্যে কল্যাণকর প্রতিটি
কাজ সুসম্পন্ন করার তওফিক দিন।
নিয়মিত মেডিটেশন, সাদাকায়ন ও
সৎকর্ম আমাদের আত্মশক্তির স্ফূরণ
ঘটাক। সকল কষ্ট রূপান্তরিত হোক
আনন্দে, সকল সমস্যা হোক নতুন
সম্ভাবনা। পরম করুণাময় আমাদের
সবার সহায় হোন।



কোয়ান্টাম বুলেটিন

জানুয়ারি ২০১৫

ব্যারিস্টার এম. আমীর-উল ইসলাম
সমাজ-সচেতন মানুষ
তৈরি করছে কোয়ান্টাম



দেহের বিভিন্ন অসুখের ফলে যেমন
রক্তক্ষরণ ঘটে, সমাজেও তেমনি আজ
নানাভাবে রক্তক্ষরণ ঘটছে। কিন্তু এই
রক্তক্ষরণ বন্ধ করার কার্যকর কোনো
উদ্যোগ কোথাও তেমনভাবে চোখে
পড়ে না। এজন্যে চাই মানবিক
দায়িত্ববোধসম্পন্ন সমাজ-সচেতন
মানুষ। আর এই সচেতনতাই জাতিকে
এগিয়ে নিয়ে যায়।

কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন তাদের
কাজের মধ্য দিয়ে সেই সমাজ-সচেতন
মানুষই তৈরি করছে। এরকম একটি
উদ্যোগের সাথে এই বিজয়ের মাসে
আমার যোগসূত্র তৈরি হলো বলে আমি
নিজেকে ধন্য মনে করছি।

১২ ডিসেম্বর জাতীয় প্রেস ক্লাবে
অনুষ্ঠিত ও কোয়ান্টাম স্বেচ্ছা রক্তদান
কার্যক্রম আয়োজিত রক্তদাতা সম্মাননা
অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথির বক্তব্যে
একথা বলেন বাংলাদেশের স্বাধীনতার
ঘোষণাপত্রের রচয়িতা, বাংলাদেশের
সংবিধানের অন্যতম প্রণেতা ও মহান
মুক্তিযুদ্ধের সফল সংগঠক বিশিষ্ট
আইনজীবী ব্যারিস্টার এম. আমীর-উল
ইসলাম।

তিনি আরো বলেন, আমরা

প্রায়শই বলে থাকি, বাংলাদেশে
লোকসংখ্যা বাড়ছে, কিন্তু কমে যাচ্ছে
মানুষের সংখ্যা। আর এ ঘাটতি
পূরণের ক্ষেত্রে অত্যন্ত জরুরি ভূমিকা
পালন করছেন স্বেচ্ছা রক্তদাতারা।
নিঃস্বার্থভাবে মানুষকে রক্ত দেয়ার
পাশাপাশি আপনারা সমাজকেও
বাঁচিয়ে রাখছেন।

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য দেন
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল
বিশ্ববিদ্যালয়ের সেন্টার ফর
প্যালিয়েটিভ কেয়ার-এর সমন্বয়ক
অধ্যাপক ডা. নিজামউদ্দিন আহমেদ।
তিনি বলেন, মুক্তিযোদ্ধারা যেমন আজ
সর্বত্রই সম্মানের আসনে অধিষ্ঠিত
তেমনি রক্তদাতারাও একদিন সমাজে
বিশেষ সম্মানের অধিকারী হবেন।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন
কোয়ান্টাম স্বেচ্ছা রক্তদান কার্যক্রমের
প্রধান সমন্বয়ক মাদাম নাহার আল
বোখারী। কমপক্ষে ১০ বার এবং
সর্বোচ্চ ২৫ বার রক্তদান করেছেন
এমন ২২৯ জন সিলভার ও গোল্ডেন
ডোনরকে বিশেষ আইডি কার্ড,
সার্টিফিকেট, ক্রেস্ট ও মেডেল দিয়ে এ
অনুষ্ঠানে সম্মাননা জানানো হয়।

বাংলা প্রমিত বাচনের
শিক্ষা সবার মাঝে
ছড়িয়ে দিতে হবে
অধ্যাপক ড. আনিসুজ্জামান



শিক্ষার সঙ্গে আনন্দের যোগ এখন
অনেকটাই ছিনু হয়ে গেছে। বাংলা
বাচন পরিশীলন কর্মশালায় সবাই
আনন্দের সঙ্গে শিখতে পারছে, এটা
নিঃসন্দেহে একটা বড় ব্যাপার। আশা
করি, যারা প্রমিত ও শৈল্পিক বাচনের
শিক্ষা নিচ্ছেন তারা এই শিক্ষাকে
অন্যদের মাঝে ছড়িয়ে দেবেন।

২৭ ডিসেম্বর কোয়ান্টাম
ফাউন্ডেশন আয়োজিত বাংলা বাচন
পরিশীলন কর্মশালার সনদপত্র বিতরণ
অনুষ্ঠানে এ কথাগুলো বলেন প্রধান
অতিথি বরেন্দ্র শিক্ষাবিদ ও ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়ের ইমেরিটাস প্রফেসর
ড. আনিসুজ্জামান।

তিনি আরো বলেন, কোয়ান্টাম
ফাউন্ডেশন বাংলা ভাষার শুদ্ধ উচ্চারণ
শেখা এবং বাংলা ভাষাভাষীদের মাঝে
তা ছড়িয়ে দেয়ার চেষ্টা করেছে।
তাদের এ প্রয়াসকে আমি অভিনন্দন
জানাই এবং প্রত্যাশা করি এ প্রচেষ্টা
অব্যাহত থাকবে।

২০১৩ সালের ৬ ডিসেম্বর যাত্রা
শুরু করে কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন
মিডিয়া সেল আয়োজিত বাংলা বাচন
পরিশীলন কর্মশালা। এ পর্যন্ত
সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে ১১টি ব্যাচ।

সনদপত্র বিতরণ অনুষ্ঠানে আরো
উপস্থিত ছিলেন কর্মশালার প্রশিক্ষক
বিশিষ্ট নাট্যজন এবং নাট্য ও বাচন
প্রশিক্ষক মো. গোলাম সারোয়ার ও
কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন মিডিয়া সেলের
আহ্বায়ক মোহাম্মদ মাহমুদুজ্জামান।
অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন কোয়ান্টাম
ফাউন্ডেশনের পরিচালক সমন্বয়
মিসেস সুরাইয়া রহমান।

কোয়ান্টাম মেথড

৩৮-১ তম কোর্স

১৬, ১৭, ১৮ ও ১৯ জানুয়ারি
(শুক্র, শনি, রবি ও সোমবার)

স্থান : ইনস্টিটিউশন অব ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্স
বাংলাদেশ (আইডিইবি), কাকরাইল, ঢাকা

ধ্যান আর সাধনার জগতে সিদ্ধপুরুষ শিবানন্দ বাবা। জীবনের সূচনালগ্নেই দেখেছেন দারিদ্র্যের নির্মম বাস্তব রূপ। চার বছর বয়সে বৈষ্ণব গুরু ওঙ্কারানন্দের সান্নিধ্যে আসেন এবং ১১ বছর বয়সে দীক্ষা গ্রহণ করেন। গুরু হয় নিজেকে জানা আর স্রষ্টাকে জানার পথে এক নিরন্তর যাত্রা। গুরু প্রসন্নতা লাভই ঈশ্বর লাভের প্রথম সোপান-এ কথাটিকে সত্য জেনে গুরুর নির্দেশে তিনি ৩৪ বছর ভ্রমণ করেন বিশ্বের নানা দেশ। সৃষ্টিকর্তার স্বরূপ উপলব্ধি আর মানবতার সেবাকে গ্রহণ করেন ব্রত হিসেবে। অতি সাধারণ জীবনযাপন আর আধুনিক মননের এক অনন্য সমন্বয় ১১৯ বছর বয়সী সাধক শিবানন্দ বাবা। আমরা এই মহাত্মার আরো দীর্ঘ কর্মময় জীবন কামনা করি।

শিবানন্দ বাবা

এক স্রষ্টার উপাসনা আর সৃষ্টির কল্যাণ করাই যার মূলমন্ত্র

আমাদের প্রত্যেকের জীবন স্রষ্টার ইচ্ছানুসারেই পরিচালিত হয়। আর এ কারণেই আমার সাধনার জীবন বেছে নেয়া। কারণ আমি মনে করি, এখানেই আমাকে প্রয়োজন। ১৯ ডিসেম্বর শান্তিনগরস্থ কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশনের কার্যালয়ে এ কথাগুলো বলেন সাধক শিবানন্দ বাবা।

শিবানন্দ বাবার জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য স্রষ্টার সন্তুষ্টি আর জগৎ-কল্যাণ। জন্মেছেন ১৮৯৬ সালের ৮ আগস্ট তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানের শ্রীহট্ট জেলার (বর্তমান সিলেট) হবিগঞ্জ মহকুমার বাছবল থানার হরিপুর গ্রামে এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ পরিবারে। তার বাবার নাম শ্রীনাথ গোস্বামী এবং মা ভগবতী দেবী। বাবা-মা আর দিদি মানুষের



দ্বারে দ্বারে শিক্ষা করে যা পেতেন তা-ই দিয়ে হতো খাবারের যোগান। তবে কোনোদিনই পেট ভরে খাওয়ার কথা মনে পড়ে না বাবা শিবানন্দের। শৈশবের প্রতিমুহূর্তেই তিনি উপলব্ধি করেছেন ক্ষুধার নির্মম জ্বালা।

১৯০১ সালে মাত্র চার বছর বয়সে তার শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির লক্ষ্যে মা-বাবা তাকে নবদ্বীপের এক বৈষ্ণব গুরু ওঙ্কারানন্দ গোস্বামীর হাতে অর্পণ করেন। ১৯০৩ সালে তিনি মা-বাবাকে দেখতে শ্রীহট্ট আসেন এবং জানতে পারেন, তার ছোটবেলার খেলার সাথি দিদি অনাহারে মারা গেছে। কয়েকদিন পর অনাহার-অর্ধাহারজনিত অপুষ্টি আর বিনা চিকিৎসায় তার মা-বাবাও ইহলোক ত্যাগ করেন একই দিনে। দাহক্রিয়ার সময় তিনি মা-বাবার মুখাগ্নি করেন নি। যে মা-বাবা তাকে পৃথিবীর আলো দেখিয়েছেন, তাদের মুখে অগ্নিস্পর্শ করার বেদনা তার হৃদয়কে ভারাক্রান্ত করে তোলে। প্রচলিত মুখাগ্নি প্রথা অস্বীকার করে তিনি মা-বাবার চরণে আগুন দেন।

এরপর তিনি ফিরে যান গুরু ওঙ্কারানন্দের আশ্রমে এবং ১৯০৭ সালে গুরুর কাছে দীক্ষা গ্রহণ করেন। গুরুর নির্দেশে ১৯২৫ থেকে ১৯৫৯ সাল পর্যন্ত ৩৪ বছর বিশ্বের বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ করেন বাবা শিবানন্দ। এর মধ্যে ফ্রান্স, গ্রিস, জাপান অন্যতম। ১৯৫৯ সালে তার গুরু ওঙ্কারানন্দের মৃত্যু হলে বাবা শিবানন্দ ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে আর্ত-পীড়িত মানুষের সেবায় বেরিয়ে পড়েন। ১৯৭৭ সাল থেকে ১৯৭৯ সাল পর্যন্ত তিনি বৃন্দাবনে অবস্থান করেন। এরপর তিনি কাশী চলে যান এবং সেখানেই বসবাস শুরু করেন।

চিরতরুণ্যে ভরপুর শিবানন্দ বাবার দিন শুরু হয় ভোর তিনটায়। জপ, যোগব্যায়াম, প্রাণায়াম, সবার মঙ্গলকামনা, দান, সেবা তার প্রতিদিনের কাজের অংশ। রাত নটায় তিনি ঘুমাতে যান। সেদ্ধ শাকসবজি আর সামান্য ভাতই বাবার মূল খাদ্য। দরিদ্ররা যা খেতে পায় না, সে খাবার তিনি খান না। তাই মিষ্টি, দুধ ও দুধজাত খাবার, ফলমূল এবং তেলভাজা ঝাল-মশলা খাবার তার খাদ্যতালিকায় কখনোই ঠাই পায় না। দিনে কমপক্ষে চার লিটার পানি পান

করেন তিনি। সাধারণ সাদা মার্কিন কাপড়ই হলো তার বসন।

সম্পূর্ণ সুস্থ এবং নীরোগ দেহের এই সাধক মানুষটি অত্যন্ত সাধারণ জীবনযাপন করেন। তিনি বলেন, ‘আমার কখনোই মনে হয় না যে, আমার বয়স ১১৯ বছর। আমার জীবন সুস্বাস্থ্য এবং সদানন্দে ভরপুর।’ একথার প্রতিফলন দেখা যায় তার স্বচ্ছন্দ-সাবলীল হাঁটাচলায়। তাকে দেখে যে-কেউ ধারণা করবে, বয়স বড়জোর ৭০-৭৫ হবে।

শিবানন্দ বাবা কর্মব্যস্ত থাকতে ভালবাসেন। শুধু ব্যক্তিগত জীবনেই নয়, তার কর্মব্যস্ততার নজির মেলে জীবনের নানা ক্ষেত্রে। এমনকি ২০১৪ সালে ভারতের বালিতে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম উদ্বোধনীর দিনে বাবা শিবানন্দকে দেখা যায় নিজ হাতে ঝাড়ু দিয়ে ময়লা পরিষ্কার করতে।

বাবা শিবানন্দ বলেন, ‘আমার জীবনে কোনো রোগ নেই, কামনা নেই, বাসনা নেই, দুঃখ নেই, চিন্তা নেই, সমস্যা নেই।’ কারো কাছ থেকেই নিজের জন্যে কোনো অর্থ অনুদান বা দক্ষিণা নেন না। এ প্রসঙ্গে তার অভিমত, ‘সবাই তো ভিক্ষুক।’ প্রত্যেকেরই শুধু চাই আর চাই। তাদের কাছ থেকে আমার কী নেয়ার আছে?’

মুক্তচিন্তার অধিকারী বাবা শিবানন্দকে কেউ তার ধর্ম সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি অকপটে বলেন, ‘এ বিশ্বব্রহ্মাণ্ড আমার ঘর। এর মানুষেরাই আমার মাতা-পিতা। মানুষকে ভালবাসা ও তাদের সেবা করাই আমার ধর্ম।’ তার এই মুক্তমন তাকে করেছে অনন্যসাধারণ। তিনি মনে করেন, সংস্কারের বেসাতি

নয়; বরং কল্যাণকর চিন্তা আর কাজকে উৎসাহিত করাই প্রতিটি ধর্মের মূল শিক্ষা। তাই তো শিবানন্দ বাবা প্রতিদিন ভোরে ঘুম থেকে উঠে ১৯ বার ‘শোকর আলহামদুলিল্লাহ’ বলেন। তারপর তিনি নারায়ণ মন্ত্র জপ করেন।

কোয়ান্টামের প্রতি শিবানন্দ বাবার স্নেহাৰ্দ্দ অনুভূতির অন্যতম কারণ-ধর্মবর্ণনির্বিশেষে প্রতিটি মানুষের কল্যাণে কাজ করছে কোয়ান্টাম। এর আগে ২০০৭ সালে শিবানন্দ বাবা এসেছিলেন কোয়ান্টামের কার্যালয়ে।

তার একজন ভক্তশিষ্য জানালেন, এবার ঢাকায় দেখা হওয়ার পরেই বাবার প্রথম কথা ‘আমরা শান্তি আশ্রমে কখন যাব?’

পরে সবাই বুঝতে পেরেছেন, তিনি গুরুজী শহীদ আল বোখারী মহাজাতকের সাথে সাক্ষাতের কথা বলছেন এবং কোয়ান্টামের নাম দিয়েছেন ‘শান্তি আশ্রম’। কোয়ান্টামের প্রতি এই অপর মমতার কারণেই ১৯ ডিসেম্বর, ২০১৪-চাকেশ্বরী মন্দিরে দিনব্যাপী অনুষ্ঠানে অত্যন্ত ব্যস্ত সময় কাটানোর পর কোনোরকম বিশ্রাম না নিয়েই চলে আনেন কোয়ান্টামের কার্যালয়ে।

সাধনার জগতে তিনি অতুলনীয় এক ব্যক্তিত্ব। তিন শতাব্দীর সাক্ষী হয়ে আছেন শিবানন্দ বাবা। তিনি মনে করেন, বিশ্বজুড়ে মানুষ আজ শুধু পণ্যের পেছনে ছুটছে। অর্থ উপার্জন আর ভোগের এই প্রতিযোগিতার ফলাফলই হলো মানুষের রোগগ্রস্ততা। এমনকি প্রকৃতির ভারসাম্য যে ক্ষয়িষ্ণু রূপ পেয়েছে, তার মূলেও রয়েছে মানুষের সীমাহীন লোভ আর লালসা। শিবানন্দ বাবা বলেন, ‘যে ব্যক্তি বাক্যের বেগ, মনের শক্তি, ক্রোধ, ক্ষুধা ও লোভ সংবরণ করতে পারেন, তিনিই স্রষ্টার সন্ধান লাভ করেন। স্রষ্টাকে প্রসন্ন করতে হলে দান এবং ধ্যান অবশ্যই করতে হবে।’

ভারতের বারাণসী কবির নগরে শিবানন্দ বাবার আশ্রম সব মানুষের জন্যে উন্মুক্ত। ২০১৩ সালে দ্য টাইমস অফ ইন্ডিয়ার সেপ্টেম্বর ৭ সংখ্যায় এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, ‘আমি কখনো আমার অনুসারীদের কোনো বিশেষ দেবদেবীর উপাসনা করতে বলি না। আসলে আমার বয়সের তুলনায় আমার শিক্ষা অনেক আধুনিক এবং দার্শনিক চিন্তাধারার। আমি আমার অনুসারীদের বলি এক স্রষ্টায় বিশ্বাস করতে এবং সহজসরল জীবনযাপন করতে, যে জীবনে থাকবে সৃষ্টির জন্যে ভালবাসা আর মমতা।’

‘I never ask my followers to worship certain Gods and Goddesses. In fact, my teachings are very contemporary and philosophical in contrast to my age. I tell them to believe in one God and lead a life of simplicity, love and compassion’ he said.

গুরুজীকে লেখা চিঠি

শ্রদ্ধেয় গুরুজী,
আসসালামু আলাইকুম। আমি একজন কোয়ান্টাম এসোসিয়েট। এবছর শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষায় মেধা তালিকায় উত্তীর্ণ হয়েছি। আমার এ প্রাপ্তিতে সৃষ্টিকর্তার নিকট অশেষ শোকরগোজার করছি। মেডিটেশন আর মনছবির মাধ্যমেই সম্ভব হয়েছে আমার এই সাফল্য।

কলেজে পড়ার সময় মেডিটেশন সম্পর্কে প্রথম জানতে পারি হোস্টেলের এক বড় আপুর কাছ থেকে। অটোসাজেশন আর মনছবি সম্পর্কে জেনে এ দুটো বিষয় আমার বেশ ভালো লাগল। এরপর সুযোগ হলো 'সাফল্যের চাবিকাঠি কোয়ান্টাম মেথড' বইটি পড়ার। বইটি পড়ার পর কোয়ান্টামের প্রতি আমার আগ্রহ অনেক বেড়ে গেল।

একটা সময় সাদাকায়ন কার্যক্রমে নিয়মিত অংশ নিতে শুরু করলাম। কোয়ান্টাম গ্রাজুয়েটদের সাফল্যের কথা আমাকে অনেক বেশি অনুপ্রাণিত করত। আমি মনছবি দেখতে শুরু করলাম যে, এইচএসসি-তে জিপিএ ৫ পাব। রেজাল্ট এলো ৪.৯০। এ রেজাল্টে ভেঙে পড়ি নি; বরং আত্মবিশ্বাস নিয়ে পরীক্ষার খাতা পুনর্নিরীক্ষণের আবেদন করলাম। আমার মনছবি বাস্তবরূপ লাভ করল। মহান আল্লাহর রহমতে আমি জিপিএ ৫ পেলাম। উপলব্ধি করলাম মনের শক্তি কত বড়! বিশ্বাস আর নিয়মিত মনছবিই নিশ্চিত বাস্তবতা নির্মাণ করে।

এরপর শুরু হলো পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে সুযোগ পাওয়ার জন্যে মনছবি দেখা। আমার সাথে বান্ধবী জুলফা বেগম মরিয়মও ভর্তি পরীক্ষার প্রস্তুতি নিচ্ছিল। দুজন একই সাথে সাদাকায়নে যেতাম এবং কোয়ান্টাম পরিবারের সবাই অনুপ্রেরণা দিতেন আমাদেরকে। তাদের উৎসাহে আমরা দুজনেই নিয়মিত মেডিটেশন করেছি।

বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি পরীক্ষা শনিবার হওয়ায়

পরিচিত কেউ কেউ পরীক্ষার আগের দিন সাদাকায়নে যেতে নিষেধ করলেন। কিন্তু আমার মন বলছিল, পরীক্ষার আগে একঘণ্টার সাদাকায়ন আমার জন্যে বেশি কল্যাণকর হবে। সাদাকায়নে সবাই আমাদের জন্যে প্রার্থনা করলেন। সেখানে বসেই মনছবি দেখলাম বিশ্ববিদ্যালয়ে চার প্রাপ্তিসহ আনন্দঘন মুহূর্তগুলো।

পরীক্ষার দিনও সকালে মেডিটেশন করে পরীক্ষা দিতে গেলাম। পরীক্ষার হলে বসেও মনছবি দেখলাম এবং কোনো দৃষ্টিশ্রী ছাড়াই পরীক্ষা দিলাম। পরীক্ষার পর অন্যরকম আত্মবিশ্বাস কাজ করছিল যে, ইনশাআল্লাহ সুযোগ পাব।

আমাদের হোস্টেলে আমি ও বান্ধবী মরিয়ম ছাড়াও আরো সাত জন পরীক্ষার্থী ছিল। কিন্তু আশ্চর্যজনকভাবে আমরা দুজনই শুধু বিশ্ববিদ্যালয়ে সুযোগ পেয়েছি। ঠিক তখনই বুঝলাম, একটা সুনির্দিষ্ট মনছবিই জীবনকে সাফল্যের দ্বারে পৌঁছে দিতে পারে। এখন আমি অনেক আত্মবিশ্বাসী। আমার বিশ্বাস, মেডিটেশনের সাথে সম্পৃক্ত থেকে আমি নিজে ভালো থাকার পাশাপাশি সৃষ্টির সেবায় কাজ করতে পারব।

দোয়া করবেন গুরুজী, কোয়ান্টামের মতো একটি মহৎ সংস্কে নিজেকে যেন সংযুক্ত রাখতে পারি এবং জীবনে সফল হয়ে হাজারো মানুষের সফলতার পথ তৈরি করতে পারি। শীঘ্রই যেন কোয়ান্টাম মেথড কোর্স করতে পারি এবং চারপাশের মানুষকেও আলোকিত করতে পারি।

মারজানা ইসলাম লান্ডলী

শিক্ষার্থী, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট



শ্রদ্ধেয় গুরুজী,

আসসালামু আলাইকুম। ৪ নভেম্বর ঢাকায় গ্রাজুয়েট ওয়ার্কশপ শেষে রাতের বাসে আমরা ১৫ জন রাজশাহীর উদ্দেশ্যে রওনা দিলাম। সিরাজগঞ্জে ফুড ভিলেজে যাত্রা বিরতি শেষে আবার রওনা দিলাম।

কয়েক মিনিট পরেই বাস এক্সিডেন্ট করল। আমাদের সবার সিট ছিল সামনের দিকে এবং কারো গায়ে একটা আঁচড়ও লাগল না। পেছনের বাম পাশের তিন জন স্পট ডেড এবং চার জন গুরুতর আহত। সংজ্ঞার সাথে থাকার কারণেই আল্লাহ আমাদের বাঁচিয়ে দিলেন। শোকের আলহামদুলিল্লাহ!

আমি ধূমপান করতাম। দিনে ১০-১৫টা সিগারেট খেতাম। সেদিন রাতের ধূমপানের চিন্তাই করছিলাম বাসে উঠে। সাধারণত আমি বাসের পেছনের দিকটায় কোনো সিটে বসেই ধূমপান করি।

কোয়ান্টামের সদস্যদের সাথে অর্থাৎ টিমের সাথে না এলে হয়তো সেদিনও তা-ই করতাম। কিন্তু ভাবলাম, যদি সংজ্ঞার বদনাম হয় বা গুরুজী যদি আমার ধূমপানের কথা কোনোভাবে জেনে যান, এই ভেবে আর ধূমপান করলাম না। আল্লাহর অশেষ রহমতে এ কারণেই আমি বেঁচে গেলাম। পেছনে বসা যে মানুষগুলো মারা গেছে, তাদের কথা যতবার মনে পড়ছে, আল্লাহর করুণাকে অনুভব করছি। কারণ আমারও তো সেখানেই বসার কথা ছিল।

গুরুজী, দোয়া করবেন যেন সারাজীবন সংজ্ঞার সাথে থাকতে পারি।

-(নাম প্রকাশ করা হলো না)

ক্যাসারের ঝুঁকি কমাতে পারে জীবনাচার

স্বাস্থ্যসম্মত জীবনাচরণ অন্তত চার ধরনের ক্যাসারের ঝুঁকি অনেকটাই কমিয়ে আনতে পারে বলে জানিয়েছেন বিশেষজ্ঞরা। ক্যাসার রিসার্চ ইউকে নামে একটি গবেষণা সংস্থার সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী, ধূমপানের মধ্যেই রয়েছে ক্যাসারের সর্বোচ্চ ঝুঁকি। এর পরেই রয়েছে অস্বাস্থ্যকর খাবার। গুরুত্বপূর্ণ বিবিসি অনলাইনে প্রকাশিত প্রতিবেদনে বলা হয়, ক্যাসার ঝুঁকি কমাতে অ্যালকোহল গ্রহণের পরিমাণ কমিয়ে আনা এবং নিয়মিত ব্যায়াম করার পরামর্শ দিয়েছে গবেষণা সংস্থাটি। তাদের গবেষণায় দেখা যায়, ২০০৭ থেকে ২০১১ সাল পর্যন্ত পাঁচ বছরে যুক্তরাজ্যে তিন লাখের বেশি নাগরিকের ক্যাসারের পেছনে ভূমিকা রেখেছে ধূমপান। এছাড়া এক লাখ ৪৫ হাজার নাগরিকের ক্যাসারের পেছনে মাত্রাতিরিক্ত প্রক্রিয়াজাত খাবারসহ অস্বাস্থ্যকর খাবারের যোগসূত্র পাওয়া গেছে। ক্যাসারের ৮৮ হাজার ঘটনায় স্থূলতাকে এবং ৬২ হাজার ২০০ ঘটনায় অ্যালকোহল গ্রহণকে ক্যাসারের ঝুঁকি হিসেবে শনাক্ত করা হয়েছে। এছাড়া সূর্যরশ্মির প্রভাবে ত্বকের ক্ষতি থেকে এবং কায়িক শ্রম না করাতেও ক্যাসারের ঝুঁকি রয়েছে বলে গবেষণায় পেয়েছেন গবেষকরা।

লন্ডনের কুইন মেরি বিশ্ববিদ্যালয়ভিত্তিক যুক্তরাজ্য ক্যাসার গবেষণা প্রতিষ্ঠানের তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষক অধ্যাপক ম্যাক্স পারকিন বলেন, "বিশ্বব্যাপী গবেষণায়ও ক্যাসারের ঝুঁকির পেছনে একই ধরনের কারণ শনাক্ত হওয়ায় মোটামুটি সন্দেহাতীতভাবে বলা যায়, নির্দিষ্ট স্বাস্থ্যকর জীবনাচরণ বেছে নিয়ে ক্যাসার-ঝুঁকি সবচেয়ে বেশি কমানো যায়। -বিবিসি

তথ্যসূত্র : বাংলাদেশ প্রতিদিন, ২৮ ডিসেম্বর ২০১৪

শ্রদ্ধেয় গুরুজী,
আসসালামু আলাইকুম। টিভি সিরিয়ালের নেতিবাচক দিক সম্পর্কে বিভিন্ন প্রোগ্রামে আপনি আমাদেরকে সচেতন করার চেষ্টা করেন। আপনার আলোচনায় বার বার শুনেছি-এই আসক্তি শুধু যে শারীরিক-মানসিক সুস্থতার জন্যেই ক্ষতিকর তা নয়; বরং পারিবারিক শান্তির জন্যেও বড় রকমের হুমকি।

গুরুজী, আপনার কথাগুলো যে কতটা সত্য তা উপলব্ধি করলাম সংবাদপত্রে প্রকাশিত একটি রিপোর্ট পড়ে। শিরোনাম-'স্টার জলসা দেখা নিয়ে মারামারি, হাসপাতালে স্বামী-স্ত্রী'।

ঘটনাটি সংক্ষেপে তুলে ধরছি-ভারতীয় টেলিভিশন চ্যানেল স্টার জলসার সিরিয়াল কিরণমালা দেখা নিয়ে নিজেদের মধ্যে মারামারি করে রক্তাক্ত হয়েছেন এক দম্পতি। আহত অবস্থায় তাদের হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। আহত স্বামীর নাম আবদুর রহমান। তিনি একজন রিকশাচালক। তার স্ত্রীর নাম লিপি।

হাসপাতালে চিকিৎসাধীন দম্পতির সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, কিরণমালা সিরিয়ালটি দেখতে দুপুরে বাড়ি ফেরেন রিকশাচালক আবদুর রহমান। রিকশা রেখে দুপুরে অনুষ্ঠান দেখতে বসেন তিনি। স্ত্রীর শত অনুরোধেও তিনি কাজে বের হচ্ছিলেন না। এ নিয়ে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কথা-কাটাকাটি থেকে হাতাহাতি হয়।

একপর্যায়ে আবদুর রহমান তার স্ত্রী লিপিকে ঘরের দরজার খিল দুই পাল্লা আটকানোয় ব্যবহার্য

কাঠের খণ্ড দিয়ে আঘাত করেন। এতে স্ত্রী ক্ষিপ্ত হয়ে স্বামীকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে আঘাত করেন।

হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আবদুর রহমান বলেন, 'স্টার জলসার কিরণমালা নাটকটা দেখার সময় স্ত্রী বার বার কাজে বের হতে বলে। একপর্যায়ে উল্টাপাল্টা কথা বলতে থাকে। মাথায় রক্ত উঠে যায়। ঘরের খিল দিয়ে ওর মাথায় বাড়ি মারি। পরে সে-ও ধারালো অস্ত্র দিয়ে আমার পায়ে কোপ মারে।'

গুরুজী, বর্তমানে চারপাশের মানুষের মধ্যে টিভি সিরিয়ালের এই আসক্তি দেখে মনে হয়, তা মাদকাসক্তির চেয়ে কোনো অংশেই কম নয়। সবচেয়ে বড় কথা, পরিবারের সুন্দর সম্পর্কগুলোর ওপর এর প্রভাব অত্যন্ত ভয়াবহ।

পরিবারের সবাই একসাথে বসে থাকে ঠিকই কিন্তু সবার চোখ থাকে টিভির পর্দায়, একে অন্যের প্রতি নয়। সবার মনোযোগ টিভি সিরিয়ালের নায়ক-নায়িকা আর তাদের অবাস্তব সুখ-দুঃখকে ঘিরে। পাশাপাশি বসেও যেন পরিবারের সবাই সবার থেকে অনেক দূরে।

গুরুজী, দোয়া করবেন। আর বিশেষভাবে অনুরোধ জানাচ্ছি, অবিদ্যার অন্ধকার আর ভ্রান্ত জীবনদৃষ্টির নাগপাশ থেকে সমাজের মানুষগুলোকে মুক্ত করার জন্যে ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে কিছু একটা করুন।

-শারমিন সুলতানা

শিক্ষার্থী, ৩৩৪ ব্যাচের গ্রাজুয়েট



কোয়ান্টাম শিশুসদন

শিক্ষা নৈতিকতা আর পরিপূর্ণ যত্নে বেড়ে উঠছে মেয়েশিশুরা

মাটির ব্যাংকে কোয়ান্টাম পরিবারের সদস্যদের সখিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দান আর সম্মিলিত সহযোগিতায় সম্ভব হয়েছে এই শিশুদের নিরাপদ আশ্রয় আর ভবিষ্যৎ নির্মাণে কাজ করা।

তাদের সার্বক্ষণিক দেখভাল ও লালনপালনসহ যাবতীয় তদারকিতে নিয়োজিত আছেন অর্গানায়ার, দায়িত্বশীল, সিস্টারসহ কোয়ান্টামমের নিবেদিতপ্রাণ মহিলা কর্মীরা। যাদের সাধ্যমতো চেষ্টায় এ শিশুরা বেড়ে উঠছে পারিবারিক স্নেহ-মমতায়।

মেধায় মননে আলোকিত আগামী

শিশুসদনে ওরা বেড়ে উঠছে প্রয়োজনীয় শিক্ষা ও সুযোগসুবিধা নিয়ে। শিক্ষা ও ক্রীড়া, মেধাসৃজন ও নৈতিক, যত্নায়ন ও সুস্বাস্থ্যায়ন-তিনটি ক্ষেত্রেই ওরা পাচ্ছে পরিপূর্ণ যত্ন ও মনোযোগ। দিনে দুই সেশনে শিশুদের পাঠদান করা হয়। বিকেলে প্রশিক্ষকের তত্ত্বাবধানে ওরা নিচ্ছে গান, নাচ ও আবৃত্তি প্রশিক্ষণ।

অবসর সময়ে মিলছে প্যারেড, ডিসপ্লে ও এথলেটিকসহ বিভিন্ন খেলাধুলা এবং শিশুতোষ চলচ্চিত্র ও ডকুমেন্টারি দেখার সুযোগ।

লেখাপড়ার পাশাপাশি মেডিটেশন, শিষ্টাচার ও সুবচন চর্চা অর্থাৎ নৈতিক শিক্ষা শিশুসদনের শিশুদের প্রতিদিনের অনুষঙ্গ। কোয়ান্টামমে প্রকৃতির নির্মল সান্নিধ্যে এই শিশুরা এক পরিবারের সদস্যদের মতো মিলেমিশে বেড়ে উঠছে।

প্রতিটি শিশুর হোক আত্মপরিচয়

সমাজে মেয়েশিশুদের ক্ষেত্রে প্রচলিত বৈষম্যের বাইরে এসে কোয়ান্টাম নিশ্চিত করতে চায় প্রতিটি শিশুর মেধাদীপ্ত সুন্দর বিকাশ। কারণ কোয়ান্টাম বিশ্বাস করে মেধার কোনো জাতি নেই, কোনো ধর্ম নেই, কোনো বর্ণ নেই। সঠিক পরিচর্যা আর সুযোগ পেলে যে-কোনো মানুষ নিজেই গড়ে নিতে পারে স্বনির্ভর জীবন, হতে পারে আরো লাঞ্ছনা মানুষের অনুপ্রেরণা।

যেভাবে যাত্রা শুরু

২০০৪ সালে যাত্রা শুরু করে কোয়ান্টাম শিশুসদন। ১৯ দিন বয়সী একটি মেয়েশিশুর দায়িত্ব নেয়ার মধ্য দিয়ে রাজশাহীতে কোয়ান্টাম শিশুসদনের কার্যক্রম শুরু হয়। এরপর একে একে এখানে আশ্রয় মেলে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা আরো ১১টি অভিভাবকহীন মেয়েশিশুর, যাদের সবাই ছিল ৩০ দিনের কম বয়সী।

২০১৪ সালের ফেব্রুয়ারিতে রাজশাহী থেকে ওই ১২টি মেয়েশিশুকে লামার কোয়ান্টামমে স্থানান্তরিত করা হয়। শুরু হয় আরো বড় পরিসরে কোয়ান্টাম শিশুসদনের এই কার্যক্রম। মেয়েশিশুদের পদচারণায় কোয়ান্টামম যেন পরিপূর্ণতা পায়। পরবর্তীতে তাদের সাথে যুক্ত হয় আরো এক ঝাঁক ফুটফুটে মেয়েশিশু। তাদের মধ্যে বাঙালি ছাড়াও রয়েছে মারমা, মুরং, খিয়াং, চাক ও সাঁওতাল শিশু। ওরা এসেছে দেশের তিনটি পার্বত্য জেলা, কক্সবাজার, রাজশাহী ও বগুড়া থেকে।

সম্ভবদ্ব প্রয়াসে শিশুদের আশ্রয়

শিশুসদনে বেড়ে ওঠা এসব শিশুদের কেউ মাতৃহীন, কেউ পিতৃহীন, কারো মা-বাবা কেউ-ই নেই, কেউ-বা আবার মা-বাবার বিচ্ছেদের শিকার। এমন নানা কারণে অনিশ্চিত হয়ে পড়েছিল ওদের ভবিষ্যৎ। কিন্তু কোয়ান্টামের উদার মুক্ত স্নেহমাখা পরিবেশে এসে ওরা কেউ আজ আর অভিভাবকহীন কিংবা অসহায় নয়। ফাউন্ডেশন নিয়েছে তাদের অভিভাবকত্ব।



প্রতিদিন দুই সেশনে চলছে কোয়ান্টাম শিশুসদনের শিশুদের পাঠদান কার্যক্রম



২০১৫ সালে নতুন আঙ্গিকে কোয়ান্টাম ওয়েবসাইট

সুস্থ দেহ প্রশান্ত মন কর্মব্যস্ত সুখী জীবনের বাণীকে বিশ্বমানসে ছড়িয়ে দিতে জানুয়ারি ২০১৫ সাল থেকে কোয়ান্টাম ওয়েবসাইট শুরু করবে এক নতুন যাত্রা। আইসিটিতে বিশ্বকে নেতৃত্ব দেয়ার মনছবি বাস্তবায়নের পথে আরো একধাপ এগিয়ে নতুন এ আত্মপ্রকাশে কোয়ান্টাম ওয়েবসাইট ছুঁতে যাচ্ছে নতুন মাইলফলক। সম্পূর্ণ নিজস্ব আর্কিটেকচারে তৈরি মাল্টিসাইট মেগা সিএমএসে ব্যবহার হয়েছে অত্যাধুনিক প্রযুক্তি, যা বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে একটি অনন্য পদক্ষেপ।

কোয়ান্টাম ওয়েবের ক্রমবর্ধমান অসংখ্য কনটেন্ট ম্যানেজমেন্ট ও সংরক্ষণের জন্যে প্রয়োগ করা হয়েছে বিগ ডেটা আর্কিটেকচার। রেস্টফুল সার্ভিসের মাধ্যমে মাইনটেইন করা হচ্ছে ডিসেট্রালাইজড ডোমেইনে ১৩টি সাইট ও আটটি ওয়েব অ্যাপ, যার সবগুলোই সিঙ্গেল পেজ অ্যাপ এপ্রোচে তৈরি।

এ মেগাসাইটের চারটি সাইট এর আগেই প্রকাশিত হয়েছে ৫ ডিসেম্বর ২০১৪, প্রো-মাস্টারদের ওয়ার্কশপ উপলক্ষে। আর নতুন বছরের প্রথম মাসে প্রকাশিত হতে যাচ্ছে এর আরো নয়টি সাইট। সবমিলিয়ে মোট ১৩টি সাইট হলো—

১. কোয়ান্টাম (quantum.qm.org.bd)
২. ব্লাড (blood.qm.org.bd)
৩. কোয়ান্টেক (ict.qm.org.bd)
৪. যাকাত (zakat.qm.org.bd)
৫. শিক্ষার্থী (student.qm.org.bd)
৬. হিলিং (healing.qm.org.bd)
৭. হার্টগ্রাব (heart.org.qm.bd)
৮. সাফল্য (success.qm.org.bd)
৯. পরিবার (family.qm.org.bd)
১০. কোয়ান্টাম ব্যায়াম (yoga.qm.org.bd)
১১. দান (charity.qm.org.bd)
১২. কোয়ান্টামম (quantumom.qm.org.bd)
১৩. কোয়ান্টা (quanta.qm.org.bd)

সহজ ও সংক্ষিপ্ত URL

নতুন এই সাইটগুলোর একটা বড় সুবিধা হলো এর সহজ ও সংক্ষিপ্ত URL. কোয়ান্টাম, ব্লাড বা হিলিংয়ের মতো প্রচলিত এবং জনপ্রিয় শব্দগুলো দিয়েই যাতে যে-কেউ

সাইটগুলোতে যেতে পারেন, সেজন্যেই এই সহজ ইউআরএল সুবিধা।

কম্প্যাক্ট

সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলোর

জন্মে পুরনো সাইটে

ছিল ৩০ টিরও বেশি পেজ।

ফলে প্রয়োজনীয় তথ্য

পেতে ব্যবহারকারীদেরকে

যেমন হাতড়াতে হতো এক পেজ থেকে আরেক পেজ-এ, তেমনি বিষয়ের পুনরাবৃত্তিও হচ্ছিল। কিন্তু নতুন সাইটে বিষয়গুলোকে বিন্যস্ত করা হয়েছে অনেক সুসম্মিত এবং ব্যবহার-বান্ধব করে। যেমন, কোয়ান্টাম, কোয়ান্টাম মেথড এবং মেডিটেশন মিলে হয়েছে কোয়ান্টাম সাইটটি। তেমনি সুস্থতার পথে, ভালো থাকুন এবং সদকা-হিলিং মিলে হয়েছে হিলিং। ফলে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি পাঠকরা পাচ্ছেন একসাথে।

দৃষ্টিভঙ্গি হোমপেজ

নতুন সাইটের হোমপেজটি খুবই আকর্ষণীয়। সাইটে ঢুকতে গেলে প্রথমে আসে কোয়ান্টামের চিরপরিচিত লোগো আর তার সাথে ‘দৃষ্টিভঙ্গি বদলান, জীবন বদলে যাবে’ বাণীটি। এরপর রয়েছে ‘সুস্থ দেহ প্রশান্ত মন কর্মব্যস্ত সুখী জীবন’— কোয়ান্টামের সবচেয়ে জনপ্রিয় অটোসাজেশন।

একবার ডাউনলোড করলেই আসে একনজরে ওয়েবসাইট দেখার আকর্ষণীয় এক স্লাইড, যেখানে প্রাসঙ্গিকতার বিবেচনায় ১৩টি সাইটকে প্রশান্তি, সুস্বাস্থ্য, সাফল্য, সেবা এবং আগামী শীর্ষক পাঁচটি শিরোনামে বিন্যস্ত করে তুলে ধরা হয়েছে। আলাদা আলাদা রং এবং ডিজাইনের কারণে এক নজরে সবগুলো সাইট সম্পর্কেই একটা ধারণা হয়ে যায় খুব সহজেই। প্রাসঙ্গিক বিষয়গুলোও এখানে এমনভাবে রাখা হয়েছে, যাতে মূল সাইটে না গেলেও একজন তার প্রয়োজনীয় বিষয়গুলো সহজে এখান থেকে পেয়ে যান।

নিজেকে যাচাইয়ের সুযোগ

ওয়েবসাইটে এবার আসছে বেশকিছু ইন্টারেকটিভ ফিচার, যার মাধ্যমে নানান আঙ্গিকে নিজের অবস্থান যাচাই করে নেয়ার সুযোগ পাবেন পাঠকরা।

১. যাকাত ক্যালকুলেটর— zakat.qm.org.bd তে গিয়ে আপনার সম্পত্তি ও দায়দেনার প্রয়োজনীয় তথ্যগুলো সংযুক্ত করে খুব সহজেই আপনি আপনার বছরের যাকাতের পরিমাণ বের করতে পারবেন।

২. ডোনার হেলথ চেক— blood.qm.org.bd তে গিয়ে ইন্টারেকটিভ এই হেলথ চেক-এর মাধ্যমে আপনি খুব সহজেই জানতে পারবেন আপনি রক্তদানে সক্ষম কিনা। আর না হলে কী করণীয়, জানতে পারবেন তা-ও।

৩. হেলথ এন্ড স্টাডি কুইজ— healing.qm.org.bd এবং student.qm.org.bd সাইট দুটিতে পাবেন স্বাস্থ্য এবং লেখাপড়া সংক্রান্ত বেশ কিছু কুইজ, যার মধ্য দিয়ে এ বিষয়গুলো সম্পর্কে নিজেকে মূল্যায়ন করতে পারবেন।

৪. ইয়োগা ফর ইউ— yoga.qm.org.bd সাইটে আছে ‘ইয়োগা ফর ইউ’ শিরোনামে একটি ইন্টারেকটিভ ফিচার, যার মাধ্যমে আপনার জন্যে প্রয়োজনীয় কোয়ান্টাম ব্যায়ামগুলোকে আপনি বেছে নিতে পারবেন।

নতুন আরো কিছু ফিচার—

১. student.qm.org.bd সাইটে শিক্ষায় সাফল্য নিয়ে একগুচ্ছ নতুন অনুভূতি ভিডিও, যা এবারই প্রথম প্রকাশিত হলো।



২. healing.qm.org.bd সাইটে রয়েছে সুস্থতার ক্ষেত্রে প্রাসিধো আর নাসিধো ইফেক্ট নিয়ে নির্মিত দুটি চমৎকার এনিমেটেড ভিডিও।

৩. heart.qm.org.bd সাইটে হৃদবান্ধব ও হৃদশত্রু খাবারের তালিকাসহ রয়েছে এমন কিছু প্রয়োজনীয় টিপস, যা হৃদরোগ প্রতিরোধ ও নিরাময়ের ক্ষেত্রে অত্যন্ত কার্যকর।

৪. family.qm.org.bd সাইটে প্রেম, বিয়ে, সংসার ও সন্তান প্রসঙ্গে নতুন বেশ কটি আর্টিকেল।

৫. বিশ্বখ্যাত যে-সব তারকারা মেডিটেশন করছেন তাদেরকে নিয়ে দৃষ্টিভঙ্গি একটি ফিচার পাবেন quantum.qm.org.bd সাইটে।

৬. quantumom.qm.org.bd সাইটটিকে একেবারে ঢেলে সাজানো হয়েছে। কোয়ান্টামের প্রাণিবৈচিত্র্যের চমৎকার বিবরণ রয়েছে এ সাইটে।

৭. নতুন ছবি ও ভিডিও ক্লিপের সমন্বয়ে সাজানো হয়েছে quanta.qm.org.bd সাইটটিকেও।

আসছে মোবাইল এবং ট্যাবের জন্যেও

শুধু ডেস্কটপ নয়, ডায়নামিক ইন্টারফেসে নির্মিত এই সাইটগুলোর প্রতিটিরই মোবাইল এবং ট্যাবভার্সনও করা হচ্ছে, যাতে যে-কোনো মিডিয়া দিয়েই সাইটগুলোকে পড়া যায়।

অ্যাপস

সাম্প্রতিক সময়ের জনপ্রিয় এই মাধ্যমটি নিয়েও কাজ করছে কোয়ান্টাম ওয়েবটিম। ওয়েবটিমের করা আল কোরআন অ্যাপটি ইতোমধ্যেই ব্যাপক জনপ্রিয়তা পেয়েছে। সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে অটোসাজেশন অ্যাপ। পর্যায়ক্রমে আসবে আরো বেশ কয়েকটি এন্ড্রয়েড ও আইফোন অ্যাপস।

প্রযুক্তির হাত ধরে বিশ্বজুড়ে সঠিক জীবনদৃষ্টি গড়ার আহ্বান ছড়িয়ে দেয়ার দীর্ঘ পথে যুক্ত হলো আরো কিছু পদচিহ্ন। প্রথমসারির অত্যাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে তথ্যসেবা পৌঁছে দিতে রচিত হলো নতুন মাইলফলক। এই অনুরণন ছড়িয়ে দিতে প্রযুক্তিনির্ভর ও সৃজনশীলতায় আত্মহী মানুষের প্রশান্তির ঠিকানা হয়ে উঠছে কোয়ান্টাম ওয়েবসাইট।



www.quantummethord.org.bd
http://qm.org.bd

জানুয়ারি, ২০১৫

কোয়ান্টাম
বুলেটিন

গ্রাজুয়েটদের প্রশ্ন » ? » উত্তর দিচ্ছেন গুরুজী

প্রশ্ন : কোয়ান্টাম নিয়ে কোনো অপপ্রচার হলে আমাদের করণীয় কী?

উত্তর : আমাদের করণীয়টা এক্ষেত্রে খুব সহজ। কোনো প্রতিবাদ বা জবাব নয়; বরং অপপ্রচারকে উপভোগ করবেন। আমার সামনে এখন আর কেউ অপপ্রচার করে না। পরিচিতও না, অপরিচিতও না। করলে নিঃসন্দেহে আমি তাকে সাধ্যমতো আপ্যায়ন করতাম।

যে-ই অপপ্রচার করবে, তাকে আপ্যায়ন করবেন যে, ভাই/আপা, আপনি বিস্কুট খান, চা-কফি খান, আমার খুব ভালো লাগছে শুনতে। যদি জিজ্ঞেস করে, শুনতে ভালো লাগছে কেন? বলবেন, আপনি যত বকাবকি করবেন, গালিগালাজ করবেন তত গুরুজীর গুনাহ মাফ হতে থাকবে। তাই আপনি আরেকটু বলেন। আপনি দেখবেন, আপনার সামনে এর পরে আর কোনোদিন সে কিছু বলবে না।

অপপ্রচার যিনি করেন তিনি গুরুত্ব পেতে চান। তিনি চান এর প্রতিবাদ করা হোক। এসব অর্থহীন কথাবার্তার প্রতিবাদ না করে একে উপভোগ করুন। দেখবেন, অচিরেই তার উৎসাহে ভাটা পড়ছে।

আর আপনি যে কাজটা ভালো বা কল্যাণকর বলে মনে করছেন, তার ব্যাপারে যে-কোনো রকম অপপ্রচারই হোক, কখনোই প্রভাবিত হবেন না। সবসময় ধৈর্য ধরবেন আর নীরবে নিজের কাজটুকু করে যাবেন। কারণ কাজই সবচেয়ে বড় সত্য প্রচারক। আর কিছুদিন পরে অপপ্রচারের ‘অপ’টা চলে যায়, কেবল প্রচারটা থাকে।

কোয়ান্টামের বিরুদ্ধে যে অপপ্রচার করছে, সে কিন্তু দশজনের কাছে আমাদের বাণী পৌঁছে দিচ্ছে। আমাদের কাজটা সে করে দিচ্ছে। এমনটা হয়েছে বলেই আমরা আজকের অবস্থানে আসতে পেরেছি। কারণ হাজার হাজার গ্রাজুয়েট আছে, যারা অপপ্রচার শুনে এসেছে—আচ্ছা এত বিপক্ষে বলে, গিয়ে দেখে আসি তো ব্যাপারটা কী! আমাদের অনেক সক্রিয় কর্মী এই অপপ্রচারের কারণে শুধু কৌতুহলবশত দেখতে এসেছিলেন। পরে তারা কোর্সে অংশ নিয়েছেন এবং তাদের ভুল ভেঙেছে। তাই এটা নিয়ে কখনো মাথা ঘামাবেন না। বরং উপভোগ করবেন।

মনে রাখবেন, যখন আপনি ভালো কোনো কাজ করতে যাবেন, প্রথম পর্যায়ে আপনাকে মানুষ তালিফ্য করবে, অস্বীকার করবে। যখন এটা করে সুবিধা করতে পারবে না তখন বিরোধিতা করবে, অপপ্রচার করবে—এটা দ্বিতীয় পর্যায়। তৃতীয় পর্যায় হচ্ছে, সেই মানুষই আপনার মিছিলে शामिल হয়ে যাবে। কারণ, সত্যের শক্তি প্রচণ্ড। আমরা আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করি যে, আমরা সত্যের পথে আছি, কল্যাণের পথে আছি। তাই কে কী বলল, না বলল তাতে আমাদের কিছু যায়-আসে না। এসব বলটা তখন যায়-আসে, যখন সক্রিয় অংশগ্রহণ না থাকে। কিন্তু কোয়ান্টামে আমরা একসাথে মিলেমিশে কাজ করছি এবং কী করছি তা-ও সবাই জানি।

আর অপপ্রচারকারীদের জন্যে সবসময় দোয়া করবেন, আল্লাহ যেন তাদেরকে সত্যিটা উপলব্ধি করার সুযোগ দেন। কখনো রাগ করবেন না। উত্তেজিত হবেন না। কারণ তারা না জেনেও কিন্তু আমাদের পক্ষে কাজ করছে এবং যখন জেনে কাজ করবে তখন আরো বেশি উৎসাহ নিয়ে করবে।

প্রশ্ন : ফাউন্ডেশনে বিনিয়োগের কোনো ব্যবস্থা আছে কিনা, যা সৃষ্টির সেবার পাশাপাশি নিজেদের আর্থিক নিরাপত্তাও দেয়?

উত্তর : বৈষয়িক লাভের জন্যে আর্থিক বিনিয়োগের কোনো সুযোগ ফাউন্ডেশনে নেই—এটা সুস্পষ্টভাবে মনে রাখবেন। প্রতারকদের কিন্তু মিষ্টি ভাষা থাকে। তারা আপনাকে বলতে পারে—কাউকে বলবেন না, গুরুজী খুব সিক্রেট একটা প্রোগ্রাম নিয়েছেন। তিনি খুব সিলেক্টেড লোকজনদের এতে বিনিয়োগ করার সুযোগ দিচ্ছেন। আপনি সেই ভাগ্যবানদেরই একজন। প্রথম পর্যায়ে এক লক্ষ টাকা দিন। তারপরে দুই লাখ, পাঁচ লাখ, দশ লাখ পর্যন্ত আপনি বিনিয়োগ করতে পারেন। এত এত লাভ। এটা আর কারো সাথে আলাপও করবেন না। এরকম কেউ বললে সাথে সাথে তাকে ধরে আইনের হাতে তুলে দেবেন। কেউ কোনো লোভে পড়বেন না।

চিন্তা করুন, একজন প্রতারকের ভাষা কত চমৎকার হলে, কত মিষ্টি হলে ফ্রান্স-এর জাতীয় প্রতীক আইফেল টাওয়ার বিক্রি করে দিতে পারে। এক প্রতারক এটি সাত বার বিক্রি করেছে সাত জনের কাছে। অষ্টম বারে গিয়ে ধরা পড়েছে। এত টাকা দিয়ে কিনে যারা আহাম্মক হয়েছেন, কেউ এটা প্রকাশ করতে চান নি—টাকা গেছে যাক, মানসম্মান তো এখনো আছে। যদি লোকজন জানে যে, আমি আইফেল টাওয়ার কিনে ফেলেছি, তাহলে তো মানসম্মানও থাকবে না।

অতএব কখনো প্রতারণায় পড়বেন না। আর যে-কোনো আর্থিক বিনিয়োগের ব্যাপারে কোরআনের নির্দেশ কিন্তু খুব পরিষ্কার—সমস্ত চুক্তি লিখিতভাবে করবেন। কোনো মৌখিক অঙ্গীকার নয়। এছাড়াও যে-কোনো বিনিয়োগের আগে খুব চিন্তাভাবনা করে, যে প্রস্তাব নিয়ে এসেছে তার সবরকম খোঁজখবর নিয়ে তারপরে বিনিয়োগ করবেন।

আর ফাউন্ডেশনের কথা যদি বলেন, এখানে যত বিনিয়োগ সব পরকালীন কল্যাণের জন্যে। পরকালীন কল্যাণে আপনি যত খুশি অর্থ বিনিয়োগ করতে পারেন এবং এটা সাদকায়ে জারিয়া হয়ে থাকবে।

প্রশ্ন : আপনি কোর্স রিপোর্ট করতে বলেছেন, কিন্তু একই আলোচনা দ্বিতীয়বার শোনার প্রয়োজন কী?

উত্তর : কোয়ান্টাম মেথড কোর্স কোনো আলোচনা নয়। এটা হচ্ছে জীবনকে আপনি কোন দৃষ্টিতে দেখবেন, কীভাবে জীবনটাকে সুখী করবেন তার একটা ম্যানুয়াল। চার দিন যখন আপনারা কোর্সে থাকেন শুধু ভালোলাগা সৃষ্টি হয়। যেমন, বিয়ের প্রথম রাতে স্বামী/স্ত্রীকে পুরোপুরি বোঝা যায় না, শুধু ভালোলাগা সৃষ্টি হয়।

কোর্সের চার দিনও আপনার ভালোলাগা সৃষ্টি হয়—ভালো জিনিসের প্রতি, ভালো জীবনের প্রতি, সুন্দর জীবনের প্রতি। আমিও পারব—এই বিশ্বাসটা আপনার মধ্যে আসে। কিন্তু পারার যে প্রক্রিয়া, এই প্রক্রিয়াটা চার দিনে আয়ত্ত করা যায় না। কারণ এটা তো সারাজীবনের অঙ্ক মেলানোর প্রক্রিয়া। তাই প্রথমবার যারা কোর্স করলেন, পরবর্তী ৬০ দিনের মধ্যেই তারা রিপোর্ট করবেন।

কারণ কোয়ান্টাম মেথড কোর্সে যখন কেউ অংশ নেন, সাধারণত কোনো না কোনো সমস্যা নিয়ে তিনি

আসেন। তা শারীরিক, মানসিক, পারিবারিক বা পেশাগত হতে পারে। কোর্সের চার দিনে তার পুরো মনোযোগ থাকে সেই বিষয়টিকে ঘিরেই। ফলে কোর্সে বলা জীবনের আরো অনেক প্রয়োজনীয় বিষয় তখন তার দৃষ্টি এড়িয়ে যায়।

কোর্স সম্পন্ন করার পর একজন মানুষ আত্মপ্রত্যয়ী হয়ে ওঠেন এবং ইতিবাচক শক্তিতে উজ্জীবিত হন। এই শক্তি আর উদ্যমকে ধরে রাখার জন্যে এবং চারপাশের নেতিবাচকতা থেকে মুক্ত থাকার জন্যেও কোর্স রিপোর্ট-এর কোনো বিকল্প নেই। তাই পরিপূর্ণ জীবনদৃষ্টি পেতে বার বার কোর্স রিপোর্ট করা প্রয়োজন।

একটা ভালো বইয়ের কথাই ধরুন। যে-কোনো ক্লাসিক বই যখন আপনি কয়েকবার পড়বেন, আপনি এর মর্মে ঢুকতে পারবেন। ন্যূনতম হাম্পসনের একটা ছোট্ট বই আছে *হাস্পার*। এটা যদি ১০ বার পড়েন, ১০ রকম মনে হবে।

আর কোয়ান্টাম মেথড কোর্স তো জীবনের ম্যানুয়াল। যত রিপোর্ট করবেন তত আপনার উপলব্ধি শাণিত হবে। তত আপনি এটা আপনার জীবনে প্রয়োগ করতে পারবেন। আর রিপোর্ট ফি-টা হচ্ছে সদকা। বিশেষ নিয়ত করে কোয়ান্টাম ফান্ডে আপনি সদকা দিয়ে মানি রিসিট নিয়ে নেবেন। এবং সেই বিশেষ নিয়তে আপনি রিপোর্ট করবেন।

প্রশ্ন : আমার মনছবি হলো, আমি প্রথম বাংলাদেশি অস্কারজয়ী অভিনেত্রী হবো। আমি ওয়ার্ল্ড ফেমাস সুপারস্টার হতে চাই। অনেকেই বলে মিডিয়া ভালো না; অভিনেতাদের অনেক গুনাহ হয় ইত্যাদি। কিন্তু আমি যদি নিজের কাছে সৎ থাকি ও আমার আয়ের অনেক অংশ দান করি, তাহলেও কি অভিনয় করা খারাপ?

উত্তর : আপনি যদি ঠিক থাকেন, খুব ভালো। আর অস্কার শুধু একটা কেন, নিজেকে সেই মাত্রায় আপনাকে নিয়ে যেতে হবে যে, অস্কার আমার পেছনে ঘুরবে, আমি অস্কারের পেছনে না। চারটা, পাঁচটা অস্কার আসবে আর আপনি চিন্তা করবেন যে, নেবেন কি নেবেন না, যাবেন কি যাবেন না। অর্থাৎ নিজের ভেতরে এই বিশ্বাসটাকে প্রবল করতে হবে। আর আপনি যদি আপনার অভিনয় পেশায় দক্ষতা অর্জন করতে পারেন অর্থাৎ অভিনয়ের ক্ষেত্রে যদি আপনি আপনার মেধার চূড়ান্ত বিকাশ করতে পারেন তো যে-কোনো কিছু অর্জন সম্ভব।

কিন্তু এটা অবশ্যই অত্যন্ত পরিশ্রমের কাজ। অভিনয়টাকে কিন্তু খুব আরামের কাজ মনে করবেন না। অভিনয় একটা বিশাল আর্ট। অতএব অভিনয় করতে চাইলে অবশ্যই সেরা হওয়ার মনছবি করা উচিত, সেজন্যে পরিশ্রম করা উচিত এবং কষ্ট না মনে করে পরিশ্রম করা উচিত।

এ মাসের অটোসাজেশন

আমি পারব, আমি করব।
উদ্যমী হয়ে কাজকে ভালবেসে
আমি সফল হবো।

সিলেট ও রাজশাহীতে কোয়ান্টাম ওয়ার্কশপে গুরুজী

সাফল্যের নেপথ্য শক্তি বিশ্বাস শ্রমানন্দ ও সজ্জায়ন



সিলেটে হোটেল স্টার প্যাসিফিক মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত ওয়ার্কশপে অংশগ্রহণকারী গ্রাজুয়েট ও প্রো-মাস্টারদের একাংশ

সাফল্যের মূল অন্তরায় হলো মানুষের অন্তর্গত নেতিবাচকতা। যদি কাউকে বলা হয়, আপনি এটা পারবেন না; তিনি মেনে নেবেন যে, হ্যাঁ, এটা আমি পারব না। কিন্তু যদি বলা হয়, আপনি এটা পারবেন, তখনই তার মধ্যে সন্দেহ-সংশয় দেখা দেয় যে, আমি কি সত্যিই এটা পারব? পারা নিয়ে আমাদের মধ্যে প্রশ্ন আছে, কিন্তু না-পারা নিয়ে আমাদের মধ্যে কোনো প্রশ্ন নেই। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সাফল্যের জন্যে প্রয়োজন বিশ্বাস। এ বিশ্বাস হতে হবে নিজের সামর্থ্য, নিজের যোগ্যতা আর নিজের শক্তির ওপরে।

১৬ ডিসেম্বর সিলেটে হোটেল স্টার প্যাসিফিক মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত দিনব্যাপী ওয়ার্কশপে গ্রাজুয়েট ও প্রো-মাস্টারদের উদ্দেশ্যে এ কথাগুলো বলেন গুরুজী শহীদ আল বোখারী মহাজাতক। তিনি আরো বলেন, আমরা যা চাই তা পাওয়ার জন্যে যে গুণটি অর্জন করা প্রয়োজন তা হলো, নিজের কথা বলতে

পারা এবং অন্যের কথা বুঝতে পারা। আরেকজন যা বলছেন শুধু তা-ই নয়, যা বললেন এবং যা বললেন না, দুটোই বুঝতে হবে। আর এটা তখনই সম্ভব হবে যখন আমরা মনোযোগী শ্রোতা হতে পারব।

লক্ষ্য ও মনছবির গুরুত্ব প্রসঙ্গে গুরুজী বলেন, সূরা বাকার-র ১৪৮ নং আয়াতে আল্লাহ তায়াল্লা খুব স্পষ্টভাবে বলেছেন, 'প্রত্যেকেরই একটি লক্ষ্য আছে; যা তার কর্মধারাকে পরিচালনা করে'। আপনার লক্ষ্য স্থির হয়েছে কিনা এটা বোঝা যাবে আপনার কর্মধারা দেখে। এই কর্মধারা বা নিরলস পরিশ্রমই হচ্ছে সাফল্যের প্রক্রিয়া।

২৫ ডিসেম্বর রাজশাহী শিল্পকলা একাডেমি মিলনায়তন ও সরকারি কর্মচারী কল্যাণ অডিটোরিয়ামে গুরুজীর পরিচালনায় অনুষ্ঠিত হয় দিনব্যাপী ওয়ার্কশপ। ভিডিও কনফারেন্স-এর মাধ্যমে রাজশাহীতে অনুষ্ঠিত সর্ববৃহৎ এ ওয়ার্কশপে

গুরুজী বলেন, আমি যা চাই তা আমাকেই অর্জন করতে হবে। গ্রহীতা নয়, সবসময় দাতা হতে হবে। কারণ পৃথিবীতে যারা দাতা হয়েছেন, তারাই ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়েছেন। সে দান জ্ঞান হতে পারে, প্রযুক্তি হতে পারে, অর্থ হতে পারে, সেবামূলক কাজ হতে পারে।

গুরুজী আরো বলেন, অন্তর্গত নেতিবাচকতা দূর করার পাশাপাশি পারিবারিক শান্তির দায়িত্বও নিজেকে নিতে হবে। বর্তমানে পরিবারগুলোতে অশান্তির মূল কারণ-মা-বাবার ভ্রান্ত জীবনদৃষ্টি, টিভি সিরিয়াল আর ফেসবুক। মা-বাবা সন্তানদের আদর-আল্লাহ দিচ্ছেন কিন্তু তাদেরকে সঠিক জীবনবোধ দিতে পারছেন না, শিষ্টাচার শেখাতে পারছেন না।

সফল জীবন ও সুখী পরিবার গড়তে প্রয়োজন ইতিবাচকতা এবং সঙ্গে একাত্মতা। কারণ কল্যাণের প্রতি, ভালোর প্রতি আগ্রহকে স্থায়ী করে সংস্কার।

সিলেট ও রাজশাহীতে অনুষ্ঠিত ওয়ার্কশপ দুটিতে গ্রাজুয়েট ও প্রো-মাস্টারদের মাঝে ছড়িয়ে পড়ে সঙ্গে একাত্মতা আর ইতিবাচকতার অনুরণন। রাজশাহীতে মিলনায়তনের বাইরে আয়োজন করা হয় মেডিটেশনভিত্তিক আলোকচিত্র প্রদর্শনী এবং গ্রাজুয়েট ও প্রো-মাস্টারদের শিশুসন্তানদের নিয়ে আনন্দ-আয়োজন-কিডস কর্নার।

সাফল্যদীপ্ত নতুন বছরের প্রত্যাশা আর ইতিবাচক শক্তির স্করণে ওয়ার্কশপ দুটি পরিণত হয় কোয়ান্টাম পরিবারের অনবদ্য মিলনমেলায়।



রাজশাহীতে শিল্পকলা একাডেমি মিলনায়তনের বাইরের চত্বরে আয়োজন করা হয় মেডিটেশনভিত্তিক আলোকচিত্র প্রদর্শনী

বান্দরবান রাজবিলায় ফ্রি ফ্রাইডে ক্লিনিক উদ্বোধন ও ৩৫৫ জন শীতাত্তের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ



১৮ ডিসেম্বর বান্দরবান রাজবিলায় কোয়ান্টাম ফ্রি ফ্রাইডে ক্লিনিক ও ফাস্ট এইড সেন্টারের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হয়। একই সাথে কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন-এর উদ্যোগে ৩৫৫ জন শীতাত্ত মানুষের

উপস্থিত ছিলেন। আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনের আগেও কোয়ান্টামের উদ্যোগে নিয়মিত চিকিৎসাসেবা দেয়া হয়েছে স্থানীয় আদিবাসী ও বাঙালিদের। এখানে প্রতি সপ্তাহে চিকিৎসাসেবা নেন প্রায় তিন শ মানুষ।

আবশ্যিক

কোয়ান্টাম কসমো স্কুল ও কলেজের জন্যে শিক্ষক/শিক্ষিকা/আবাসিক শিক্ষক (ন্যূনতম অনার্স পাশ), বিজ্ঞান বিভাগের জন্যে (পদার্থ বিজ্ঞান, রসায়ন, জীব বিজ্ঞান, উচ্চতর গণিত) শিক্ষক/শিক্ষিকা আবশ্যিক। বিএড ও নিবন্ধনকৃত প্রার্থীরা অগ্রাধিকার পাবেন। শিশুকানন ও শিশুসদনের শিক্ষার্থীদের দেখাশোনার জন্যে ব্রাদার, সিস্টার (ন্যূনতম এসএসসি পাশ) ও সিকিউরিটি গার্ড আবশ্যিক।

এছাড়াও কোয়ান্টাম-এর জন্যে কিছু সংখ্যক ডিপ্লোমা কৃষিবিদ, মালি, মাঠকর্মী প্রয়োজন। আগ্রহীরা যোগাযোগ করুন :

কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন

৩১/ভি শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদীন সড়ক,
শান্তিনগর, ঢাকা-১২১৭

দেশের সর্ববৃহৎ ব্লাড ক্যাম্প ও সর্বোচ্চ সংগ্রহ

কেয়া গ্রুপে একদিনে সংগ্রহ ১,৪০৬ ব্যাগ রক্ত



১৮ ডিসেম্বর কেয়া গ্রুপের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয় দেশের সর্ববৃহৎ ব্লাড ক্যাম্প। কোয়ান্টাম স্বেচ্ছা রক্তদান কার্যক্রম আয়োজিত দিনব্যাপী এই ব্লাড ক্যাম্পে সংগৃহীত হয় মোট ১,৪০৬ ব্যাগ রক্ত। রক্তদাতাদের মধ্যে পুরুষ ছিলেন ১,০৪৭ জন এবং মহিলা ৩৫৯ জন।

কেয়া নিট কম্পোজিট লি. প্রাঙ্গণে সকাল ৮টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত ছিল রক্তদানের উদ্দেশ্যে কেয়া গ্রুপের সর্বস্তরের কর্মীদের উপচে পড়া ভিড়।

২০১৩ সালের ৩০ ডিসেম্বর একই স্থানে আয়োজিত কোয়ান্টাম ব্লাড ক্যাম্পে মোট সংগ্রহ ছিল

১,০০২ ব্যাগ রক্ত, যা ছিল ২০১৩ সাল পর্যন্ত একদিনের ক্যাম্পের সর্বোচ্চ সংগ্রহ। তাদের এই আন্তরিক প্রচেষ্টা এবং অর্জনের জন্যে কোয়ান্টাম স্বেচ্ছা রক্তদান কার্যক্রমের পক্ষ থেকে কেয়া গ্রুপ-কে বিশেষ সম্মাননা ক্রেস্ট প্রদান করা হয়। প্রতিষ্ঠানের পক্ষে এ সম্মাননা ক্রেস্ট গ্রহণ করেন কেয়া গ্রুপের জিএম জনাব মিজানুর রহমান খান।

২০০৯ সালে কেয়া গ্রুপে প্রথমবারের মতো আয়োজন করা হয় কোয়ান্টাম ব্লাড ক্যাম্প। সে বছর মোট সংগ্রহ ছিল ১০২ ব্যাগ। তারপর থেকে রক্তদানে কর্মীদের উদ্বুদ্ধ করতে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে

নানা ধরনের সচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে তারা।

স্বেচ্ছা রক্তদানের এই সুবিশাল কর্মসূচিতে অন্যতম সহযোগী হিসেবে কাজ করেছেন কেয়া গ্রুপের এক্সিকিউটিভ মো. মামুনুল হক এবং আরো একঝাঁক নিবেদিতপ্রাণ কর্মী। সর্বস্তরের কর্মীদের রক্তদানে অগ্রহী করে তোলা এবং নিয়মিতভাবে ব্লাড ক্যাম্প আয়োজনের নেপথ্যে কাজ করে যাচ্ছেন কেয়া গ্রুপের ডিরেক্টর মাসুম পাঠান।



স্বেচ্ছা রক্তদানে বিশেষ অবদান রাখার জন্যে ১২ ডিসেম্বর, ২০১৪-তে অনুষ্ঠিত কোয়ান্টাম সিলভার ডোনার প্রোগ্রামের প্রধান অতিথি ব্যারিস্টার এম. আমীর-উল ইসলামের হাত থেকে বিশেষ সম্মাননা ক্রেস্ট গ্রহণ করছেন কেয়া গ্রুপের জিএম জনাব মিজানুর রহমান খান।

রাজশাহী, বরিশাল ও সিলেটে কোয়ান্টাম মেথড কোর্স

৩৮২ তম কোর্স ৥ রাজশাহী
৬, ৭, ৮ ও ৯ ফেব্রুয়ারি
(শুক্র, শনি, রবি ও সোমবার)

স্থান : রাজশাহী মেডিকেল কলেজ অডিটোরিয়াম

৩৮৩ তম কোর্স ৥ বরিশাল
১৩, ১৪, ১৫ ও ১৬ ফেব্রুয়ারি
(শুক্র, শনি, রবি ও সোমবার)

স্থান : বিডিএস ক্লাব মিলনায়তন, সদর রোড, বরিশাল

৩৮৫ তম কোর্স ৥ সিলেট
২৭, ২৮ ফেব্রুয়ারি ও ১, ২ মার্চ
(শুক্র, শনি, রবি ও সোমবার)

স্থান : সানরাইজ কমিউনিটি সেন্টার, পাঠানটুলা, সিলেট

স্বেচ্ছা রক্তদান কার্যক্রম

২০১৪ সালে রক্ত সরবরাহ ৯৭,০১৯ ইউনিট
একদিনে সর্বোচ্চ রক্ত সরবরাহ ৪০৯ ইউনিট

২০১৪ সালে কোয়ান্টাম ল্যাব সরবরাহ করেছে ৯৭,০১৯ ইউনিট রক্ত ও রক্ত উপাদান। উল্লেখ্য, ২০১৪ সালে কোয়ান্টাম ল্যাব থেকে রক্ত ও রক্ত উপাদান সরবরাহের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছিল ৮০ হাজার ইউনিট।

বার্ষিক রক্ত ও রক্ত উপাদান সরবরাহের দিক দিয়ে এটাই এ পর্যন্ত সর্বোচ্চ। ২০১৩ সালে বার্ষিক সরবরাহের পরিমাণ ছিল ৮২ হাজার ইউনিট। এছাড়াও ২৩ ডিসেম্বর একদিনে সর্বোচ্চ সরবরাহ করা হয়েছে ৪০৯ ইউনিট রক্ত ও রক্ত উপাদান।

সর্বাধুনিক যন্ত্রপাতিসমৃদ্ধ আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন কোয়ান্টাম ল্যাবে ২০১৪ সালে সংযুক্ত হয়েছে আরো একটি প্লাটিলেট শেকার মেশিন। এছাড়াও যুক্ত হয়েছে তিনটি অত্যাধুনিক নতুন ব্লাড কালেকশন মনিটর মেশিন।

২০১৪ সালে আরো তিনটি নতুন বেড সংযোজন করা হয়েছে ল্যাবে। এখন একই সাথে ১১ জন রক্তদাতা রক্তদান করতে পারছেন।

রক্ত সরবরাহের সময় প্রতিটি ব্লাডব্যাগের সাথে রক্তের গ্রুপ, কম্পোনেন্ট ও অন্যান্য তথ্যসম্বলিত যে ট্যাগ দেয়া হয়, তা আগে হাতে লেখা হতো। ২০১৪ সালে ল্যাবের কর্মীদের কারিগরি উদ্ভাবনায় একই সাথে ব্লাড ব্যাগের ট্যাগ এবং ব্লাড স্ক্রিনিং রিপোর্ট প্রিন্ট করা হচ্ছে। এতে সম্পূর্ণ ব্লাড ডেলিভারি সিস্টেম-এর কাজটি আরো দ্রুত ও নির্ভুলভাবে করা সম্ভব হচ্ছে। বছরজুড়ে ল্যাবের কর্মী ও দায়িত্বশীলরা নিয়েছেন নতুন নতুন কর্মপরিকল্পনা ও সমন্বয়যোগ্য পদক্ষেপ, যা রক্ত সংগ্রহ ও সরবরাহের সামগ্রিক কাজে অত্যন্ত ইতিবাচক ফলাফল বয়ে এনেছে।

এছাড়াও ২০১৪-তে প্রথমবার রক্ত দিয়েছেন এমন রক্তদাতাদের সংখ্যাও বেড়েছে অন্য যে-কোনো বছরের তুলনায় উল্লেখযোগ্য হারে। রক্তদাতাদের এই স্বতঃস্ফূর্ত ও আন্তরিক অংশগ্রহণ এবং লাখো মানুষের অবিচল আস্থার ফলেই সম্ভব হয়েছে রক্ত সরবরাহের লক্ষ্যমাত্রাকে অতিক্রম করা।

কর্মসূচি ৥ জানুয়ারি ২০১৫

প্যারেন্টিং প্রোগ্রাম : স্টেপ-১
৯ ও ১০ জানুয়ারি। কেন্দ্র

হৃদরোগ প্রতিরোধ ও নিরাময় কার্যক্রম
২৩ ও ২৪ জানুয়ারি। বনশ্রী

জীবনে সফল হওয়ার পথ প্রথমায়ন
২৩ ও ২৪ জানুয়ারি। বংশাল

কোয়ান্টাম শিক্ষার্থী কার্যক্রম
২৩ ও ২৪ জানুয়ারি। বনানী

কোয়ান্টাম হিলিং ও সাইকি কার্যক্রম
২৩ ও ২৪ জানুয়ারি। কেন্দ্র

কোয়ান্টাম বুলেটিন : জানুয়ারি ২০১৫ ৥ সম্পাদক : কাজী মাহতাব উদ্দিন আহমদ ৥ নাহার আল বোখারী, মহাপরিচালক, কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন
কর্তৃক ৩১/শিপ্রাচার্য জয়নুল আবেদীন সড়ক, শান্তিনগর, ঢাকা-১২১৭ থেকে প্রকাশিত ও উইভোজ প্রিন্টিং সেন্টার থেকে মুদ্রিত ৥ শুভেচ্ছা মূল্য - ৫ টাকা
Phone : 9341441, 8319377, 9355756 Mobile : 01714-974333, 01711-671858, 09613-002025 E-mail : bulletin@quantummethord.org.bd



কোয়ান্টাম বুলেটিন

ফেব্রুয়ারি ২০১৫

সবার ওপর শান্তি বর্ষিত হোক

আমরা সবাই শান্তি চাই। চাই ভালো থাকতে। পরিবারে কর্মক্ষেত্রে সমাজে দেশে-সর্বত্র। আর এ চাওয়াটি পূরণ হতে পারে অনেকভাবেই, যার একটি গুরুত্বপূর্ণ উপায় ভালো কথা-বার বার ভালো কথা, শান্তির কথা উচ্চারণ।

এ উপলব্ধি থেকেই কোয়ান্টাম পরিবারের সদস্যরা পারস্পরিক সালাম বিনিময়ের মধ্য দিয়ে দিন শুরু করছেন। ব্যক্তিগত পারিবারিক সামাজিক জীবনে কারো সাথে দেখা হতেই বলছেন-আসসালামু আলাইকুম। শান্তি কামনা করছেন ছোট-বড় সবার। চারপাশে ধ্বনিত হচ্ছে সালাম! সালাম! শান্তি! শান্তি!

নতুন বছরেও আমরা আন্তরিকভাবে অন্যের শান্তি কামনায় সালামের চর্চাটি অব্যাহত রাখতে চাই। চাই পরিবার সমাজ দেশ সবখানে শান্তি থাকুক। দূর হোক হিংসা-রাগ-দ্বेष-ক্ষোভসহ যাবতীয় অশান্তি। সবার ওপরে শান্তি বর্ষিত হোক!

মানুষের আস্থা এখন মেডিটেশনে

দীর্ঘ দুদশকের সাফল্যযাত্রার পথ ধরে কোয়ান্টাম এখন অতিক্রম করেছে তার তৃতীয় দশক। পদার্পণ করেছে অব্যাহত অগ্রযাত্রার ২৩ তম বছরে। আমরা বিশ্বাস করি, আগের বছরগুলোর মতো এ বছরটিও হবে কোয়ান্টামের সম্ভাবনা বিকাশের আর পায়ে পায়ে এগিয়ে যাওয়ার। সেবামূলক কার্যক্রমগুলোতে আমাদের প্রবৃদ্ধি, পারিপার্শ্বিক পরিবেশ-পরিস্থিতি ও সময়ের প্রয়োজন-সবমিলিয়ে বলা যায়, কোয়ান্টাম প্রবেশ করেছে সম্ভাবনার নতুন দিগন্তে।

বিদায়ী বছর ২০১৪ ছিল মেডিটেশনের ওপর সর্বস্তরের মানুষের আস্থা প্রকাশের বছর। হাইপারটেনশন নিয়ন্ত্রণে প্রণীত জাতীয় চিকিৎসা নীতিমালায় প্রথমবারের মতো মেডিটেশনের কার্যকারিতার কথা উল্লেখ করা হয়। এছাড়াও মেডিটেশনের নিরাময় প্রক্রিয়াকে জনজীবনে আরো জনপ্রিয় করে তুলতে মেডিটেশন সেবায় আরোপিত ভ্যাকু প্রত্যাহার করেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার। সাধারণ মানুষের আস্থা আরো প্রগাঢ় হয় মেডিটেশনে। সম্পন্ন হয় কোয়ান্টাম মেথডের ৩৮০ তম ব্যাচ।

কোয়ান্টাম মাটির ব্যাংক থেকে সংগৃহীত হয়েছে মোট ১৯ কোটি ১১



সায়েন্টিফিক আমেরিকান (নভেম্বর ২০১৪)-
তে প্রকাশিত প্রচ্ছদ প্রতিবেদন-দ্য
নিউরোসায়েন্স অব মেডিটেশন

লক্ষাধিক টাকা, যার পুরোটাই ফাউন্ডেশনের সদস্যদের নিঃস্বার্থ দান, যা বছরজুড়ে ব্যয় হয়েছে শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও স্বনির্ভরায়ন কার্যক্রমে।

এছাড়া ২০১৪ সালে কোয়ান্টাম ল্যাব সরবরাহ করেছে ৯৭,০১৯ ইউনিট রক্ত ও রক্ত উপাদান, যা এ যাবৎকালের সর্বোচ্চ বার্ষিক সরবরাহ। আর এ থেকে থ্যালাসেমিয়া-আক্রান্ত এবং সামর্থ্যহীন ও সীমিত সামর্থ্যবানরা বিনা প্রেসসিং খরচে পেয়েছেন ৮,০১২১ ইউনিট রক্ত ও রক্ত উপাদান।

বার্ন ইউনিটে চিকিৎসাধীন অগ্নিদগ্ধ রোগীদের জন্যে প্রয়োজনীয় ফ্রেশ ফ্রোজেন প্লাজমার সিংহভাগই সরবরাহ করা হয়েছে কোয়ান্টাম ল্যাব থেকে।

ব্যক্তিগত পেশাগত পারিবারিক সামাজিক-নানামুখী অস্থিরতা ও হতাশার আধাসন আজ সমাজের সর্বস্তরের মানুষকেই আক্রান্ত করেছে। যার ফলে বাড়ছে বিভিন্ন দুর্ভোগ। আর এর কার্যকর প্রতিকারে কল্যাণকর ভূমিকা পালন করছে ফাউন্ডেশনের বিভিন্ন আত্ম উন্নয়নমূলক কার্যক্রম। মেডিটেশন চর্চা করে লাখে মানুষ অর্জন করেছেন প্রশান্তি সুস্থাস্থ্য ও সাফল্যের আনন্দ অনুরণ।

এই প্রশান্তির খোঁজ শুধু আমাদের সমাজেই নয়, সারা পৃথিবীতে এর প্রয়োজন আজ খুব বেশিরকম অনুভূত হচ্ছে। বিশ্বজুড়ে এ নিয়ে তাই সমাজবিজ্ঞানী, চিকিৎসাবিজ্ঞানী আর গবেষকদের অনুসন্ধান চলছে। সম্প্রতি (নভেম্বর ২০১৪) বিশ্বখ্যাত বিজ্ঞান-সাময়িকী সায়েন্টিফিক আমেরিকান-এ প্রকাশিত হয়েছে একটি প্রচ্ছদ প্রতিবেদন-দ্য নিউরোসায়েন্স অব মেডিটেশন।

এ প্রতিবেদনের মাইন্ড অব দ্য মেডিটেশনের শীর্ষক নিবন্ধে মেডিটেশনকালে একজন মানুষের মন ও মস্তিষ্কের ইতিবাচক গতিপ্রকৃতি তুলে ধরা হয়েছে। একাধিক গবেষণায় নিউরোসায়েন্টিস্টরা দেখেছেন, নিয়মিত মেডিটেশন মানুষের মন ও মস্তিষ্কে সেতেজ ও সুতীক্ষ্ণ করে। মনোযোগকে করে গভীর ও কেন্দ্রীভূত। নিয়মিত মেডিটেশনকারীদের ওপর দীর্ঘ গবেষণা আর নানা তথ্য-উপাত্তের ভিত্তিতে বিজ্ঞানীদের অভিমত হলো-মনোদৈহিক সুস্থতাসহ মমতা ও সমমর্মিতাপূর্ণ সুখী জীবনের পথে এগিয়ে যাওয়ার সহজ ও কার্যকর উপায় হতে পারে মেডিটেশন।

আর এ কথাগুলোই কোয়ান্টাম বলছে প্রায় দুই যুগ আগে থেকেই। অর্থাৎ এ শতাব্দীর এ সময়ের মানুষের সার্বিক প্রয়োজন পূরণের বিষয়টি কোয়ান্টাম মানুষকে দিতে পেরেছে সার্থকভাবে। তাই আমরা নিঃসংকোচে বলতে পারি, সর্বস্তরের মানুষের আস্থা এখন মেডিটেশনে।



কোয়ান্টাম শিশুসদনের মেয়েশিশুরা বেড়ে উঠছে আলোকিত জীবন গড়ার প্রত্যয় ও নতুন স্বপ্নে ...

মস্তিষ্কের ক্ষমতা ও মনের শক্তিকে সুতীক্ষ্ণ করে মেডিটেশন

খ্যাতনামা বিজ্ঞান-সাময়িকী সায়েন্টিফিক আমেরিকান-এ সম্প্রতি (নভেম্বর ২০১৪) প্রকাশিত হয়েছে ‘মাইন্ড অব দ্য মেডিটেটর’ শীর্ষক একটি গুরুত্বপূর্ণ নিবন্ধ। মেডিটেশনের বিভিন্ন দিক নিয়ে নিউরোসায়েন্টিস্টদের সর্বশেষ গবেষণা ও তথ্য-উপাত্তের আলোকে রচিত এ নিবন্ধটি যৌথভাবে লিখেছেন ম্যাথু রিকার্ড, অ্যান্টনি লাটজ ও রিচার্ড জে ডেভিডসন।

উল্লেখ্য, একসময় সেলুলার বায়োলজিস্ট হিসেবে কাজ করলেও বর্তমানে ম্যাথু রিকার্ড একজন বৌদ্ধ সন্ন্যাসী। বছর চল্লিশেক আগে তিনি ফ্রান্স ছেড়ে হিমালয়ে পাড়ি জমান এবং বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হন। ফ্রেঞ্চ ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব হেলথ এন্ড মেডিকেল রিসার্চ এবং যুক্তরাষ্ট্রের উইসকনসিন-ম্যাডিসন বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক-বিজ্ঞানী অ্যান্টনি লাটজ। তিনি নিউরোবায়োলজি অব মেডিটেশন বিষয়ক দীর্ঘ গবেষণায় নেতৃত্ব দেন। এছাড়াও উইসকনসিন-ম্যাডিসন বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েজমেন ল্যাবরেটরি ফর ব্রেন ইমেজিং এন্ড বিহেভিয়ার এবং সেন্টার ফর ইনভেস্টিগেটিং হেলদি মাইন্ডস-এর পরিচালক রিচার্ড জে ডেভিডসন মেডিটেশন ও বিজ্ঞানবিষয়ক গবেষণায় একজন পুরোধা বিজ্ঞানী।

আলোচ্য নিবন্ধটির ভূমিকায় বলা হয়েছে, ২০০৫ সালে যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটন ডিসি-তে অনুষ্ঠিত হয় সোসাইটি ফর নিউরোসায়েন্সের বার্ষিক সম্মেলন। আর তাতে আলোচনায় আমন্ত্রণ জানানো হয় তিব্বতীয় বৌদ্ধশাস্ত্রের আধ্যাত্মিক নেতা ১৪ তম দালাই লামা ও সাধক তেনজিন গ্যাৎসো-কে। কিন্তু সোসাইটির অন্তত কয়েক শ সদস্য এতে আপত্তি জানান। তাদের বক্তব্য ছিল, এমন একটি বিজ্ঞান সম্মেলনে ধর্মীয় নেতার অবস্থান বা তার কথার গুরুত্ব কতখানি? একপর্যায়ে তারা এ আমন্ত্রণ বাতিলের দাবি তোলেন।

যা-হোক, পরে দালাই লামা অবশ্য আলোচনা করেন এবং বিরোধী মতের বিজ্ঞানীদের ধারণায় ব্যাপক পরিবর্তন আসে যখন তিনি প্রাচীন ভারতীয় দর্শন ও এর চিরায়ত আধ্যাত্মিক ঐতিহ্য, বিশেষত মেডিটেশনকে আধুনিক বিজ্ঞানের আলোকে ব্যাখ্যা ও উপস্থাপন করেন।

কেন মেডিটেশন

পৃথিবীর সব প্রধান ধর্মেই গুরুত্বের সাথে মেডিটেশনের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। মেডিটেশন বা ধ্যান প্রকৃত অর্থে এমন একটি নিমগ্ন চর্চার বিষয়, যা মানুষের মৌলিক মানবীয় গুণাবলির বিকাশ ঘটায়। মানুষকে ধীর স্থির এবং তার মনকে স্বচ্ছ ও পরিচ্ছন্ন করে তোলে। আবেগীয় ভারসাম্য বজায় রাখতে সহায়তা করে আর মনোযোগকে করে লক্ষ্যভেদী। হৃদয়ে সৃষ্টি করে গভীর কল্যাণচেতনা, ভালবাসা ও সমর্মিতা। সবমিলিয়ে আমরা বলতে পারি, সবদিক থেকে ভালো থাকার জন্যে মেডিটেশন একটি সহজ ও নির্মল উপায়।

আর মেডিটেশন এখন নিছক ধর্মীয় কোনো বিষয় নয়। সারা পৃথিবীতেই আজ এটি জীবনচর্চার

একটি বহুল প্রচলিত ও জনপ্রিয় অনুশঙ্গ, যা নিয়মিত অনুশীলনে মস্তিষ্কের ক্ষমতা ও মনের শক্তি হয়ে ওঠে সুতীক্ষ্ণ ও সুসংহত। তাই এর চর্চা আজ বিশ্বব্যাপী সর্বত্র—এমনকি স্কুল থেকে হাসপাতাল পর্যন্ত।

গবেষণায় দেখা গেছে, মেডিটেশন মানুষকে সচেতন করে তোলে সার্বিকভাবে এবং বদলাতে সাহায্য করে

মনোদৈহিক অস্তিত্বের একেবারে ভেতর থেকে। আমাদের দেহকায় ও শারীরবৃত্তীয় কর্মকাণ্ড এর দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হয়। ফলে এটি নিরাময়ে রাখে বিশেষ ভূমিকা। উচ্চতর গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে, দীর্ঘদিনের ব্যথা-বেদনা থেকে শুরু করে বিষণ্ণতা প্রতিরোধ ও প্রতিকারে এর ভূমিকা রয়েছে।

মস্তিষ্কের গঠন ও কর্মকাঠামোতে ঘটে ইতিবাচক পরিবর্তন

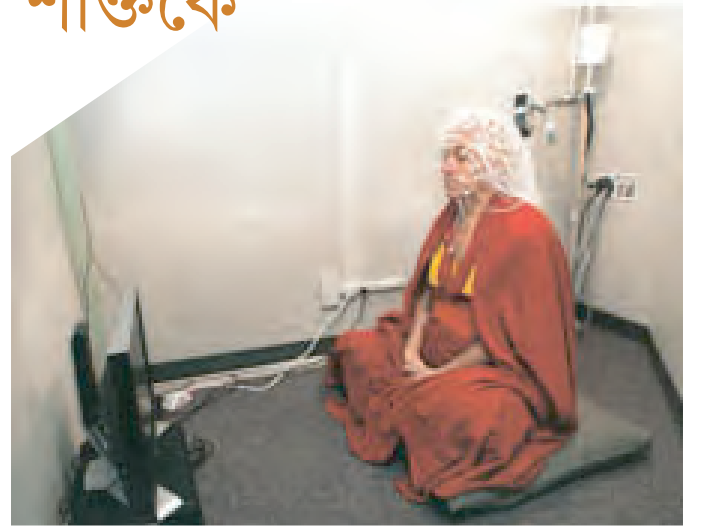
মেডিটেশন মস্তিষ্কের গঠন ও কর্মকাঠামোতে ইতিবাচক পরিবর্তনের সূচনা করে। যখন আমরা জাগলিং বা এ ধরনের কোনো কৌশল আয়ত্ত করি কিংবা কোনো বাদ্যযন্ত্র চালনায় দক্ষতা অর্জন করি, তখন নিউরোপ্লাস্টিসিটি বাড়ে অর্থাৎ মস্তিষ্কের নিউরোনগুলোর মধ্যে আন্তঃপারস্পরিক যোগাযোগ বাড়ে বহুগুণ। এবং এই ব্যাপারটি (বিভিন্ন কৌশল ও বাদ্যযন্ত্র চালনা) মস্তিষ্কের যে অংশটি নিয়ন্ত্রণ করে, সে অংশের পুরনু বৃদ্ধি পায়। একাধিক গবেষণায় নিশ্চিত হয়ে এ শতকের শুরু থেকেই নিউরোসায়েন্টিস্টরা বলছেন, নিয়মিত মেডিটেশন চর্চার ফলে একই ঘটনা ঘটে।

শুধু তা-ই নয়, এর পাশাপাশি মেডিটেশন চর্চাকারী শরীর-মনে উপভোগ করেন ভালো থাকার এক অভূতপূর্ব অনুরণন, যা মনকে প্রশান্ত করে। সব ধরনের স্ট্রেস থেকে মুক্ত করে। সেইসাথে সারা শরীরে ছড়িয়ে দেয় সুস্বাস্থ্যের এক দারুণ অনুভূতি। এটি তার নিরাময় ও সার্বিক সুস্থতাকে নিশ্চিত করে।

মানসিক প্রশান্তি আর ব্যথামুক্তির অনুভূতি হয় মেডিটেশনে

বিস্মিত আর ইতস্তত করে ঘুরে বেড়ানো মনকে প্রশান্ত করে মেডিটেশন। সাধকরা কথাটা বলছেন হাজার বছর ধরেই। বিজ্ঞানীরা বুঝতে শুরু করেছেন সম্প্রতি, বড়জোর কয়েক দশক।

প্রতিদিন নানা কারণে-চারপাশে কী হচ্ছে, ঘটছে, চলছে কিংবা কর্মক্ষেত্রে অসহযোগী সহকর্মী বা বাড়িতে দূরন্ত সন্তানের চিন্তা—এমন অসংখ্য নানামুখী ভাবনায় আচ্ছন্ন থাকে আমাদের মন। ব্যাহত হয় আমাদের মনোযোগ আর কাজ।



মেডিটেশনরত অবস্থায় ইলেক্ট্রো-এনসেফালোগ্রাফ (ইইজি) যন্ত্রের সাহায্যে পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে ম্যাথু রিকার্ডের মস্তিষ্কের গতিপ্রকৃতি

মেডিটেশনকেই এর কার্যকর সমাধান হিসেবে রায় দিচ্ছেন আধুনিক মনোবিদ ও বিজ্ঞানীরা।

মেডিটেশনে ব্যথামুক্তির অনুভূতি সৃষ্টি হয়। এমনটাই জানাচ্ছেন গবেষকরা। তারা বলছেন, ব্যথা যেমনই হোক, অন্যান্যদের চেয়ে মেডিটেশন চর্চাকারীরা তা অনুভব করেন তুলনামূলক কম। এছাড়াও যে-কোনো ধরনের সংক্রমণের ঝুঁকিও তাদের ক্ষেত্রে অনেকটা কম। সেইসাথে তাদের শরীরে স্ট্রেস হরমোনের প্রবাহ হ্রাস পায় বলে স্ট্রেসজনিত রোগের আশঙ্কা থেকে তারা তুলনামূলক মুক্ত থাকেন। তাদের ঘুম ভালো হয়।

এসব কারণে বিষণ্ণতার হার বেশ কমে যায় নিয়মিত মেডিটেশনে। কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্ট জন টিসডেইল ও টরন্টো বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক জিন্দেল সেগাল ২০০০ সালে পরিচালিত একটি গবেষণায় প্রমাণ করেন যে, বিষণ্ণতার রোগীদের ক্ষেত্রে ছয় মাস নিয়মিত মেডিটেশন বিষণ্ণতা উপশমে সহায়ক।

মমতা ও সমর্মিতাপূর্ণ সুখী জীবনের পথে

নিয়মিত মেডিটেশন করেন যারা, তাদের মনোজগত ও দৃষ্টিভঙ্গিতে ঘটে গভীর পরিবর্তন। হৃদয় পূর্ণ হয়ে ওঠে মমতা ও সমর্মিতায়, তা কেবল নিজের পরিবারের সদস্য ও আশ্রয়দানের জন্যে নয়, এমনকি হতে পারে খোদ শত্রুর জন্যেও। অন্যর প্রয়োজন ও চাহিদা তাদের কাছে গুরুত্ব পায় অনেক বেশি। আর এ অনুভূতিটা হয় নিঃস্বার্থ ও নিঃশর্ত। নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঘটে। সবার প্রতি এক ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি জীবনকে প্রশান্ত করে তোলে। ইতিবাচক আবেগের প্রাবল্য বৃদ্ধি পায়। আর এতে পরিবর্তনের সূচনা ঘটে মস্তিষ্কের গঠন ও কর্মপন্থায়। ইলেক্ট্রো-এনসেফালোগ্রাফ যন্ত্রের সাহায্যে পরীক্ষার মাধ্যমে এটি প্রমাণিত হয়েছে।

বিশ্বজুড়ে এমন অসংখ্য গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা আর বিজ্ঞান সাময়িকীতে প্রকাশিত প্রতিবেদনের ভিত্তিতে গবেষকরা তাই বলছেন, নিয়মিত মেডিটেশন করুন। শারীরিক-মানসিক সুস্বাস্থ্য অর্জনসহ সবদিকেই আপনি ভালো থাকবেন। এগিয়ে যাবেন এক সুখী জীবনের পথে।

আত্মনির্মাণের আলোকিত পথে ...



চট্টগ্রামে এক ছাদের নিচে সর্ববৃহৎ গ্রাজুয়েট ওয়ার্কশপে অংশগ্রহণকারীদের একাংশ

২০১৪ হোক আত্ম উপলব্ধির বছর-নতুন বছরে গুরুজীর এই শুভেচ্ছাবাণীই প্রতিটি কোয়ান্টাম সদস্যকে মনে করিয়ে দিয়েছে আত্ম উন্নয়নমূলক প্রোগ্রামে নিজে অংশগ্রহণের তাগিদ। তাই সাপ্তাহিক কর্মদিবসে জালালি কার্যক্রমে ছিল উপচে পড়া ভিড়। আর ছুটির দিনে আয়োজিত ওয়ার্কশপগুলোতে কাকরাইলের আইডিইবি মিলনায়তনের সবগুলো হলও ভরে যায়। বাকিদের বসার ব্যবস্থা করতে হয় কোয়ান্টাম মেডিটেশন হল, কোয়ান্টাম গ্যালারি ছাড়াও এই প্রথম জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল ভবনের দুটো হলে। অবশ্য এর আগে প্রো-মাস্টার্স আখেরি

দোয়ায় কার্ড না পেয়ে ফিরে গিয়েছিলেন অনেকেই। ঢাকার বাইরেও তিনটি স্থানে অনুষ্ঠিত গ্রাজুয়েট ও প্রো-মাস্টারদের নিয়ে যৌথ ওয়ার্কশপে অংশগ্রহণ ছাড়িয়ে গেছে অতীতের সব রেকর্ড।

এ বছর কোয়ান্টাম গ্রাজুয়েটদের নিয়ে ঢাকা, চট্টগ্রাম, সিলেট ও রাজশাহীতে অনুষ্ঠিত হয়েছে দিনব্যাপী বিশেষ ওয়ার্কশপ। সঠিক জীবনদৃষ্টি অর্জনে বিষয়াভিত্তিক এ ওয়ার্কশপগুলোতে ছিল কোয়ান্টাম পরিবারের সদস্যদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ।



আলোকিত পরিবার কার্যক্রম ॥ সুখী পরিবার গড়ার প্রত্যয়

পরিবার আলোকিত তো সমাজ আলোকিত, সমাজ আলোকিত তো দেশ আলোকিত-এ বিশ্বাস ও লক্ষ্য নিয়েই ২০০৬ সাল থেকে অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে আলোকিত পরিবার কার্যক্রম। এ কার্যক্রম পরিচালনা করছেন মা-জী নাহার আল বোখারী।

২০১৪ সালে আলোচনার বিষয় ছিল-উপহার নয়, সন্তানের জন্যে প্রয়োজন মা-বাবার সাহচর্য, বিয়ে ॥ প্রত্যাশা এবং বাস্তবতা, সন্তানের সুস্থ স্বাভাবিক বিকাশে দাম্পত্য সম্প্রীতির ভূমিকা, সুখী পরিবারের সূত্র ॥ পারিবারিক রেওয়াজ তৈরি করা, পারিবারিক মনছবি, সালাম ॥ পরিবারে শান্তির অনুঘটক, পারস্পরিক সম্মান ও মমতা ॥ সুখী পরিবারের ভিত্তি, পরিবারে কোয়ালিটি সময় দিন, সুখী পরিবারের জন্যে প্রয়োজন সরাসরি কথা বলা, মা-বাবার সেবার গুরুত্ব।

মেডিটেশন চর্চার ২২ বছর ॥ সম্পন্ন হলো ৩৮০টি কোর্স

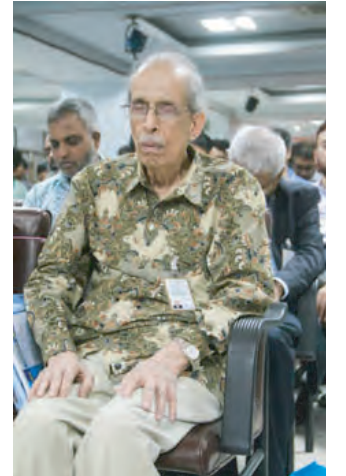
২২ বছরের দীর্ঘ যাত্রায় সম্পন্ন হয়েছে কোয়ান্টাম মেথড কোর্সের ৩৮০টি ব্যাচ। উদ্ভাবক কর্তৃক এককভাবে ক্লাস নিয়ে টানা ৩৮০ কোর্স অনুষ্ঠিত হওয়া মেডিটেশন চর্চার ইতিহাসে এক অতুলনীয় অর্জন। শোকর আলহামদুলিল্লাহ! পরম করণাময়ের অসীম অনুগ্রহ ও কোয়ান্টাম পরিবারের সদস্য ও শুভানুধ্যায়ীদের আন্তরিক সহযোগিতায় সম্ভব হয়েছে এই অবিস্মরণীয় সাফল্য।

এ দীর্ঘ পথ পরিক্রমায় কোয়ান্টামের সাথে নানাভাবে সম্পৃক্ত ও একাত্ম হয়েছেন বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ। লাভ করেছেন সঠিক ও ইতিবাচক জীবনদৃষ্টি, আলোকিত জীবনের চিরায়ত দর্শন ও সাফল্যসূত্র। বদলের সূচনা ঘটেছে চারপাশের লাঞ্ছনা মানুষের জীবনে এক বা একাধিক ক্ষেত্রে। নিজেরা কোয়ান্টাম মেথড চর্চার পাশাপাশি এই সদস্যরাই তাদের পরিচিত পরিমণ্ডলে কোর্সের বাণী ছড়িয়ে দিয়েছেন আত্মবিশ্বাসের সাথে।

২০১৪ সালের জুলাই মাসে নিরাময় ও সাফল্যের এক নতুন জোয়ার নিয়ে আসে কোয়ান্টাম মেথড কোর্স স্বাগতম! স্বাগতম!! ৩৭৫ ব্যাচ, যা বিশ্বে মেডিটেশন চর্চার ইতিহাসে এক অনন্য মাইলফলক।

সাধ থাকলেও স্থান সংকুলানের অভাবে সাধ্য ছিল না এ ব্যাচে আরো অনেককেই অংশগ্রহণের সুযোগ দেয়ার। কোর্সের দুদিন আগে থেকেই বন্ধ

কোয়ান্টাম
মেথড কোর্স
স্বাগতম!
রহমত!! ৩৭৫
ব্যাচে গভীর
ধ্যানে মগ্ন
বাংলাদেশে
হৃদরোগ
চিকিৎসার
পথিকৃৎ,
ন্যাশনাল হার্ট
ফাউন্ডেশন
অব
বাংলাদেশ-এর
মহাসচিব ও
সাবেক
তত্ত্বাবধায়ক
সরকারের
উপদেষ্টা



জাতীয় অধ্যাপক ব্রিগেডিয়ার (অব.) ডা. আব্দুল মালিক

করে দিতে হয়েছে নতুন সদস্য ভর্তি। ফিরে গেছেন অনেকেই। তাদের সবার এবং কোয়ান্টাম পরিবারের সদস্যদের আন্তরিক আগ্রহ ও উৎসাহের প্রেক্ষিতে সেপ্টেম্বরে অনুষ্ঠিত হয় কোয়ান্টাম মেথড কোর্স স্বাগতম! রহমত!! ৩৭৫।

সৃষ্টির সেবায় কোয়ান্টাম

নবনির্মিত শাফিয়ানের সামনে সারাদেশ থেকে আসা কোয়ান্টাম পরিবারের চিকিৎসকবৃন্দ



২১ ফেব্রুয়ারি কোয়ান্টামে অনুষ্ঠিত হয় একটি সুবৃহৎ মেডিকেল ক্যাম্প। ৯৩ জন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের তত্ত্বাবধানে চিকিৎসাসেবা ও বিনামূল্যে ওষুধ পেয়েছেন ৪,২১৯ জন রোগী।



চট্টগ্রাম
রাজবিল্লা
খুলনা ও
ঢাকার মিরপুরে
মাতৃমঙ্গল
কার্যক্রমের
আওতায় সেবা
পেয়েছেন
৪৭৩ জন মা

- দেশের ৫৭টি স্থানে খতনা সেবা দেয়া হয়েছে ১৯,৬৬৬ জনকে।
- বন্যা ও ঘূর্ণিঝড়ে আক্রান্ত উপকূলীয় অঞ্চলসহ বিভিন্ন এলাকায় নতুন গৃহনির্মাণ ও গৃহ মেরামতে এ বছর অর্থসাহায্য দেয়া হয়েছে ৩৭ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা। টিনের নতুন ঘর পেয়ে গৃহহীন মানুষের মুখে ফুটেছে হাসি।
- মুমূর্ষু রোগীর প্রয়োজনে হাসপাতালে গিয়ে টাকা ও ঢাকার বাইরে ৪৬টি স্থানে রক্তদান করেন ৯,২১১ জন।
- কোয়ান্টামম, লামাসহ দেশের ১৭টি স্থানে চিকিৎসাসেবা পেয়েছেন ১৭,৪৪৫ জন।
- বস্ত্রদান হয়েছে ৭,৮১৮ পিস।
- সদকাব্যতীত হিলিং হয়েছে এক লক্ষ ৯৭ হাজার ৭৩৭টি।
- রাজশাহী ও খুলনায় যথাযথ ধর্মীয় মর্যাদায় দাফন করা হয়েছে ৩৪টি মরদেহ। রাজশাহীতে সৎকার করা হয়েছে দুটি মরদেহ।

পানিই জীবন।
পানিবাহিত রোগ
থেকে মুক্তি পেতে
চাই বিসুদ্ধ পানি।
বিসুদ্ধ পানির
জন্যে এ বছর
টিউবওয়েল
বসানো হয়েছে
২২টি



কোয়ান্টাম যাকাত ফান্ড ॥

সম্ভাবনায় দানে স্বাবলম্বী হচ্ছে হাজারো মানুষ

২০১৪ সালে কোয়ান্টাম যাকাত ফান্ড থেকে সংগৃহীত হয়েছে ছয় কোটি ৫২ লক্ষ ৪৮ হাজার ৬৯৬ টাকা। শিক্ষা স্বাস্থ্য বাসস্থান ও স্বনির্ভরায়ন প্রকল্পে ব্যয় করা হচ্ছে এ অর্থ। যাকাত সুপরিচালিতভাবে ব্যয়ের মাধ্যমে সম্ভাবনায় দানে স্বাবলম্বী হচ্ছে হাজারো মানুষ। শরীয়ত নির্ধারিত সেবাখাতসমূহে যাকাত ফান্ড থেকে এ বছর ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ ছিল চার কোটি ৭২ লক্ষ ৮৫ হাজার ৮৬৪ টাকা।



স্বনির্ভরায়ন কার্যক্রমের আওতায় কুমিল্লায় এক মাসব্যাপী সেলাই প্রশিক্ষণ কোর্সের চারটি ব্যাচে ১০০ জন মহিলাকে সেলাই প্রশিক্ষণ ও ৫৮টি সেলাই মেশিন প্রদান করা হয়। প্রশিক্ষণার্থীদের চেষ্টনাকে আলোকিত করতে প্রতি ক্লাসে থাকে জীবনধর্মী আলোচনা ও মেডিটেশন পর্ব। এছাড়াও দেশের বিভিন্ন স্থানে দুস্থ মহিলাদেরকে সেলাই মেশিন প্রদান করা হচ্ছে। যার ফলে পারিবারিকভাবে তারা হয়ে উঠছেন সচ্ছল। শিক্ষিত হয়ে উঠছে তাদের সন্তানরা।

গুণীজনদের কোয়ান্টাম সফর



৭ মার্চ শুক্রবার কোয়ান্টাম-এর নবনির্মিত চিকিৎসাসেবা কেন্দ্র শাফিয়ান উদ্বোধন করেন কিংবদন্তী শিশু চিকিৎসক ও শিশুবন্ধু জাতীয় অধ্যাপক ডা. এম আর খান। এবার তিনি দ্বিতীয়বারের মতো কোয়ান্টাম সফর করেন।



৯ নভেম্বর দ্বিতীয়বারের মতো সক্রিয় কোয়ান্টাম সফর করেন বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি অধ্যাপক আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ। প্রথম বিভাগ হ্যান্ডবল লিগ চ্যাম্পিয়ন খেলোয়াড়দের সাথে।



৭ নভেম্বর প্রথমবারের মতো কোয়ান্টাম সফরে আসেন স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের অন্যতম স্থপতি ও জাতীয় সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব কামাল লাহানী। দুদিনব্যাপী এ সফরকালে কোয়ান্টাম কসমো স্কুলের শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে তিনি বিশেষ বক্তব্য দেন।



বিশ্বসেরা মহাকাশবিজ্ঞানী গডার স্বপ্ন নিয়ে ৮ মার্চ কোয়ান্টাম কসমো স্কুলে যাত্রা শুরু করেছে মহাকাশ গবেষণায় কোয়ান্টাদের কার্যক্রম-মহাকাশাযান। উদ্বোধন করেন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন পদার্থবিজ্ঞানী, শিক্ষাবিদ, লেখক ও গবেষক ড. এম শমশের আলী। আনা হয়েছে উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন তিনটি টেলিস্কোপ।

২০১৩ সালে সম্পন্ন হয় ৩৬ ফুট দীর্ঘ লম্বাখোলা কালভার্ট ও ৮৭ ফুট দীর্ঘ কোয়ান্টাম কসমো স্কুল সংযোগ সেতু এবং ৪৭৫ ফুট দীর্ঘ সালামাতান-কসমো আবাসিক সংযোগ সড়ক।

২০১১ সালে কোয়ান্টাম সফরকালে এখানকার যাতায়াতের অসুবিধা দেখে ডা. এম আর খান কালভার্ট দুটো নির্মাণের জন্যে সরকারের সংশ্লিষ্ট মহলে প্রয়োজনীয় যোগাযোগ রাখেন। তার সক্রিয় ভূমিকার ফলশ্রুতিতেই নির্মিত হয় এগুলো। ৮ মার্চ দুটি কালভার্ট পরিদর্শন করেন তিনি।



কোয়ান্টাদের লক্ষ্য এখন বহুদূর



হ্যান্ডবলে অভূতপূর্ব সাফল্য

গত বছরের ধারাবাহিকতায় এবারও ৪৩ তম গ্রীষ্মকালীন জাতীয় স্কুল ও মাদ্রাসা ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় হ্যান্ডবলে অপরাজিত চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে কোয়ান্টারা। খেলায় প্রতিপক্ষের সবগুলো দলের ২৪ গোলসংখ্যার বিপরীতে তারা দেয় ১৫৩টি গোল। ২০ সেপ্টেম্বর বঙ্গবন্ধু জাতীয় স্টেডিয়ামে কোয়ান্টাদের হাতে প্রথমবারের মতো চ্যাম্পিয়নস ট্রফি তুলে দেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

২৪-৩১ অক্টোবর ঢাকায় অনুষ্ঠিত প্রথম বিভাগ হ্যান্ডবল লিগ চ্যাম্পিয়ন হয় কোয়ান্টাদের নিয়ে গঠিত দল কোয়ান্টাম স্পোর্টিংস। এর ফলে কোয়ান্টাম স্পোর্টিংস ২০১৫ সাল থেকে ক্লাব পর্যায়ের সর্বোচ্চ প্রতিযোগিতা প্রিমিয়ার ডিভিশন হ্যান্ডবল লিগ খেলার যোগ্যতা অর্জন করে।

পাকিস্তানে ডিসেম্বর ২০১৪ সালে অনুষ্ঠিত ইন্টারন্যাশনাল হ্যান্ডবল ফেডারেশন চ্যালেঞ্জ ট্রফি ২০১৪-তে খেলার জন্যে বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব ১৯ হ্যান্ডবল দলে নির্বাচিত হয় কোয়ান্টাম কসমো স্কুলের চার জন কোয়ান্টা।

আরচ্যারি : এশিয়ান গেমসে অংশগ্রহণ

কোয়ান্টা প্রেননয় মুরং সর্বকনিষ্ঠ খেলোয়াড় হিসেবে কোরিয়ার ইনচনে অনুষ্ঠিত ১৭ তম এশিয়ান গেমসে বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করে ৪৬ তম স্থান লাভ করে।

বিজয় দিবস উন্মুক্ত আরচ্যারি প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশ আনসার, সেনাবাহিনী ও বিজিবি আরচ্যারদের বিরুদ্ধে জয়লাভ করে ফাইনালে উন্নীত হয় কোয়ান্টা ভানরুম বম। ফাইনালে মাত্র দুই পয়েন্টের ব্যবধানে রৌপ্য পদক লাভ করে সে।

জিমন্যাস্টিকস-এ স্বর্ণপদক জয়

এ বছর ঢাকায় অনুষ্ঠিত ৩৩ তম জাতীয় বয়সভিত্তিক জিমন্যাস্টিকস প্রতিযোগিতায় কোয়ান্টারা তিনটি ইভেন্টের তিনটিতেই স্বর্ণ, রৌপ্য এবং ব্রোঞ্জ পদক লাভ করে। আর ভলিং টেবিল নামে নতুন ইভেন্টে ঢাকায় মাত্র তিন দিন অনুশীলন করে অপেক্ষাকৃত অভিজ্ঞ খেলোয়াড়দের সাথে প্রতিযোগিতা করে ব্রোঞ্জ পদক অর্জন করে কোয়ান্টারা।

স্বাধীনতা দিবস খো খো-তে চ্যাম্পিয়ন

২৭-২৯ মার্চ ঢাকায় স্বাধীনতা দিবস খো খো টুর্নামেন্টে শক্তিশালী প্রতিপক্ষ ঢাকা জেলা দলকে ইনিংসের বড় ব্যবধানে পরাজিত করে চ্যাম্পিয়ন হয় কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন দলের কোয়ান্টারা। এছাড়া কোয়ান্টাদের সমন্বয়ে গঠিত বান্দরবান জেলা ক্রীড়া সংস্থা লাভ করে তৃতীয় স্থান।

□ এ বছর কোয়ান্টাদের জন্যে নির্মিত হয়েছে ২,৫০০ বর্গফুটের টেবিল টেনিস কমপ্লেক্স। ৪২ তম শীতকালীন জাতীয় স্কুল ও মাদ্রাসা ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় টেবিল টেনিস ইভেন্টে একক ও দ্বৈত উভয় ইভেন্টেই সবগুলো পর্যায় চ্যাম্পিয়ন হয়ে চূড়ান্ত পর্বে চতুর্থ স্থান লাভ করে কোয়ান্টারা।

□ প্যারেড, ডিসপ্লে ও ব্যান্ডবাদের ধারাবাহিক সাফল্য বজায় রেখেছে কোয়ান্টারা। চট্টগ্রামে বিশেষ পারদর্শিতা পুরস্কারসহ বান্দরবান জেলা ও লামা উপজেলায় সবগুলো ইভেন্টে প্রথম স্থান অধিকার করে কসমো স্কুল। এবার চট্টগ্রামে বিশেষ আকর্ষণ ছিল ব্রাস ব্যান্ড পরিবেশনা।

সালাম! সালাম! শান্তি! শান্তি! হয়ে উঠুক আমাদের সার্বজনীন সম্ভাষণ

আসসালামু আলাইকুম! আপনার ওপর শান্তি বর্ষিত হোক। ওয়ালাইকুম আসসালাম! আপনার ওপরেও শান্তি বর্ষিত হোক। বহু শতাব্দী ধরে দেশে দেশে মানুষের মুখে মুখে ফিরেছে এ বাক্য দুটি। এর কল্যাণচেতনার শক্তিতে অতিক্রম করেছে দেশ-কাল-ভাষার সীমানা। পারস্পরিক কল্যাণ ও শান্তি কামনার এক চিরন্তন বাণী হিসেবে এটি পেয়েছে সার্বজনীন মর্যাদা।

ধর্মীয় সম্প্রীতির শান্তিভূমি বাংলাদেশ। স্বাভাবিকভাবেই এখানে বহুকাল ধরেই সালাম আদান-প্রদান হয়ে উঠেছে প্রাথমিক সম্ভাষণ ও অভ্যর্থনা জানানোর এক সাধারণ রীতি। এই ধারাবাহিকতায় কোয়ান্টাম পরিবারের সদস্যরা শুরু থেকেই সালামের চর্চা করেছেন আন্তরিকভাবে-ঘরে-বাইরে সর্বত্র। আর ২০১৪ সাল থেকে ফাউন্ডেশনের সদস্যদের সার্বিক জীবনযাত্রায় সালামের চর্চা পেয়েছে এক ভিন্ন মাত্রা।

এ বছর ছোট-বড় নির্বিশেষে পরিবার, প্রতিবেশী, কর্মক্ষেত্র, সংগঠন, সামাজিক অনুষ্ঠান, ব্যক্তিগত আলাপচারিতা-সবখানে কোয়ান্টাম পরিবারের সদস্যরা পারস্পরিক শান্তি কামনার এ রীতি অনুসরণ করেছেন সচেতনভাবে এবং অফুরন্ত আনন্দ-অনুরণনে। আর এ আনন্দ কেবল নিজেদের মধ্যেই সীমিত থাকে নি, প্রত্যাশিতভাবেই ছড়িয়ে গেছে চারপাশে। ঘরে-বাইরে পরিবেশ হয়ে উঠেছে শান্তিময়, সম্পর্কগুলো হয়ে উঠেছে আগের চেয়ে সহজ ও সমমর্মী।

৩০ ও ৩১ জানুয়ারি, ২০১৫ ঢাকায় দুদিনব্যাপী অনুষ্ঠিত হলো ফাউন্ডেশনের বার্ষিক আর্ডেন্টার ওয়ার্কশপ। এতে দেশের সব সেক্টর শাখা সেল প্রিন্সিপাল থেকে অংশ নিয়েছিলেন কোয়ান্টাম পরিবারের সবচেয়ে সক্রিয় সদস্য ও কর্মীরা। গ্রুপ ডিসকাশনের ভিত্তিতে তারা লিখে জানিয়েছেন দৈনন্দিন জীবনে ব্যাপকভাবে সালাম চর্চায় তাদের অনুভূতি ও অভিজ্ঞতা।

তাদের আলোচনা থেকে উল্লেখযোগ্য কিছু পয়েন্ট এখানে দেয়া হলো :

- নবীজী (স)-এর জীবনে সবচেয়ে বেশি উচ্চারিত কথা আর সবচেয়ে বেশি আমল হচ্ছে সালাম।
- অটোসাজেশনের মতো বার বার সালামের উচ্চারণ ঘরে-বাইরে শান্তির অনুরণন সৃষ্টি করে।
- অন্যের শান্তি কামনায় প্রকৃতির প্রতিদান হিসেবে বাড়ে নিজের শান্তি। আসে মানসিক প্রশান্তি।
- অযাচিত জড়তা, সংকোচ, হীনম্রন্যতা দূর হয়। আত্মবিশ্বাস বাড়ে।
- নতুন কারো সাথে পরিচিত হতে এটি একটি সহজ প্রক্রিয়া। পরিচিত বলয় সম্প্রসারিত হয়।
- পারস্পরিক যোগাযোগ অর্থাৎ সংযোগায়ন সহজ হয়। সবার কাছে নিজের গ্রহণযোগ্যতা বাড়ে।
- পারস্পরিক সহনশীলতা ও সামাজিক

সৌহার্দ্য বাড়ে।

- উত্তেজিত কেউ সালাম পেলে তিনি কিছুটা হলেও শান্ত হতে শুরু করেন। যে-কোনো গুরুগম্ভীর পরিবেশকে সহজ ও স্বতঃস্ফূর্ত করে।
- পূর্বশত্রুতা, ঈর্ষা, ঘৃণা ও ক্রোধ প্রশমিত করে। সহকর্মী, বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়স্বজন, প্রতিবেশী সবার সাথে সুসম্পর্ক সৃষ্টি হয়।
- বৈরী পরিস্থিতি অনুকূলে আসে। তৈরি হয় সমঝোতার পথ। অনেক আপাত অসম্ভব কাজও সহজ হয়ে যায়।
- নিয়মিত সালাম হতে পারে অন্যের অন্তরে ঠাই

আর যখন কেউ তোমাদের সালাম দেয়, তখন তোমরা কমপক্ষে সে-রকম অথবা তার চেয়েও বেশি সম্মানসহকারে সালামের জবাব দেবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ সব বিষয়েই হিসাব গ্রহণকারী।

-আল কোরআন
(সূরা নিসা : আয়াত ৮৬)

... অন্যের বাড়িতে প্রবেশ করার আগে তাদের সালাম জানাও ও অনুমতি নাও। এ নিয়ম তোমাদের জন্যে কল্যাণকর। এ ব্যাপারে তোমরা সচেতন থাকবে।

-আল কোরআন
(সূরা নূর : আয়াত ২৭)

বিশ্বাসীরা যেদিন আল্লার সাথে সাক্ষাৎ করবে, সেদিন তাদেরকে স্বাগত জানানো হবে 'সালাম' বলে। তিনি তাদের জন্যে মহাপুরস্কার প্রস্তুত রেখেছেন।

-আল কোরআন
(সূরা আহজাব : আয়াত ৪৪)

...আর মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কৃপণ ঐ ব্যক্তি, যে সালামের ক্ষেত্রে কৃপণতা দেখায়।

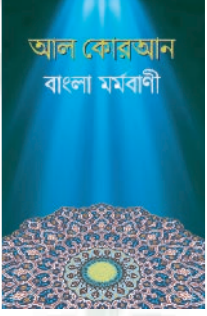
-আল-হাদীস
(ইবনু হিব্বান, আস-সহীহা : ৬০১)

পাওয়ার সহজ মাধ্যম।

- সবসময় প্রো-একটিভ থাকা যায়।
- হাসিমুখে সালাম যে-কারো সাথে ভুল বোঝাবুঝি দূর করতে বিশেষভাবে সাহায্য করে। সবখানে একটি ইতিবাচক আবহ সৃষ্টি হয়।
- বিনয়, শিষ্টাচার ও সদাচরণ আয়ত্ত করা যায় সহজে। ব্যক্তির আচরণকে পরিশীলিত করে।
- অহমবোধ কমে, যা আত্মিক উন্নতি সাধনে সহায়ক।
- যিনি নিয়মিত আগে সালাম দেন, তিনি আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হন। নেতৃত্বের গুণাবলি বিকশিত হয় তার চরিত্র ও আচরণে।
- এর মধ্য দিয়ে একটি সাদাকা বা সংকর্ম করার সুযোগ পাওয়া যায়। আন্তরিকভাবে অন্যের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা যায়।
- আন্তরিক সালাম বিনিময় পারস্পরিক সম্পর্কে মমতা বৃদ্ধি করে এবং পরিবারের সদস্যদের প্রতি প্রয়োজনীয় মনোযোগ দেয়া সহজ হয়।
- দাম্পত্য সম্পর্ক সুন্দর হয়। পারিবারিক সৌহার্দ্য-সম্প্রীতি ও শান্তি বাড়ে, যা সংসারে বরকত নিয়ে আসতে পারে।
- এক স্রষ্টার সৃষ্টি সব মানুষকে এক দৃষ্টিতে দেখার অনুপ্রেরণা দেয় সালামের চর্চা।
- শুকরিয়ার প্রকাশ ঘটে।
- গীবত-প্রবণতা কমে।
- পরিচিত-অপরিচিত, ছোট-বড় নির্বিশেষে সবাইকে আগে সালাম দেয়ার মাধ্যমে বিশ্বজনীন মমতা ও মানবিকতার বিকাশ ঘটে।
- সালাম বিনিময় আন্তঃসাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বাড়ায়।
- শ্রেণি-ভেদাভেদ দূর হয়। সমাজের সর্বস্তরে শান্তি প্রতিষ্ঠার পথ সুগম হয়।
- অন্যের জন্যে এটি একটি সুন্দর দোয়া।
- খুব সহজে করা যায় এমন একটি সাদাকা।
- কর্মক্ষেত্রে সবাইকে আগে সালাম দিলে উর্ধ্বতনদের কাছে ইতিবাচক ভাবমূর্তি তৈরি হয়।
- অধীনস্থদের সালাম দিলে কাজের প্রতি তাদের স্বতঃস্ফূর্ততা ও আন্তরিকতা বেড়ে যায়।
- চিকিৎসক আগে রোগীকে সালাম দিলে তার ওপর রোগীর আস্থা ও বিশ্বাস বাড়ে, যা নিরাময় প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।
- পারস্পরিক শান্তি কামনার মাধ্যমে একটি মানবীয় গুণ চর্চার সুযোগ ঘটে। ফলে সমাজে সুস্থ সংস্কৃতির চর্চা হয়, যা সামাজিক অবক্ষয় রোধ করতে পারে।
- তরুণ সমাজকে মন্দ থেকে ভালোর দিকে ফেরানো সম্ভব নিয়মিত সালাম দিয়ে। অপসংস্কৃতির পরিবর্তে সূচনা হবে সভ্য, সত্য ও সুন্দর সংস্কৃতির।
- ছোটদের আগে সালাম দিলে তাদের নৈতিক শিক্ষা লাভ সহজ হয়।
- পাশ্চাত্যের অর্থহীন সম্ভাষণ হাই-হ্যালো

কোয়ান্টাম প্রকাশনা

পূর্ণাঙ্গ কোরআনের সরল মর্মানুবাদ
আল কোরআন বাংলা মর্মবাণী



পবিত্র রমজান মাসের গুরুত্বই ফাউন্ডেশন প্রকাশ করেছে পূর্ণাঙ্গ কোরআনের সরল মর্মানুবাদ আল কোরআন বাংলা মর্মবাণী।

সহজ সাবলীল ভাষার এ মর্মবাণীটি প্রকাশের সাথে সাথেই সেবা প্রকাশনী সুলভ মূল্যে এর পেপারব্যাক সংস্করণ বের করে।

ইসলাম বিজ্ঞান মেডিটেশন

বরণ্য বিজ্ঞানী, ধর্মতাত্ত্বিক ও টিভি ব্যক্তিত্ব আল্লামা প্রফেসর ড. এম শমশের আলী কোয়ান্টামের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে আলোচনা করেছেন নানা বিষয়ে, যেখানে উঠে এসেছে ইসলামের সাথে আধুনিক বিজ্ঞানের উল্লেখযোগ্য যোগসূত্র এবং মেডিটেশনের চিরায়ত উপযোগিতার বিষয়টি। তার এ বৈচিত্র্যস্বাদ আলোচনাগুলোই সংকলিত হয়েছে এ বইটিতে।



এম শমশের আলী

সুস্থ দেহ প্রশান্ত মন



বিশ্বখ্যাত সাময়িকী, খ্যাতনামা মেডিকেল জার্নাল ও স্বাস্থ্য বিষয়ক ওয়েবসাইটগুলোতে প্রকাশিত সাম্প্রতিক তথ্য-উপাত্তের আলোকে লেখা স্বাস্থ্য নিবন্ধ নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হয় কোয়ান্টাম বুলেটিনে। সেগুলোরই সংকলন প্রকাশিত হয় ১ ফেব্রুয়ারি।

ভিডিও প্রকাশনা

- ☐ ঈদ মোলাকাত, ২০১৪ (পাঁচ মিনিট)
- ☐ মেরুদণ্ডের ব্যথা নিরাময় (সাত ও ৩০ মিনিট)
- ☐ শিশুসদন অ্যাট কোয়ান্টামম (তিন মিনিট)
- ☐ চ্যারিটি ব্রিংস প্রসপারিটি (২৪ মিনিট)
- ☐ দুই গুণীজনের সান্নিধ্যে (নয় মিনিট)
- ☐ জিমন্যাস্টিকস কোয়ান্টা (ছয় মিনিট)
- ☐ নেচার ইন কোয়ান্টামম (তিন মিনিট)
- ☐ সুখী পরিবার (৪০ মিনিট)
- ☐ নিরাপদ রক্তের জন্যে (২০ মিনিট)
- ☐ কোয়ান্টা হ্যান্ডবল (সাতই নয় মিনিট)
- ☐ ধ্যানসাফারি (তিন মিনিট)

কোয়ান্টাম মাটির ব্যাংক সংগ্রহ ১৯ কোটি ১১ লক্ষাধিক টাকা



অগণিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দানকে একত্র করতে পারলে সম্ভবভাবে অনেক বড় কাজ করা সম্ভব—এ বিশ্বাস নিয়েই ১৯৯৮ সালে কোয়ান্টাম মাটির ব্যাংক কার্যক্রমের যাত্রা শুরু।

এতে একদিকে যেমন বঞ্চিত মানুষের জন্যে শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি, স্বনির্ভরায়ন প্রকল্প ইত্যাদি সেবাসুযোগের কাজে সক্রিয়ভাবে অংশ নেয়া সম্ভব হচ্ছে, তেমনি দাতারা ব্যক্তিগত পারিবারিক পেশাগত সামাজিক—সবদিক থেকেই ভালো আছেন, প্রতিনিয়ত অনুভব করছেন করুণাময়ের করুণাধারা।

এককালীন দানে বিশেষ বরকত

গুরুজীর আহ্বানের প্রেক্ষিতে কর্মময় ২০১৪ কাটানোর শুকরিয়াস্বরূপ মাটির ব্যাংক জমা দেয়া ছাড়াও সাধ্যমতো এককালীন দান করেছেন কোয়ান্টাম পরিবারের অসংখ্য সদস্য।

দানের এ বাণী নিয়ে ছুটে গেছেন আত্মীয়, বন্ধু ও পরিচিতজনের কাছে। বলেছেন কোয়ান্টাম শিশুসদনের মেয়েশিশুদের ভরণপোষণ ও শিক্ষাসুযোগের জন্যে লামায় নতুন অবকাঠামো গড়ে তোলার কথা। বলেছেন নবীজীর সেই বাণী—যে ব্যক্তি কোনো বালিকাকে লালনপালন করে সদাচারী মানুষরূপে গড়ে তুলল, দোজখ ও তার মাঝখানে এই বালিকা দেয়াল হিসেবে থাকবে।

এ আহ্বানে সাড়া এসেছে স্বতঃস্ফূর্ত। এ বছর মাটির ব্যাংকে অর্থসংগ্রহের প্রবৃদ্ধি হয়েছে ৩২.৪১%। ১,৫৯,৬৭৬টি ব্যাংক থেকে সংগৃহীত হয় ১৯ কোটি ১১ লক্ষ ১৯ হাজার ৬৩২ টাকা।



ভ্যালি হিকমান, কোয়ান্টামম

ভ্যালি কোরবানের বর্তমান নাম। ২০১৫ থেকে সিনিয়র স্কুল ও কলেজ শাখার কোয়ান্টামদের আবাসন ও স্কুল কার্যক্রম স্থানান্তরিত হয়েছে এখানে। সম্পন্ন হয়েছে এ ক্যাম্পাসের ছয় হাজার বর্গফুটের নেয়ামাতান। তৈরি হয়েছে ৩৫টি টয়লেট ও দুটি ইউরিনাল। আর বাথরুমের ৭০০ বর্গফুট জুড়ে বসানো হয়েছে ১০টি টিউবওয়েল। এছাড়া বরকত ভ্যালিতে নির্মিত হয়েছে কোয়ান্টামমের মহিলা কর্মীদের থাকার জন্যে চার কক্ষবিশিষ্ট ২,২৪০ বর্গফুটের ও তিন কক্ষবিশিষ্ট ১,৬৮০ বর্গফুটের দুটি আবাসন।

মেডিটেশনভিত্তিক সর্বাধুনিক ওয়েবসাইট



সুস্থ দেহ প্রশান্ত মন কর্মব্যস্ত সুখী জীবনের বাণীকে বিশ্বমানসে ছড়িয়ে দিতে যাত্রা শুরু করেছিল কোয়ান্টাম ওয়েবসাইট। বলা যেতে পারে, মেডিটেশনের ওপর বর্তমানে এটি একটি সর্বাধুনিক ওয়েবসাইট, যা বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে একটি অনন্য পদক্ষেপ।

নতুন প্রযুক্তি

কোয়ান্টাম ওয়েবের এ বছরের টেকনিক্যাল কাজের একটি বড় অংশ জুড়ে ছিল নতুন প্রযুক্তি প্রয়োগ ও গবেষণা। প্রকাশিত হয়েছে আল কোরআন, নতুন ডাউনলোড পেজসহ আরো কয়েকটি ওয়েবসাইট।

আল কোরআন বাংলা মর্মবাণী ও অটোসাজেশন অ্যাপ

এ বছরে কোয়ান্টাম ওয়েবের অর্জনের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হলো আল কোরআন বাংলা মর্মবাণীর সাইট ও মোবাইল অ্যাপ। পবিত্র মাহে রমজানে প্রকাশিত হয় পূর্ণাঙ্গ আল কোরআন বাংলা মর্মবাণীর অনলাইন ও পিডিএফ সংস্করণ এবং মোবাইল অ্যাপ। হয়েছে সহস্রাধিক ডাউনলোড, বুটুথ বা পিয়ার টু পিয়ার শেয়ারের মাধ্যমে এ অ্যাপ এখন ব্যবহার করছে আট হাজারেরও বেশি মানুষ।

একটি বাক্যই বদলে দিতে পারে আপনার জীবন—এ কথাকে সামনে রেখে অটোসাজেশন অ্যাপটি তৈরি হয়েছে ইংরেজি ও বাংলা দুটি ভাষাতেই। রয়েছে গুরুজীর কণ্ঠে অটোসাজেশন শোনার সুযোগ।

কোয়ান্টাম স্বেচ্ছা রক্তদান কার্যক্রম

১৫ বছরে সাড়ে ছয় লক্ষ মানুষের পাশে

এক বছরে সরবরাহ ৯৭,০১৯ ইউনিট রক্ত ও রক্ত উপাদান

২০১৪ সালে কোয়ান্টাম ল্যাব থেকে সরবরাহ করা হয় ৯৭,০১৯ ইউনিট রক্ত ও রক্ত উপাদান, যা গত ১৫ বছরে সর্বোচ্চ। আর একদিনে সর্বোচ্চ সরবরাহ হয় ৪০৬ ইউনিট রক্ত ও রক্ত উপাদান।

ল্যাব সংগ্রহ বেড়েছে ২৮%

ল্যাবে এসে রক্ত দিলেই সম্ভব হয় এক ব্যাগ রক্ত থেকে রেড সেল কনসেন্ট্রেট, প্লেটলেট কনসেন্ট্রেট, প্লেটলেট রিচ প্লাজমা, প্লেটলেট পুওর প্লাজমা, ফ্রেশ ফ্রোজেন প্লাজমা, ফ্রেশ প্লাজমা এবং ক্রোয়া প্রিসিপিটেট-এর মতো গুরুত্বপূর্ণ উপাদানগুলো আলাদা করে অসংখ্য প্রাণ বাঁচানোর সুযোগ।

এ বছর ল্যাব থেকে সংগ্রহ ছিল ক্যাম্প সংগ্রহের তিন গুণ বেশি। ল্যাবে মোট সংগৃহীত হয় ৪৪,৬০৬ ইউনিট রক্ত।

বেড়েছে রক্তদাতার সংখ্যাও

নিরাপদ রক্তের সেবাকে আরো গতিশীল করতে এ বছর যুক্ত হয়েছে তিনটি নতুন বেড। এখন একসাথে ১১ জন রক্তদাতা কোয়ান্টাম ল্যাবে রক্তদান করতে পারছেন। এ বছর প্রথমবারের মতো রক্ত দিয়েছেন ২৯,৯৫৮ জন, যা গত বছরের চেয়ে ২,৯৪৫ জন বেশি। লাইফ লং ডোনার হয়েছেন ৩,৩৯৯ জন। সিলভার ক্লাব ডোনার হয়েছেন ৭৪৫ জন। গোল্ডেন ক্লাব ডোনার হয়েছেন ১২৪ জন আর প্লাটিনাম ক্লাব ডোনার হয়েছেন একজন। তরুণ প্রজন্মকে রক্তদানে উদ্বুদ্ধ করতে বছরের ২১টি অজুয়ে ১৯ কার্যক্রমে সম্পৃক্ত হয়েছেন ২,৭১০ জন সম্ভাব্য রক্তদাতা।

২০১৪ সালের দৈনিক ও মাসিক পরিসংখ্যান

- ☐ একদিনে ল্যাবে সর্বোচ্চ রক্ত সংগ্রহ ১৮ জুলাই, ২১৩ ইউনিট
- ☐ ১৫ আগস্ট সর্বোচ্চ ৯৩ জন প্রথমবার ল্যাবে এসে রক্তদান করেন
- ☐ ৪ নভেম্বর সর্বোচ্চ ১৩২ জন আজীবন রক্তদাতা রক্তদান করেন
- ☐ ল্যাবে সর্বোচ্চ রক্ত সংগ্রহ আগস্ট মাসে, চার হাজার ৩৪২ ইউনিট
- ☐ ক্যাম্পে সর্বোচ্চ রক্ত সংগ্রহ জুন মাসে, এক হাজার ৭৯৬ ইউনিট
- ☐ সর্বোচ্চ রক্ত সরবরাহ মার্চ মাসে, নয় হাজার ২৩৯ ইউনিট
- ☐ ল্যাব ও ক্যাম্প মিলিয়ে সর্বোচ্চ রক্ত সংগ্রহ মার্চ মাসে, পাঁচ হাজার ৪৪৭ ইউনিট
- ☐ আজীবন রক্তদাতাদের মাসিক গড় উপস্থিতি ছিল ৭০
- ☐ মাসিক গড় সরবরাহ আট হাজার ৮৫ ইউনিট

বিপ্লবের পাশে আছে সবসময়ই

থ্যালাসেমিয়াসহ বিভিন্ন রোগে নিয়মিত রক্ত প্রয়োজন হয় এমন বধিহত পরিবারের প্রায় সাত শ রোগীকে প্রতিমাসে বিনামূল্যে অর্থাৎ কোনোরকম প্রসেসিং খরচ ছাড়াই রক্ত প্রদান করা হচ্ছে।

এ বছর মোট সরবরাহের মধ্যে সামর্থ্যহীনদের জন্যে বিনা প্রসেসিং খরচে ৩,১৩০ ইউনিট ও সীমিত সামর্থ্যবানদের জন্যে ন্যূনতম প্রসেসিং খরচে ৪,৮৯১ ইউনিট রক্ত ও রক্ত উপাদান সরবরাহ করা হয়।

একদিনের ব্লাড ক্যাম্পে এ যাবৎকালের সর্বোচ্চ সংগ্রহ

১৮ ডিসেম্বর কেয়া গ্রুপের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয় একদিনের সর্বোচ্চ সংগ্রহের ব্লাড ক্যাম্প। কেয়া নিট কম্পোজিট প্রাঙ্গণে সকাল ৮টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত রক্তদানের উদ্দেশ্যে কেয়া গ্রুপের সর্বস্তরের কর্মীদের ছিল উপচে পড়া ভিড়। সারাদিনে সংগৃহীত হয় মোট ১,৪০৬ ইউনিট রক্ত।

বছরব্যাপী আয়োজিত মোট ২৬৫টি ব্লাড ক্যাম্প (বেড ক্যাম্প ও মোবাইল ভ্যান) থেকে সংগ্রহ হয় ১৩,৯০৩ ইউনিট রক্ত।

কোয়ান্টাম আইসিটি কার্যক্রম প্রযুক্তিদক্ষ সৎ মানুষ গড়ে উঠছে

বিশ্বমানের প্রযুক্তি-জ্ঞানে দক্ষ লাখো টেকনোটিয়ার গড়ে তোলার স্বপ্ন নিয়ে ফাউন্ডেশনে ২০১২ সালে শুরু হয় কোয়ান্টাম আইসিটি কার্যক্রম। প্রথম পদক্ষেপ ছিল বেসিক কম্পিউটিং প্রোগ্রাম। ক্রমান্বয়ে বিকশিত হয় এর কার্যক্রম।

এ বছর বেসিক কম্পিউটিং প্রোগ্রামের কোর্স ঢাকায় হয়েছে ৩৯টি, অংশগ্রহণ করেছেন ৩১৮ জন (পুরুষ ২০৮ ও মহিলা ১১০); রাজশাহীতে হয়েছে ১৫টি ব্যাচ, অংশ নিয়েছেন ৫১ জন (পুরুষ ৩৪ ও মহিলা ১৭)। বেসিক হার্ডওয়্যার প্রোগ্রামের কোর্স হয়েছে ২৯টি, অংশ নিয়েছেন ১৬৭ জন (পুরুষ ১৩৩ ও মহিলা ৩৪)। বেসিক কম্পিউটিং মাসিক প্রোগ্রাম অনুষ্ঠিত হয়েছে নয়টি।

এ বছর নতুন শুরু হওয়া কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে কোয়ান্টাম ইথিক্যাল হ্যাকিং এন্ড কাউন্টার ম্যানেজমেন্ট প্রোগ্রাম, দুমাসব্যাপী প্রফেশনাল গ্রাফিক্স ডিজাইন প্রোগ্রাম এবং দুদিনব্যাপী সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশন (SEO) প্রোগ্রাম।

৪ এপ্রিল পর্যন্ত কোয়ান্টাম ক্লাবের ১৪টি সাদাকায়ন অনুষ্ঠিত হয়। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক আলোচনা আরো কার্যকরী করার লক্ষ্যে কোয়ান্টাম সাদাকায়নের পরিবর্তে ৯ মে থেকে বিষয়ভিত্তিক সেমিনার শুরু হয়। এ বছর তিনটি সেমিনারে ১৩০ জন অংশ নেন (পুরুষ ১০৭ ও মহিলা ২৩)।

১৮ এপ্রিল থেকে শুরু হয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক দিনব্যাপী ওয়ার্কশপ। ১৩টি ওয়ার্কশপে ৮৯ জন অংশ নেন (পুরুষ ৭১ ও মহিলা ১৮)।

ব্যারিস্টার এম. আমীর-উল ইসলাম সমাজ-সচেতন মানুষ তৈরি করছে কোয়ান্টাম



১২ ডিসেম্বর জাতীয় প্রেস ক্লাবে কোয়ান্টাম স্বেচ্ছা রক্তদান কার্যক্রম আয়োজিত রক্তদাতা সম্মাননা অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত হন বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রের রচয়িতা, বাংলাদেশের সংবিধানের অন্যতম প্রণেতা ও মহান মুক্তিযুদ্ধের সফল সংগঠক বিশিষ্ট আইনজীবী ব্যারিস্টার এম. আমীর-উল ইসলাম। তিনি বলেন, সমাজের রক্তক্ষরণ বন্ধে চাই মানবিক দায়িত্ববোধসম্পন্ন সমাজ-সচেতন মানুষ। কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন সেই সমাজ-সচেতন মানুষই তৈরি করছে। স্বেচ্ছা রক্তদাতাদের মাধ্যমে নিঃস্বার্থভাবে মানুষকে রক্ত দেয়ার পাশাপাশি সমাজকেও বাঁচিয়ে রাখছে কোয়ান্টাম।

আবশ্যিক

কোয়ান্টাম কসমো স্কুল ও কলেজের জন্যে শিক্ষক/শিক্ষিকা/আবাসিক শিক্ষক (ন্যূনতম আর্নাস পাশ), বিজ্ঞান বিভাগের জন্যে (পদার্থ বিজ্ঞান, রসায়ন, জীব বিজ্ঞান, উচ্চতর গণিত) শিক্ষক/শিক্ষিকা আবশ্যিক। বিএও নিবন্ধনকৃত প্রার্থীরা অগ্রাধিকার পাবেন। শিশুকানন ও শিশুসদনের শিক্ষার্থীদের দেখাশোনার জন্যে ব্রাদার, সিস্টার (ন্যূনতম এসএসসি পাশ) ও সিকিউরিটি গার্ড আবশ্যিক।

এছাড়াও কোয়ান্টাম-এর জন্যে কিছু সংখ্যক ডিপ্লোমা কৃষিবিদ, মালি, মাঠকর্মী প্রয়োজন। অগ্রহীরা যোগাযোগ করুন:

কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন

৩১/ভি শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদীন সড়ক, শান্তিনগর, ঢাকা-১২১৭

সুস্থতার বিশ্বাস
ফিরে পেয়েছি
শতভাগ
বিজ্ঞানী আজাদুল ইসলাম



কোর্সের প্রথমদিন দেখলাম, আমি এখানে সবচেয়ে প্রবীণ। কিন্তু চার দিন ধরে গুরুজীর আলোচনা শুনে আমি এতটাই উজ্জীবিত-মনে হচ্ছে, আমি এখন সবচেয়ে নবীন। কোয়ান্টামের মতো আর কেউ আমাকে এমন অভিভূত করতে পারে নি।

কিছুদিন আগে বাংলাদেশে আসি। প্রচণ্ড শ্বাসকষ্ট নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হই। আগে দুবার আমার হার্ট অ্যাটাক হয়েছে। চিকিৎসকরা জানালেন, বাঁচার কোনো আশা নেই। আমার দিন গণনা শুরু হয়ে গেছে। আমার হার্টের অপারেশনের জন্যে বিশ্বের প্রথমসারির হৃদরোগ বিশেষজ্ঞের সাথে যোগাযোগ করা হলো। তিনি জানালেন, এই অপারেশনের জন্যে ব্যয় হবে এক কোটি টাকা! আমি সমস্ত জমিজমা ভাগ-বাটোয়ারা করে দিয়ে আত্মীয়-পরিজন সবার কাছ থেকে চিরবিদায় নিয়ে নিলাম।

ওয়াশিংটন যাওয়ার সব ব্যবস্থা যখন সম্পন্ন, তখন পরিচিত একজনের উৎসাহে কোয়ান্টাম কোর্সে এলাম, যদিও চিকিৎসক আমার চলাফেরার ব্যাপারে নানারকম বিধিনিষেধ দিয়েছেন। অথচ কোর্সের দ্বিতীয় দিন থেকেই আমি অনেকটা ভালো বোধ করছি। নিজেই একজন সুস্থ মানুষ বলে মনে হচ্ছে। বিশ্বাস করছি, আমার আর অপারেশনের প্রয়োজন নেই। আর এ বিশ্বাস ৯৯ ভাগ নয়, শতভাগ।

আমি মনে করি, বাংলাদেশের প্রতিটি মানুষের কোয়ান্টাম মেথড কোর্সে অংশ নেয়া উচিত। একজন মানুষ যদি পূর্ণ আস্থা ও মনোযোগ সহকারে কোয়ান্টামের শিক্ষাকে আত্মস্থ করতে পারে, সে অবশ্যই জীবনে সফল হবে।

[সৌদি আরবস্থ কিং ফাহাদ ইউনিভার্সিটির নিউক্লিয়ার রি-একটর এন্ড নিউক্লিয়ার ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের অধ্যাপক ও বিজ্ঞানী ড. মো. আজাদুল ইসলাম। ৩৮১ ব্যাচের প্রত্যয়নে তিনি একথা বলেন।]



চিকিৎসাবিজ্ঞানের সাম্প্রতিক গবেষণা মেডিটেশন করুন ইতিবাচক হোন পাবেন প্রশান্তি ও দীর্ঘ জীবন

মেডিটেশনের উপকারিতা জীবনের সর্বক্ষেত্রেই বিস্তৃত—এ বিষয়টি আজ এই একবিংশ শতাব্দীতে বিজ্ঞানী ও গবেষক মহলেই শুধু স্বীকৃত নয়, বরং সর্বসাধারণে গৃহীত ও নানাভাবে পরীক্ষিত একটি সত্য। তাই এ নিয়ে উত্তরোত্তর গবেষণার অন্ত নেই সারা পৃথিবী জুড়েই। যার ফলে প্রতিনিয়তই আমরা জানতে পারছি মেডিটেশনের আরো নতুন নতুন কার্যকারিতা ও উপযোগিতার আশাবাদ খবর।

সম্প্রতি বিশ্বখ্যাত টাইম ম্যাগাজিন একটি প্রচ্ছদ নিবন্ধ প্রকাশ করেছে (২৩ ফেব্রুয়ারি ও ২ মার্চ, ২০১৫), যেখানে যুক্তরাষ্ট্রের একাধিক বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথমসারির বিজ্ঞানী, গবেষক, অধ্যাপকদের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত গবেষণা-কার্যক্রমের ভিত্তিতে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, নিয়মিত মেডিটেশনের মাধ্যমে প্রশান্ত জীবনযাপন, সুস্থ জীবনচারা এবং ইতিবাচক ও আশাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি আমাদের বার্ষিক্যগতিকে বিলম্বিত করে। অর্থাৎ আয়ু বাড়ায়।

সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞানীরা সকলেই বলছেন, এ এক যুগান্তকারী উদ্ভাবন। আর এ বিজ্ঞানীদলে আছেন জীবনধারা পরিবর্তনের মাধ্যমে করোনারি হৃদরোগ নিরাময় ও প্রতিরোধ ব্যবস্থার সফল পথিকৃৎ ডা. ডীন অরনিশ এবং চিকিৎসাবিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কারে ভূষিত যুক্তরাষ্ট্রের বর্ষীয়ান চিকিৎসাবিদ ও মনোবিজ্ঞানীরা।

তারা বলছেন, নিয়মিত মেডিটেশন, বিজ্ঞানসম্মত খাদ্যাভ্যাস, ব্যায়াম, পর্যাপ্ত ঘুম ও জীবনের প্রতি আশাবাদী-ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি দেহকোষের অভ্যন্তরস্থ টেলোমেরার—



এর স্বাভাবিক দৈর্ঘ্যহ্রাসকে প্রভাবিত করে, যার ফলে বার্ষিক প্রক্রিয়া ঘটে তুলনামূলক ধীর গতিতে।

শুধু তা-ই নয়, নিয়মিত মেডিটেশনকারীদের ক্ষেত্রে মস্তিষ্কের বয়সজনিত নিউরোন-ক্ষয়ও অন্যান্যদের তুলনায় কম। তারা হতাশা-বিষণ্ণতার মতো নেতিবাচক আবেগ-অনুভূতিতে আক্রান্ত হন কম। এমনকি হার্টের বাইপাস অপারেশনের পরও যারা এমন জীবনচারাে অভ্যস্ত হয়ে উঠতে পারেন তাদের পরবর্তী যে-কোনো হৃৎ-জটিলতা ও পুনরায় হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার আশঙ্কা কমে যায় অনেকখানি।

সাম্প্রতিক গবেষণালব্ধ এসব গুরুত্বপূর্ণ তথ্য-উপাত্তের ভিত্তিতে চিকিৎসাবিজ্ঞানীরা বলছেন, চিকিৎসক হিসেবে আমাদের উচিত রোগীকে এসব বিষয় ভালোভাবে বুঝিয়ে বলা, যাতে তারা মন ও দেহের সম্পর্কের বিষয়টি সুন্দরভাবে বুঝতে ও উপলব্ধি করতে পারে।

(বিস্তারিত ৩য় পৃষ্ঠায়)

অগ্নিদগ্ধ
রোগীদের
জরুরি
চিকিৎসার
প্রয়োজনে



ল্যাভে এসে রক্ত দিন

বার্ন ইউনিটে চিকিৎসাধীন অগ্নিদগ্ধ (বার্ন) রোগীদের জরুরি ও দীর্ঘমেয়াদি চিকিৎসার্থে প্রয়োজন রক্তের একটি বিশেষ উপাদান ফ্রেশ ফ্রোজেন প্লাজমা (এফএফপি)। আর গত দেড় দশক ধরে নিরাপদ রক্তের চাহিদা পূরণে অনন্য আস্থা অর্জনের দরুন চিকিৎসক ও সংশ্লিষ্টরা এখন প্রথমেই রোগীর স্বজনদের পাঠান কোয়ান্টাম ল্যাভে। ফলে দিন দিন ল্যাভে বেড়ে চলেছে জরুরি রক্তের চাহিদা।

সাম্প্রতিককালে বার্ন ইউনিটে এফএফপি-র চাহিদা বেড়ে যাওয়ায় গুরুজী শহীদ আল বোখারী মহাজাতক ফাউন্ডেশনের সর্বস্তরের সদস্য ও রক্তদাতাদের ল্যাভে এসে রক্ত দেয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। সেন্টার শাখা সেল প্রি-সেল-এর আর্ডেন্টারদের প্রতি তিনি বিশেষ আহ্বান জানিয়েছেন—নিজেরা ল্যাভে এসে রক্ত দেয়ার পাশাপাশি বন্ধু-আত্মীয়-পরিচিত সবাইকে এ-কাজে উদ্বুদ্ধ করুন।

উল্লেখ্য, ২০১৪ সালে অগ্নিদগ্ধ রোগীদের চিকিৎসায় বার্ন ইউনিটে প্রয়োজনীয় ফ্রেশ ফ্রোজেন প্লাজমা-র একটি বড় অংশ—২০,৮৮৪ ইউনিট সরবরাহ করেছে কোয়ান্টাম ল্যাভ।

মুমূর্ষের সেবায় আমাদের সবার আন্তরিক ও সং প্রচেষ্টা পরম করণাময় কবুল করুন।

ঢাকা, যশোর ও খুলনায় কোয়ান্টাম মেথড

৩৮৭ তম কোর্স ৥ ঢাকা
২০, ২১, ২২ ও ২৩ মার্চ
(শুক্র, শনি, রবি ও সোমবার)
স্থান : ইনস্টিটিউশন অব ডিপ্লোমা
ইঞ্জিনিয়ারিং বাংলাদেশ (আইডিইবি),
কাকরাইল, ঢাকা

৩৮৮ তম কোর্স ৥ যশোর
২৬, ২৭, ২৮ ও ২৯ মার্চ
(বৃহস্পতি, শুক্র, শনি ও রবিবার)
স্থান : সিসিটিএস অডিটোরিয়াম, যশোর

৩৮৯ তম কোর্স ৥ খুলনা
১০, ১১, ১২ ও ১৩ এপ্রিল
(শুক্র, শনি, রবি ও সোমবার)
স্থান : সিএসএস আভা সেন্টার, খুলনা

অদম্য জীবনযাত্রী ফয়সাল রহমান। শৈশবে মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় চলাফেরার শক্তি হারান। এরপর খেমে থাকেন নি। এগিয়ে চলেছেন একের পর এক বাধা জয় করে। পড়াশোনা, পেশা, সংগঠন সবদিকেই তার সাফল্য উল্লেখযোগ্য। প্রতিবন্ধীদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, স্বনির্ভরতায় এগিয়ে নেয়ার লক্ষ্যে ঝালকাঠিতে গড়ে তুলেছেন প্রতিবন্ধী উন্নয়ন সংস্থা। বিভিন্ন সময়ে জেলা, বিভাগীয় ও জাতীয় পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ যুব সংগঠক এবং জেলা পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ শিক্ষক হিসেবে পুরস্কৃত হন তিনি। বর্তমানে ঝালকাঠি সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ে শিক্ষকতার পাশাপাশি প্রতিবন্ধী উন্নয়ন সংস্থা-র নির্বাহী প্রধানের দায়িত্ব পালন করছেন। অক্লান্ত কর্মোদ্যমী ফয়সাল কোয়ান্টাম মেথডের ৩৫৬ তম ব্যাচে অংশ নেন। কোয়ান্টাম বুলেটিনের সাথে একান্ত সাক্ষাৎকারে তিনি শুনিয়েছেন তার জীবন জয়ের গল্প।

আমি আমার লক্ষ্যে পৌঁছব

ফয়সাল রহমান

১৯৮৭ সাল। আমি তখন সপ্তম শ্রেণির ছাত্র। স্কুল থেকে ফেরার পথে একদিন এক আকস্মিক ট্রেন দুর্ঘটনার শিকার হই। আঘাত পাই মাথায়, মেরুদণ্ডে। শরীরের নিচের দিকটা ধীরে ধীরে প্যারালাইজড হতে শুরু করে।

সময়টা ছিল ভীষণ কঠিন। চলৎশক্তি হারিয়ে দুঃসহ বিষণ্ণতায় ভুগছিলাম। একা একটা অন্ধকার ঘরে উপুড় হয়ে শুয়ে থাকতাম দিনরাত। টানা নয় মাস সূর্যের আলো দেখি নি। আলো চোখে পড়লে, মানুষ দেখলে চিৎকার-চৈতামেচি করে বাড়ি মাথায় তুলতাম। মা ছাড়া আর কেউ আমার ঘরে ঢুকতে পারত না।

যেদিন প্রথম হুইল চেয়ারে বসলাম, মনে হয়েছিল পৃথিবীটা কী সুন্দর! দেশে-বিদেশে চিকিৎসার পর ১৯৮৮ সালে সিআরপি-তে ভর্তি হই। সাত জন পক্ষাঘাতগ্রস্ত রোগী নিয়ে সাভারে একটা ছোট টিনের ঘরে আমাদের কার্যক্রম শুরু হয়।

সিআরপি-র প্রতিষ্ঠাতা ও সমন্বয়ক মহীয়সী ভ্যালারি টেইলরের মাতৃস্নেহময় স্তম্ভা পেলাম ওখানে। সেই স্নেহ আজও অটুট আছে। তিনি বেশ সাহস দিতেন। একসময় বললেন, তুমি আবার পড়াশোনা শুরু করো।

মা আর স্কুলের প্রধান শিক্ষক কাজী ইমদাদুল হকও পড়াশোনা শুরু করতে উৎসাহ দিলেন। স্যার বললেন, হতে পারে তুমি হুইল চেয়ারে চলাফেরা করো, কিন্তু তোমার দ্বারা অনেক বড় কিছু করা সম্ভব। হেলেন কেলার, আইনস্টাইন, হোমারের উদাহরণ দিয়ে তিনি বললেন, শৈশবে এদের সবারই নানারকম সীমাবদ্ধতা ছিল। কিন্তু ইচ্ছাশক্তি ও কাজ দিয়ে তারা সেটি জয় করেছেন। তুমিও পারবে। তারপর তিনি নিজেই একদিন স্কুলে নিয়ে গেলেন।

স্কুলে অন্যদের মতো পায়ে হেঁটে সিঁড়ি বেয়ে ক্লাসে যেতে পারতাম না। রেলিংয়ের ওপর হাতে ভর দিয়ে ধীরে ধীরে অনেক সময় নিয়ে উঠতে হতো। ফলে প্রায় দিনই হাতের নিচের নরম চামড়া ছিলে যেত। বাড়ি ফিরলে মা সেখানে মলম লাগিয়ে দিতেন আর কাঁদতে কাঁদতে বলতেন, তোমার আর স্কুলে যাওয়া লাগবে না। এত কষ্ট করার দরকার নেই। আমার যা সম্পত্তি আছে, তোমাকে দিয়ে যাব। ভালোভাবে খেয়ে-পরে চলতে পারবে। এখন না হয় আমি দেখছি, আমি মারা গেলে তোমাকে কে দেখবে?

কিন্তু আমার মনে হতো, কেন আমি পারব না? চেষ্টা তো করে দেখি। একটা জেদ কাজ করতে সবসময়-আমাকে পড়াশোনা করতে হবে। আমার জীবন গড়ে নিতে হবে আমাকেই। তাই কখনোই বলি নি যে, আমি পারব না। আমার আত্মবিশ্বাস দেখে সহপাঠী-বন্ধুরাও কখনো বলে নি, তুমি পারবে না। আর মা সবসময় একটা কথা বলতেন, আমি তোমার জন্যে দোয়া করি, তুমি একদিন অনেক বড় হবে। মা-র এ কথাটা আমাকে প্রতিনিয়ত শক্তি যোগায়। একটা দৃঢ় বিশ্বাস জন্মায় যে, আমি আমার লক্ষ্যে পৌঁছব।

১৯৯৮ সালে মা মারা যান। তখনই আমি জীবনের সবচেয়ে বড় ধাক্কাটা খাই। এর আগে মা-ই ছিলেন আমার সব। হঠাৎই তাকে হারিয়ে রীতিমতো দিশেহারা হয়ে যাই আমি।

এর আগে অবশ্য আমি প্রথম বিভাগে এসএসসি, তারপর এইচএসসি এবং ঢাকা কলেজ থেকে সমাজবিজ্ঞানে অনার্স, মাস্টার্স করেছি। পরবর্তীতে বিএড, এমএড, এলএলবি ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এমবিএ সম্পন্ন করি। আরো দুটো মাস্টার্স করেছি শিশু-বিকাশ ও জনস্বাস্থ্য বিষয়ে। বর্তমানে পিএইচডি করছি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণা কেন্দ্রে। অংশ নিয়েছি শতাধিক প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে। জেন্ডার, ডিজ-অ্যাবিলিটি, এইচআইভি ইত্যাদি বিষয়ে



আমি নিজেও প্রশিক্ষণ দেই এবং সৃজনশীল পদ্ধতিসহ আরো কিছু বিষয়ে আমি একজন মাস্টার ট্রেনার। এছাড়াও পড়াশোনায় পাশাপাশি বিভিন্ন বেসরকারি প্রতিষ্ঠান এবং পরে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেছি। মাঝে একবার বিসিএস লিখিত পরীক্ষা পর্যন্ত উত্তীর্ণ হয়েছিলাম, ইচ্ছে ছিল প্রশাসন ক্যাডারে যোগ দেবো, মৌখিক পরীক্ষায় গিয়ে আর ওটা হয় নি।

২০০০ সালে ভ্যালারি টেইলরের উৎসাহ ও অনুপ্রেরণায় প্রতিবন্ধীদের নিয়ে কাজ শুরু করি। সবার সহযোগিতায় যাত্রা শুরু করে প্রতিবন্ধী উন্নয়ন সংস্থা। আমার বিশ্বাস, একটুখানি সুযোগ করে দিলে প্রতিবন্ধীরা নিজেরাই নিজেদের জীবন গড়ে নিতে পারে। সমাজে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারে। আর তারা তো সমাজেরই অংশ, কেন তাদেরকে নিয়ে কেউ ভাববে না?

এ সংগঠনের সদস্যরা আমাকে তাদের পরিবারের সদস্য বলেই মনে করে, আমার ওপর তাদের অভূতপূর্ব আস্থা। বছর কয়েক আগে সড়ক দুর্ঘটনায় কিছুটা আহত হয়েছিলাম। একজন প্রতিবন্ধী, যার পা নেই, তিনি হাতের ওপর ভর দিয়ে আমি মাইল পথ হেঁটে আসেন আমাকে দেখতে। ওদের এই ভালবাসাটা আমি সবসময় অনুভব করি। আর এ-কাজটা আমি করি সম্পূর্ণ অবৈতনিকভাবে, যদিও বিভিন্ন প্রকল্পে আমার জন্যে বেতন নির্ধারিত থাকে; তবু নিই না, যেহেতু সরকারি স্কুলে শিক্ষকতা করি।

২০০৬ সাল থেকে ঝালকাঠি সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করছি। একসময় বিভিন্ন জায়গায় বদলির কারণে সংগঠনের কাজে অসুবিধা হচ্ছিল। সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম চাকরি ছেড়ে দেবো। বর্তমান প্রধানমন্ত্রীকে কথটা জানালে তিনি উৎসাহ ও পরামর্শ দিয়ে বলেছিলেন, 'তুমি চাকরিটা করো, ছেড়ো না। এমনিতেই আমাদের সমাজে প্রচলিত আছে যে, প্রতিবন্ধীদের কোনো কাজ দিলে তারা সেটা করতে পারে না। তুমি চাকরি ছেড়ে দিলে এ ভুল ধারণাটাই আরো প্রতিষ্ঠিত হবে।'

সেই থেকে শিক্ষকতা এবং তার পাশাপাশি সংস্থা-র কাজ করে যাচ্ছি। আমার এ নানামুখী কর্মকাণ্ডে কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশনের সাথে একাত্মতা আমাকে উদ্যম যোগায়। ২০১৩ সালে ঝালকাঠির তৎকালীন জেলা প্রশাসক অশোক কুমার বিশ্বাস ও অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক এ কে এম সোহেল স্যারের ঐকান্তিক আগ্রহ ও সহযোগিতায় আমি কোয়ান্টাম মেথড কোর্সে অংশ নিই। জীবনের প্রতি আমার দৃষ্টিভঙ্গিটা তারপর থেকে অনেক প্রসারিত হয়েছে। ব্যাপক পরিবর্তন ঘটেছে আমার খাদ্যাভ্যাস ও সামগ্রিক জীবনচা্রে।

মেরুদণ্ডে প্রচণ্ড ব্যথা আর ঘুমের সমস্যার কারণে একসময় প্রচুর ওষুধ খেতে হতো। মরফিন, প্যাথেনডিন পর্যন্ত নিতাম। এছাড়াও শারীরিক কিছু অসুবিধার কারণে প্রতিদিনই এন্টিবায়োটিক খেতে হতো। কিন্তু নিয়মিত মেডিটেশন শুরু করার পর থেকে গত দেড় বছর যাবৎ কোনো ওষুধ খাই নি, এমনকি একটা প্যারাসিটামলও নয়। এখন আমি সত্যিই আগের চেয়ে অনেক সুস্থ ও কর্মময় জীবনযাপন করছি।

এখন সবসময় শুকরিয়া অনুভব করি ভেতর থেকেই। মনে হয়, স্রষ্টার কাছ থেকে প্রতিনিয়ত কত যে আনুকূল্য পাচ্ছি! আজ স্বপ্ন দেখি যে, আমি হাঁটছি, হেঁটে ফাউন্ডেশনের কাজ করছি। হেঁটে হেঁটে কোয়ান্টামের কল্যাণবাণী পৌঁছে দিচ্ছি মানুষের কাছে।

আর আমি বিশ্বাস করি, ফাউন্ডেশন আজ যেভাবে সমাজের দুস্থ বঞ্চিত নিগৃহীত মানুষের জন্যে ভাবছে, কাজ করে যাচ্ছে, প্রতিবন্ধীদের সুস্থ কর্মময় স্বনির্ভর জীবনযাপনের জন্যেও একদিন ঠিক সেভাবে ভাববে। উদ্যোগী হবে। গ্রহণ করবে সুচিন্তিত ও কার্যকর পদক্ষেপ। যাতে প্রতিবন্ধীরাও একদিন অনুভব করতে পারেন যে, তারাও মানুষ। সবকিছুতেই তাদেরও সমান অধিকার।

সাক্ষাৎকার গ্রহণ ও অনুলিখন : ডা. আতাউর রহমান

মেডিটেশন করুন ইতিবাচক হোন পাবেন প্রশান্তি ও দীর্ঘ জীবন

চল্লিশ পেরোলেই চালশে?

আজকে যে বেপেরোয়া বিজ্ঞান/শান্ত সুবোধ হবে কাল সে/চোখের সঙ্গী হবে চশমা/চল্লিশ পেরোলেই চালশে...। শান্ত সুবোধ হতে কিছুমাত্র দোষ নেই, কিন্তু চল্লিশ পেরোলেই চালশে? এ-ই কি নিয়তি? আধুনিক বিজ্ঞানের সাম্প্রতিক গবেষণা বলছে, এ অবধারিত নয়। নিয়মিত মেডিটেশনের মধ্য দিয়ে প্রশান্ত জীবনযাপন, ব্যায়াম, বিজ্ঞানসম্মত খাদ্যাভ্যাস এবং আশাবাদী ও ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি বার্ষিক প্রক্রিয়াকে বিলম্বিত করে। আয়ু বাড়ায়। দীর্ঘদিন যাবৎ একজন মানুষ থাকতে পারেন মনোদৈহিকভাবে সজীব, উচ্ছল, কর্মময়।

বিজ্ঞানীরা জানাচ্ছেন, আপনার মুড, অনুভূতি, চিন্তাভাবনা সবকিছুই প্রভাবিত করে আপনার শরীর ও শারীরবৃত্তীয় কার্যক্রমকে। তাই স্বাস্থ্যগবেষকদের পরামর্শ হলো, দেহমনে শিথিল হতে শিখুন। তাতে আপনার রক্তচাপ থাকবে স্বাভাবিক, বিষণ্ণতা-হতাশার মতো নেতিবাচক অনুভূতিগুলো হ্রাস পাবে। দেহের রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা হয়ে উঠবে আরো সহজ ও কার্যকর।

তাই নয় শুধু, হাড়ের গঠন মজবুত ও হাড় সুরক্ষা, করোনারি হৃদরোগ নিরাময় এবং বয়সজনিত নিউরোন-ক্ষয় প্রতিরোধেও মনের আছে একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা। গবেষকরা তাই বলছেন, আপনি আসলে ততটাই বৃদ্ধ, যতটা আপনি নিজেকে মনে করেন।

মেডিটেশন ও ইতিবাচকতা দেবে দীর্ঘ জীবন

হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের সাইকোলজির প্রফেসর এলেন ল্যান্ডার। গত প্রায় ৪০ বছর ধরে তিনি বার্ষিকের সাথে মনের সংযোগ নিয়ে গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছেন। তিনি বলেন, যখন আমরা আমাদের মনের যত্ন নিই তখন আসলে শরীরেরও যত্ন নিই। কারণ, শরীর চলে মনকে অনুসরণ করেই। এ দুটো মোটেই আলাদা কোনো সত্তা নয়। আর এটা যখন আপনি উপলব্ধি করবেন তখন মেডিটেশন, আশাবাদ, সহিষ্ণুতা ও সামাজিক যোগাযোগের মতো জীবন-অভ্যাসগুলো অনুসরণ করা আপনার জন্যে হবে অনেক সহজ, যা শেষ পর্যন্ত আপনাকে নিয়ে যাবে দীর্ঘ জীবনের পথে।

এমনকি দেখা গেছে, কেবল একদিনের মেডিটেশন চর্চাও দেহে অকারণ প্রদাহের জন্যে দায়ী জিনগুলোকে স্তিমিত করে রাখতে সক্ষম, বার্ষিক রোধে এর রয়েছে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা। আর মেডিটেশনের প্রথম উপকার হলো স্ট্রেসমুক্তি, যা দেহে ফ্রি-র্যাডিকেলের (দেহকোষ-ধ্বংসী উপাদান) বিনাশ ঘটায়।

‘তাই মেডিটেশন হওয়া চাই আমাদের দৈনন্দিন জীবনের একটি নিয়মিত অভ্যাস। কারণ বিশ্বজুড়ে পরিচালিত একাধিক গবেষণার ভিত্তিতে আমরা বলতে পারি, একজন মানুষ কখন বার্ষিক উপনীত হবে তা শুধুই তার জিনগত বৈশিষ্ট্য নয়, বরং আমাদের জীবনযাপনও এতে বেশ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখে।’-বলেন ইউনিভার্সিটি অব ক্যালিফোর্নিয়া, সানফ্রান্সিসকো (ইউসিএসএফ)-এর সাইকিয়াট্রিস্ট প্রফেসর এলিসা এপেল।

মনই সকল পরিবর্তনের উৎস

সত্তরের দশকে মনোবিজ্ঞানী প্রফেসর এলেন ল্যান্ডার, হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে যখন তিনি সবে শিক্ষকতা শুরু করলেন, তখন কৌতূহলোদ্দীপক ও ভিন্ন ধরনের একাধিক গবেষণা পরিচালনা করেন। যার একটিতে তিনি আট জনের একটি দল তৈরি করলেন, যাদের সবাই ছিলেন সন্তরোধ পুরুষ এবং তাদের স্বাস্থ্যও ছিল ভালো-মন্দ মিলিয়ে মোটামুটি ধরনের।

পাঁচ দিনব্যাপী গবেষণায় তাদেরকে শোনানো হয় সে-সব সঙ্গীত ও রেডিও অনুষ্ঠান, যা তারা তাদের যৌবনে শুনতেন। এছাড়াও তখন তারা সমসাময়িক কোনো প্রসঙ্গ নিয়ে দৃষ্টিভঙ্গি না করে বরং তারল্যে যে-সব বিষয় নিয়ে আলাপ করতেন তেমন প্রসঙ্গ তুলে কথাবার্তা বলতেন। এবং স্বাভাবিকভাবে এ বয়সের লোকজন যেভাবে সাহায্যপ্রাপ্ত হয়ে থাকেন, যেমন : কষ্ট হবে ভেবে হাত থেকে ব্যাগ তুলে নেয়া, কমল গায়ে জড়িয়ে দেয়া ইত্যাদি তাদের সাথে করা হয় নি। সবকিছু করেছেন তারা নিজেরাই।

পাঁচ দিন পর দেখা গেল অদ্ভুত ব্যাপার। তাদের প্রত্যেকের শারীরিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক ক্ষমতা বেড়েছে নাটকীয়ভাবে। বয়সজনিত অনেক অক্ষমতার বৃত্ত থেকে তারা বেরিয়ে আসতে পেরেছেন অন্য কারো সাহায্য ছাড়াই।

প্রফেসর ল্যান্ডার আরেকটি গবেষণা পরিচালনা করেন একদল হোটেল পরিচারিকাকে নিয়ে, যারা নিজেদের ওজন কমাতে চাইছিলেন। তাদেরকে দুটো দলে ভাগ করে একদলকে বলা হয় যে, তারা প্রতিদিন হোটলে তাদের কাজকর্মের মধ্য দিয়ে যে পরিশ্রমটুকু করছেন তাতে পর্যাপ্ত ক্যালরি-ক্ষয় হচ্ছে এবং ওটাই তাদের ওজন কমানোর জন্যে যথেষ্ট। অন্যদলকে এমন কিছুই বলা হয় নি।

গবেষণা শেষে দেখা গেল চমকপ্রদ ঘটনা। হোটেল পরিচারিকাদের মধ্যে যারা আশাবাদী ছিলেন যে, দৈনন্দিন কাজকর্মের মধ্য দিয়ে নিজেদের ওজন কমছে, তাদের ওজন সত্যিই কমেছে। অন্যদিকে একই ধরনের কাজ ও শারীরিক পরিশ্রম করেও বাকিদের কারো কোনো পরিবর্তন ঘটে নি।

গবেষণালব্ধ এসব ফলাফলের ভিত্তিতে বিজ্ঞানীরা জানাচ্ছেন, মন ও শরীর যখন একসাথে এক বিন্দুতে এসে মিলে যায়-এমন ঘটনা কেবল তখনই সম্ভব। তারা বলছেন, এভাবেই সম্ভব হতে পারে দেহকোষের অভ্যন্তরে টেলোমেরার-এর দৈর্ঘ্য নিয়ন্ত্রণ করা, যা বার্ষিক্যগতি শ্লথ করতে সক্ষম।

টেলোমেরার : দীর্ঘায়ুর প্রাণভোমরা

দেহকোষের অভ্যন্তরে আছে ক্রোমোজোম, যার দুপ্রান্তে থাকে ‘টেলোমেরার’ নামক একটি উপাদান। জন্মের পর থেকে প্রতিনিয়ত কোষ বিভাজনের সময় টেলোমেরার-এর দৈর্ঘ্য ক্রমান্বয়ে ছোট হতে থাকে। জুলন্ত মোমবাতির সলতের মতো এর দৈর্ঘ্য যত কমতে থাকে, বার্ষিক্য তত ত্বরান্বিত হয়।

টেলোমেরার নিয়ে প্রথম গবেষণা শুরু হয় ১৯৭৮ সালে। আর এর সূত্রপাত করেন বিজ্ঞানী এলিজাবেথ ব্ল্যাকবার্ন, সাথে ছিলেন হার্ভার্ডের বিজ্ঞানী জ্যাক জোস্টাক। পরবর্তীতে ১৯৮৪ সালে ব্ল্যাকবার্ন



ও তার ছাত্র বিজ্ঞানী ক্যারল গ্রাইডার দেহকোষে ‘টেলোমেরার’ এনজাইমের অস্তিত্ব খুঁজে পান, যা টেলোমেরারের ক্ষয়পূরণ ও রক্ষণাবেক্ষণ করে থাকে। এ গুরুত্বপূর্ণ উদ্ভাবনের জন্যে এই তিন জন বিজ্ঞানীই ২০০৯-এ যৌথভাবে নোবেল পুরস্কারে ভূষিত হন।

তারা বলেন, টেলোমেরার-এর দৈর্ঘ্যহ্রাস ঘটায় সাথে সাথে হৃদরোগ, ডায়াবেটিস ও নিউরোন-ক্ষয়ের ঝুঁকি বাড়ে এবং দেহের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা দুর্বল হতে থাকে। তাহলে কীভাবে এটি নিয়ন্ত্রণ করা যায়? বিজ্ঞানীরা বলছেন, স্ট্রেসমুক্তি এক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।

চাই স্ট্রেসমুক্ত প্রশান্ত জীবন ও সুস্থ জীবনাচার

২০১৪ সালে ইউসিএসএফ-এ ২৩৯ জন মহিলার ওপর পরিচালিত বছরব্যাপী একটি গবেষণায় দেখা গেছে, যারা মেডিটেশনের মাধ্যমে স্ট্রেসমুক্ত জীবনযাপন, বিজ্ঞানসম্মত খাদ্যাভ্যাস, নিয়মিত ব্যায়াম, পর্যাপ্ত ঘুম ইত্যাদি সুস্থ জীবনাচার অনুসরণ করেছেন তাদের টেলোমেরার-দৈর্ঘ্য ততটা কমে নি, যতটা কমেছে স্ট্রেস-আক্রান্ত ও পরিশ্রমহীন জীবনযাপনকারীদের ক্ষেত্রে।

এ ফলাফলের প্রেক্ষিতে প্রফেসর এলিসা এপেল ও তার সঙ্গীরা জানিয়েছেন, স্ট্রেস এবং অন্যান্য কারণে জন্মের পর তো বটেই, জন্মের আগে মাতৃগর্ভেই শিশুর টেলোমেরার-দৈর্ঘ্য দ্রুত হ্রাস পেতে পারে, মা যদি স্ট্রেস-আক্রান্ত হন। তারা বলেন, জীবনে চলতে গেলে স্ট্রেস ঘূরফিরে আসতেই পারে; কিন্তু কথা হচ্ছে, আপনি কি হাল ছেড়ে দিয়ে নিজেকে সমর্পণ করে বসবেন, নাকি মেডিটেশন এবং সুস্থ জীবনাচারের মধ্য দিয়ে একে সচেতনভাবে মোকাবিলা করবেন।

২০১৩ সালে মেডিসনের ইউনিভার্সিটি অব উইসকনসিন-এ পরিচালিত একটি গবেষণার ভিত্তিতে নিউরোসায়েন্টিস্ট রিচার্ড ডেভিডসন বলেন, স্ট্রেসমুক্তির জন্যে অন্য যে-কোনো পদ্ধতির চেয়ে মেডিটেশন নিশ্চিতভাবেই অধিকতর কার্যকরী। মেডিটেশনকারীদের মস্তিষ্কের এমআরআই করে তিনি রায় দিয়েছেন, যারা নিয়মিত মেডিটেশন করেন তাদের মস্তিষ্কের গ্রেন-ম্যাটারের বয়সজনিত ক্ষয় অন্যদের চেয়ে তুলনামূলক কম।

তাই, বিশ্বের এসব প্রথমসারির স্বাস্থ্য-গবেষকদের কথা হচ্ছে, সময়ের সাথে সাথে আপনার বয়স বাড়বে-একথা সত্যি; তবে সচেতন জীবনচর্চার পথ ধরে আপনি যাপন করতে পারেন এক আনন্দময়, সুখী ও দীর্ঘ জীবন।

পেয়েছি ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি

ড. আবুল হাসনাত



কয়েক মাস আগে আমার ক্যাম্পার ধরা পড়ে। ফার্মাসিস্ট হিসেবে জানি যে, কেমনে খুব ভালো কাজ করছে। সিঙ্গাপুরের ডাক্তার বললেন, এখন ভালো বোধ করলেও ক্যাম্পারটা আবার ফিরে আসতে পারে। মাথার

মধ্যে এ দুশ্চিন্তাটা সবসময় কাজ করত। দিন দিন আত্মবিশ্বাস হারিয়ে ফেলছিলাম। আমার ছাত্ররা আমাকে অনুপ্রাণিত করেছে এ কোর্সে অংশ নিতে। এখন আমার সুস্থতার বিশ্বাস অনেক বেড়ে গেছে। পেয়েছি জীবন সম্পর্কে একটা ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি।

[ড. আবুল হাসনাত, অধ্যাপক, ফার্মেসি ও ফার্মাকোলজি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। ৩৭৬ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]

উদ্যম ও শক্তি অনুভব করছি

গুলোরানা সিদ্দিকী



আমি একজন ক্যাম্পার সারভাইভার। হতাশা কাজ করত কখনো কখনো। সবকিছু অর্থহীন মনে হতো। এখন নিজের মধ্যে উদ্যম অনুভব করছি, শক্তি অনুভব করছি। কেমন এক ভালো লাগা কাজ করছে।

এমন এক সময়ে আমরা বসবাস করছি যে, সন্তান বড় হলে মানুষ হবে কিনা তার কোনো নিশ্চয়তা নেই। নৈতিক অবক্ষয়ের এই চরম দুঃসময়ে গুরুজীর এই কোয়ান্টাম মেথড সবার জন্যে স্বস্তি নিয়ে এসেছে।

[গুলোরানা সিদ্দিকী, শিক্ষিকা, চট্টগ্রামে অনুষ্ঠিত স্বাগতম! রহমত!! ৩৭৬ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]

ওষুধ ছাড়াই ঘুমাতে পারছি

ডা. নাসিম মুসা



পেশাগত ব্যস্ততা আর সারাক্ষণের সঙ্গী টেনশন। সবমিলিয়ে ঘুমের সমস্যা শুরু হলো। ঘুমের ওষুধ খেতে শুরু করলাম। প্রথমে একটা-দুটো, তারপর পরিমাণ বাড়তে লাগল। গত কয়েক মাস ধরে

প্রতিদিন পাঁচ-ছয়টা করে ঘুমের ওষুধ খাচ্ছিলাম, তারপরও ঘুম হতো না। কোর্সের দ্বিতীয় দিন থেকে আমি ঘুমের ওষুধ না খেয়েই ঘুমাতে পারছি। বিশ্বাস করছি, আর কখনো ঘুমের ওষুধ খেতে হবে না।

[ডা. নাসিম মুসা। ৩৭৬ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]

নিজেকে নতুন করে পেলাম

ডা. কাশফিয়া শফিক



মেডিটেশনের মধ্য দিয়ে নিজেকে, নিজের পরিবারকে, পরিবারের মানুষগুলোকে যেন নতুন করে পেলাম। আসলে জীবনে কতটুকু নেই, তার দিকে না তাকিয়ে কতটুকু আছে, এই তাকানোর শক্তিটা

আমি কোয়ান্টাম থেকে পেলাম। এখন জীবনের দিকে যতবার তাকাই, দেখি আমার সব আছে। শোকের আলহামদুলিল্লাহ!

[ডা. কাশফিয়া শফিক, প্রভাষক, ইব্রাহীম মেডিকেল কলেজ ও বারডেম হাসপাতাল, ঢাকা। ৩৭৬ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]

রাগ এখন আমার নিয়ন্ত্রণে

শরীফ আলী



রাগকে নিয়ন্ত্রণে আনার উদ্দেশ্যেই কোর্সে এসেছি। যখন রাগ ওঠে, কার সাথে কথা বলছি, কী বলছি—কোনো কিছুই যেন নিয়ন্ত্রণে থাকে না। কোর্সে গুরুজীর আলোচনা শুনতে শুনতে আমি ধীরে

ধীরে বদলাতে শুরু করলাম। এখন আমি অনেক আত্মবিশ্বাসী। অনুভব করছি, আমার রাগ অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে। এখানে এসে জানলাম, মানুষের ব্যর্থতার কারণ তার মস্তিষ্কের শক্তিকে ব্যবহার না করা। সিদ্ধান্ত নিয়েছি, আমি মস্তিষ্ককে কাজে লাগিয়ে একজন সফল মানুষে পরিণত হবো।

[শরীফ আলী, ব্যবসায়ী। ৩৭৬ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]

জীবনের লক্ষ্য সুস্পষ্ট হয়েছে

অহনা রহমান



আমার মধ্যে কিছু অস্থিরতা ছিল। কোর্সে এসে নিজেকে অনেকটা স্থির মনে হচ্ছে। এছাড়া রাতে আমার ঘুম হতো না। কিন্তু কোর্সের প্রথমদিন থেকেই তৃপ্তি নিয়ে ঘুমাতে পারছি। সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি হলো, জীবনের

লক্ষ্যটা সুস্পষ্ট হয়েছে আমার কাছে। এখন আমি জানি, নিজের মেধা-যোগ্যতাকে কীভাবে কাজে লাগাতে হবে। সহকর্মীদের অনুপ্রেরণায় আমি কোয়ান্টামে এসেছি। তাদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

[অহনা রহমান, অভিনেত্রী। ৩৭৬ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]

প্রত্যেক চিকিৎসকেরই

মেডিটেশন জানা প্রয়োজন

ডা. ম. নজরুল ইসলাম চৌধুরী (তসলিম)



আমি মনে করি প্রত্যেক চিকিৎসকের কোয়ান্টাম মেডিটেশন জানা প্রয়োজন। শুধু দক্ষ চিকিৎসক নয়, একজন ভালো মানুষ হওয়ার জন্যেও কোয়ান্টামের শিক্ষা অত্যন্ত প্রয়োজন। আজকের এই যান্ত্রিক

জীবনে মেডিটেশনের কোনো বিকল্প নেই। নামাজে নিজেকে আরো মনোযোগী আর সুস্থির মনে হচ্ছে, আগের মতো তাড়াহুড়ো কাজ করছে না। আত্মিক উন্নয়ন আর প্রার্থনায় মনোযোগ বাড়তে মেডিটেশন আবশ্যিক।

[ডা. ম. নজরুল ইসলাম চৌধুরী (তসলিম), সহকারী অধ্যাপক, অর্থোপেডিক সার্জারি ও ট্রমাটলজি বিভাগ, চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ, চট্টগ্রামে অনুষ্ঠিত স্বাগতম! রহমত!! ৩৭৬ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]

শৈশবের মতো প্রাণবন্ত

মনে হচ্ছে

শ্রীমতি ইন্দুমতি ঘোষ



৩০ বছর যাবৎ গির্থে, কোমরে আর হাঁটুতে ব্যথা নিয়ে অনেক কষ্ট করছি। অনেক চিকিৎসা করিয়েছি। চার/পাঁচ বছর ধরে আমি রাগ করে ওষুধ খাওয়া বন্ধ করেছি।

প্রথমদিন প্রচণ্ড ব্যথা নিয়ে কোর্সে আসি। ভেবেছিলাম, আমি আধা ঘণ্টা বসে থাকতে পারি না, চার দিন কীভাবে বসে থাকব? অথচ তৃতীয় দিন থেকে কোনো ব্যথা অনুভব করছি না। নিজেকে ছেলেবেলার মতো সুস্থ প্রাণবন্ত মনে হচ্ছে।

[শ্রীমতি ইন্দুমতি ঘোষ, গৃহিণী, ৩৭৮ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]

ব্যর্থতার বৃত্তগুলোকে

ভাঙতে পেরেছি

মো. সিফাত উল্লাহ



আমি ভয় ও আশঙ্কার কুসংস্কারে আক্রান্ত ছিলাম। মেডিটেশনের মাধ্যমে আমি ভয়গুলোকে চিহ্নিত করতে পেরেছি এবং ব্যর্থতার বৃত্তগুলোকে ভাঙতে পেরেছি। এখন আমি অনেক আত্মবিশ্বাসী।

[মো. সিফাত উল্লাহ, শিক্ষার্থী, নর্থসাউথ বিশ্ববিদ্যালয়। ৩৭৬ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]

শান্তি প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা রাখছে কোয়ান্টাম

মো. মোহসিন মিয়া



বিশ্বের বহু দেশে বিভিন্ন সেমিনারে অংশ নেয়ার সুযোগ পেয়েছি। কিন্তু এত প্রাণস্পন্দন জাগানো চমৎকার বক্তব্য আমি কখনো শুনি নি।

কোর্সে ব্যক্তিকে যেমন গুরুত্ব দেয়া হয়েছে তেমনি গুরুত্ব

দেয়া হয়েছে তার পরিবার সমাজ রাষ্ট্র, সর্বোপরি গোটা বিশ্বকে। গুরুজীর শেখানো পদ্ধতি যদি আমরা অনুসরণ করতে পারি, তাহলে আমাদের সুখ-সামান্য-কল্যাণ অবধারিত। নির্দিষ্টায় বলতে পারি, কোয়ান্টাম শুধু আমাদের দেশে নয়, সারা বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা রাখছে।

[মো. মোহসিন মিয়া, এডিশনাল ম্যানেজিং ডিরেক্টর, মেঘনা ব্যাংক লি.। ৩৭৬ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]

শোকর আলহামদুলিল্লাহ! কোর্সে অংশ নিতে পেরেছি

মুহাম্মদ আহসানউল্লাহ



লামার শিশুদের ভিডিওচিত্রটি দেখে আমি অভিভূত। সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের জীবন যেভাবে কোয়ান্টাম গড়ে দিচ্ছে, তা সবার দেখা প্রয়োজন। আর এই জীবনের একটি দিনও যদি ভালো থাকা যায়,

ভালো চিন্তা, ইতিবাচক চিন্তা করা যায়, এটাই বড় পাওয়া। কোয়ান্টাম মানুষকে ভালো থাকার সে পথটাই দেখাচ্ছে। শোকর আলহামদুলিল্লাহ! আমি এই কোর্সে অংশ নিতে পেরেছি।

[মুহাম্মদ আহসানউল্লাহ, আইনজীবী, বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট, ৩৭৮ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]

আমি এখন সুস্থ!

বকুল বেগম



খুব অসুস্থ অবস্থায় কোর্সে এসেছিলাম। আমার সারা শরীরে, হাত-পায়ে পানি জমেছিল। বেশিক্ষণ বসে থাকতে পারতাম না। দ্বিতীয় দিন থেকে আমার হাত-পায়ের ব্যথা সব চলে গেছে। সাইনুসাইটিস-এর

ব্যথা ছিল প্রায় সাত বছর। এই ব্যথাও আর নেই। ১০ ঘণ্টা এসি রুমে বসে থাকতেও কোনো অসুবিধা হয় নি। আমি এখন সুস্থ আছি, ভালো আছি।

[বকুল বেগম, গৃহিণী, ৩৭৭ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]

ভালো লাগার মাত্রা প্রতিদিনই বেড়েছে

রহিমা আফরোজ



প্রচণ্ড ব্যাকপেইন নিয়ে কোর্সে এসেছি। পিঠ-কোমর-ঘাড় জুড়ে এই ব্যথায় ভুগছি ২০ বছর ধরে। সারাদিন বসে থাকতে হবে শুনে কিছুটা ভয়েই ছিলাম। প্রথমদিন ক্লাসে এসেও বেশ ব্যথা ছিল। মনে হচ্ছিল পরদিন আর আসতে পারব না। কিন্তু দ্বিতীয় দিন মেডিটেশন করার পরেই দেখি ব্যথা চলে গেছে। এরপর ১০ ঘণ্টা বসে আলোচনা শুনেছি, মেডিটেশন করেছি। কোনো অসুবিধা হয় নি।

কোর্সে প্রতিদিনই যেন ভালো লাগার মাত্রা, সুস্থতার মাত্রা আরো বেড়েছে। কোর্সে শেখানো বিষয়গুলো আমরা যদি সঠিকভাবে পালন করি এবং নিয়মিত মেডিটেশন করি, তাহলে আমাদের অনেক সমস্যা সমাধান হয়ে যাবে। আমি সারাজীবন সুস্থ থাকতে চাই, কোয়ান্টামের সাথে থাকতে চাই।

[রহিমা আফরোজ, গৃহিণী। ৩৭৬ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]

মাথাব্যথা আর নেই

মো. ইকবাল হোসেন



কিছুদিন যাবৎ আমি ও আমার স্ত্রী মেডিটেশন বিষয়ে জানার চেষ্টা করছিলাম। ইন্টারনেটসহ সম্ভাব্য অনেক জায়গায় খোঁজখবর নিয়ে দেখলাম, এ তো আমার দেশেই আছে! এরপর দেশে এসে

কোয়ান্টাম মেথড কোর্সে অংশ নিলাম।

২০ বছর ধরে আমার মাইগ্রেন। বন্ধ রুমে সারাদিন কোনো মিটিং বা অনুষ্ঠানে বসে থাকা মানে আমার মাথাব্যথা হবেই। এখানে শিখলাম কীভাবে মাথাব্যথা দূর করতে হয়। আশ্চর্য হলোও সত্য যে, চার দিনে আর মাথাব্যথা হয় নি।

আরো উপলব্ধি করলাম, জীবনে ব্যর্থতার শৃঙ্খলগুলো আসলে মানুষ নিজেই তৈরি করে।

[মো. ইকবাল হোসেন, অস্ট্রেলিয়া প্রবাসী লিজিং কনসালটেন্ট, ৩৭৭ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]

নিজের সম্ভাবনাকে উপলব্ধি করেছি

তাসমিয়া চৌধুরী তানিশা

মানুষ হিসেবে প্রত্যেকেই যে অসাধারণ মেধা আর প্রতিভার অধিকারী তা অনুভব করতে পেরেছি কোয়ান্টামে এসে। উপলব্ধি করেছি আমার সুপ্ত সম্ভাবনাগুলোকে। এখন আমার মনছবি সুস্পষ্ট এবং আমি জানি কীভাবে তা সামনে এগিয়ে

নিয়ে যেতে হবে। অন্যরকম আত্মবিশ্বাস অনুভব করছি যে, আমিও কিছু করে দেখাতে পারব। জীবনকে সুন্দর করার জন্যে যে পথ গুরুজী আমাদেরকে দেখালেন তা খুবই সহজ এবং সরল।

[তাসমিয়া চৌধুরী তানিশা, শিক্ষার্থী, আদমজী ক্যান্টনমেন্ট কলেজ। ৩৭৬ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]

কোয়ান্টাম মানুষের কল্যাণে কাজ করছে

মেজর (অব) মোহাম্মদ খলিল উন নবী



বর্তমান সময়ে আমরা অধিকাংশ মানুষই ধ্যানবিহীন জীবনযাপন করছি। অথচ সুস্থ সুন্দর জীবনের জন্যে ধ্যানের গুরুত্ব অপরিণীম। নবী-রসুল, মুনি-ঋষিরা যুগে যুগে আমাদের এ শিক্ষাই দিয়ে গেছেন।

সন্তানদের উৎসাহেই আমি কোর্স করতে এসেছি। এখানে এসে দেখলাম, গুরুজী যেভাবে আমাদের সকলের মনোযোগ ধরে রাখেন, এটা অসাধারণ। এখানে বার বার বলা হলো, আমরা যেন পরিবারে সম্পর্কের মাঝে দেয়াল না তুলি, চারপাশে সবার জন্যে কল্যাণ কামনা করি। সমাজে এ কথাগুলো এখন কেউ বলে না। মনে হচ্ছে, আরো আগে যদি এই কোর্সটা করতাম, জীবনটাকে আরো সুন্দর করে সাজাতে পারতাম। কোয়ান্টাম যেভাবে মানুষের কল্যাণে কাজ করে যাচ্ছে, তা অতুলনীয়।

[মেজর (অব) মোহাম্মদ খলিল উন নবী। ৩৭৬ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]

ওষুধ ছাড়াই ভালো আছি

আবু ইউসুফ প্রধান



১০ বছর ধরে আমার এসিডিটির সমস্যা। খাওয়ার কমপক্ষে আধঘণ্টা আগে ওষুধ খেতাম। ভাবতাম যতদিন বেঁচে আছি ওষুধ খেয়েই আমাকে চলতে হবে।

কোর্সের তিন দিন ধরে সকাল-দুপুর বাইরেই খেতে হয়েছে।

কোর্সের তৃতীয় দিন হঠাৎ মনে হলো, এই তিন দিন তো ওষুধ খাচ্ছি না, অথচ এসিডিটির কোনো সমস্যা আমার হচ্ছে না। যেখানে বাইরে কিছু খেলে বুকজ্বলা, পেটজ্বলা-এসব ছিল নিয়মিত ঘটনা। আমি বিশ্বাস করি, যতদিন বেঁচে থাকব, এসিডিটির কোনো সমস্যা আমার হবে না। এছাড়াও গুরুজীর আলোচনা শুনে আমি জীবনের মনছবি তৈরি করতে পেরেছি।

[আবু ইউসুফ প্রধান, ব্যবসায়ী। ৩৭৬ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]

গ্রাজুয়েটদের প্রশ্ন » ? » উত্তর দিচ্ছেন গুরুজী

প্রশ্ন : আমি রান্নাঘরের কাজকে ভয় পাই। ছোটবেলা থেকে রান্না করতে হবে মনে হলোই পড়তে বসতাম। পড়তে দেখলে মা-ও রান্নার কথা বলতেন না। এখন রান্নাঘরে দাঁড়িয়ে আধা ঘণ্টা কাজ করলেই হাঁটুতে ব্যথা করে। আমার আর্থ্রাইটিস আছে, বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে পারি না। আবার পা ঝুলিয়ে বেশিক্ষণ বসেও থাকতে পারি না। তবে লেখালেখির কাজে আমি সব থেকে বেশি আনন্দ পাই, আমি শ্রমানন্দ নিয়ে লিখি। সারাদিন সারারাত আমি লিখতে পারি।

উত্তর : সারাদিন সারারাত আপনি লিখতে পারেন- কেন? লেখাতে আপনি আনন্দ পান। আপনি হয়তো বসে লেখেন, বসে লিখলে পা-তো ঝুলেই থাকে। তখন আর্থ্রাইটিসের ব্যথা কিন্তু হয় না। কারণ কাজটাতে আপনি আনন্দ পাচ্ছেন এবং একে আপনি কষ্টকর মনে করছেন না।

দুঃখজনক হলোও সত্যি যে, মেয়েরা রান্নাঘরের কাজটাকে কষ্টের মনে করে। মেয়েরা শুধু না, নারী-পুরুষ সবাই এটাকে কোনো কাজই মনে করে না। একটা বিরক্তিকর ব্যাপার বলে মনে করে। শুধু চিন্তা করুন, দুদিন ঘরে রান্না হচ্ছে না। রান্না করার কেউ নেই। পুরুষ যাবেন কোথায়? মহিলা যাবেন কোথায়? কারণ জীবনের অপরিহার্য একটি কাজ হচ্ছে রান্না।

আসল ব্যাপারটা হচ্ছে দৃষ্টিভঙ্গি। যে কাজই করুন, কখনো বিরক্তি নিয়ে করবেন না। যখনই বিরক্তি নিয়ে করবেন, এর বরকত নষ্ট হয়ে যাবে। আর এ বিরক্তির প্রভাব সরাসরি প্রথম পড়বে আপনার শরীর ও মনের ওপর, যার ফলাফল মনোদৈহিক ক্লান্তি, বিষণ্ণতা এবং এর ফলে নানা ধরনের অসুস্থতা। অতএব, শরীর ভালো রাখার জন্যে হলোও আপনাকে কাজের বিরক্তি থেকে বেরিয়ে আসতে হবে।

যে কাজই করবেন, সবসময় আনন্দচিত্তে করবেন যে, এ-কাজটা করার সুযোগ আমি পেয়েছি। আসলে রান্না যে কত পুণ্যের কাজ এটা যদি মহিলারা বা পুরুষরা বুঝতেন তাহলে সবাই অত্যন্ত আনন্দ নিয়ে এ-কাজটি করতেন। কারণ, যিনি রান্না করছেন তিনি আরেকজনকে তার রিজিকটা তৈরি করে দিচ্ছেন। আল্লাহ রিজিকদাতা, কিন্তু সেই রিজিক বা নেয়ামত গ্রহণ করার প্রক্রিয়াটাকে আপনি সহজ করে দিচ্ছেন আরেকজন মানুষের জন্যে। এটা এত পবিত্র কাজ!

আপনি আজকে থেকে এই অনুভূতি নিয়ে রান্না শুরু করুন যে, আল্লাহ মানুষকে যে রিজিক দিয়েছেন সে রিজিক সুন্দরভাবে মানুষের গ্রহণ করার পর্যায়ে নিয়ে যাওয়ার কাজটা আমি করছি। দেখবেন রান্নায় মনোযোগ অনেক বেড়ে যাবে। রান্নার স্বাদ অন্যরকম হয়ে যাবে। আপনি নারী হোন বা পুরুষ, রান্নায় আপনি সত্যিকার আনন্দ পাবেন, যেমনটা পান আপনি লেখার কাজ করে।

প্রশ্ন : বাসায় মেহমান এলে আমরা বলি যে, আপনি অনেক কষ্ট করে এসেছেন। এর বদলে কি আমরা অন্য কিছু বলতে পারি না?

উত্তর : সমাজ সংস্কারের জন্যে, সমাজ থেকে নেতিবাচকতা দূর করার জন্যে এটা একটা মৌলিক চিন্তার বিষয়। কারণ আমরা প্রায়শই নিজেদের

অজ্ঞাতসারেই এ কথাটা বলে ফেলি যে, আপনি অনেক কষ্ট করে এসেছেন। মেহমানকে খাওয়ালাম, যতভাবে আপ্যায়ন করা যায় করলাম, তারপর আবার বলছি-‘আপনি অনেক কষ্ট করেছেন। অনেক কষ্ট দিলাম।’ যদি বলিই যে, অনেক কষ্ট দিলাম, তাহলে এত খাওয়ানোর দরকার কী ছিল? এটা একটা নেতিবাচকতা। আসলে এই ছোট ছোট বিষয়গুলো শরীফতান আমাদের মধ্যে ঢুকিয়ে দেয় মানুষকে নেতিবাচক করে তোলার জন্যে।

আবার মেহমানও অনেক খাওয়াদাওয়া করে চলে যাওয়ার সময় বলে, আপনাকে অনেক কষ্ট দিয়ে গেলাম। আরে! যদি কষ্ট দিয়ে যাবেন, তো কষ্ট দিতে এলেনই-বা কেন?

মেহমানদারি তো কোনো কষ্টের বিষয় না, এটা আনন্দের বিষয়। তাই আপনাকে অনেক কষ্ট দিয়ে গোলাম নয়, বিদায় নেয়ার সময় মেহমানের বলা উচিত যে, অনেক আনন্দ নিয়ে যাচ্ছি এবং ইনশাআল্লাহ ভবিষ্যতেও এরকম আরো আনন্দ পাওয়ার প্রত্যাশা করছি। আল্লাহ আপনাকে সেই তৌফিক দিন, যাতে সবসময় আপনি এরকম আনন্দ দিতে পারেন। আর মেহমানকে বিদায় দেয়ার সময় বলা উচিত যে, আপনি আসায় আনন্দিত হয়েছি, আপনি আমাদের অনেক আনন্দ দিয়েছেন। আবার এরকম আসবেন।

প্রশ্ন : আমরা পরিবারের সবাই কোয়ান্টাম গ্রাজুয়েট। কিন্তু কেউই মেডিটেশন করি না। আমার মেয়ে বলে, মেডিটেশনের জন্যে লম্বা সময় লাগে। পড়াশোনার পর ওর সময় হয় না। এদিকে সময়সীমা বেড়েই যাচ্ছে সবার।

উত্তর : ধরুন, ডাক্তারের কাছে গেলেন। ডাক্তার ওষুধ দিল, আপনি খেলেন না। রোগ সারবে? রোগ তো সারবে না। তেমনি কোর্স করাটা হচ্ছে শুরু। তারপর চর্চা যতখানি, উপকারও ততখানি। যত চর্চা করবেন তত উপকার পাবেন। অন্যদের কথা বাদ দিন, আপনি নিজে কেন মেডিটেশন করেন না? আপনি নিজে করলে তো আপনার উপকার হবে। আর আপনাকে যখন নিয়মিত করতে দেখবে তখন পরিবারের অন্যরাও অনুপ্রাণিত হবে। আপনার পাশে এসে বসবে মেডিটেশনের সময়। ধীরে ধীরে আপনাদের সমস্যা দূর হতে থাকবে ইনশাআল্লাহ। মনে রাখবেন, মেডিটেশন এবং সময়সীমা দুটো একসাথে থাকতে পারে না।

প্রশ্ন : আপনি বলেছেন, রাগ প্রজ্ঞাহীনতার বহিঃপ্রকাশ। আমি শিক্ষক। কিছু ছাত্র আছে, যাদের সাথে রাগ না দেখালে মাথায় চড়ে বসে। পড়াশোনা করে না। কী করব?

উত্তর : রাগ করা আর একজন ছাত্রকে বোঝানো দুটো সম্পূর্ণ ভিন্ন বিষয়। আপনি রাগ করে ছাত্রকে পেটাবেন? বিপদ আছে। এটা এখন আইনত নিষিদ্ধ। আপনার জেল-জরিমানা পর্যন্ত হয়ে যেতে পারে। আপনাকে বুদ্ধি প্রয়োগ করতে হবে, যাতে সে মাথায় চড়তে না পারে।

একটা গাছকে সোজা করতে হয় একেবারে ছোট অবস্থায়, চারাটা নরম থাকতে। যদি একবার গাছটা বাঁকা হয়ে যায়, বড় হওয়ার পর সেটাকে আর সোজা করা যায় না। অতএব ছাত্রদের সাথে প্রথম থেকেই আপনাকে বুদ্ধির খেলা খেলতে হবে। তাকে আপনি

কীভাবে অনুপ্রাণিত করতে পারবেন, সেটা বুঝতে হবে। যে-রকম ছোটবেলায় আমরাও দেখেছি-অনেক শিক্ষক ছিলেন, যাদের ক্লাস করব মনে হলোই আনন্দ লাগত। দেখা যেত, তার ক্লাসে কোনো গণ্ডগোল নেই। সব চুপচাপ। আবার অনেক শিক্ষক ছিলেন যারা চিৎকার করে, এমনকি মারধর করেও গণ্ডগোল থামাতে পারতেন না। কারণ পিটিয়ে বা রাগ করে কখনো কাউকে নিয়ন্ত্রণ করা যায় না। নিয়ন্ত্রণ করতে হয় বুদ্ধি প্রয়োগ করে।

প্রশ্ন : আমি ইডেন কলেজের একজন ছাত্রী। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আমার এক বন্ধুর সাথে আমার সম্পর্ক। তার আর আমার বাড়ি একই জেলায়। আমাদের সম্পর্কের বয়স দেড় বছর। আমরা একই সাথে লাইব্রেরিতে পড়ি। তুলনামূলকভাবে তার চেয়ে আমার রেজাল্ট ভালো। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে, যখন একসাথে আমরা ক্যান্টিনে খাওয়ার জন্যে বা বাইরে বের হই, তখন তার সহপাঠীদের বা রুমমেটদের দেখলে সে আমাকে ইগনোর করে। কেন করে তা আমি জানি না। জিজ্ঞাসা করলে চুপ থাকে। তখন আমার খারাপ লাগে এবং খুব হতাশায় ভুগি। সে আমাকে যদি সত্যিই ভালবাসে, তাহলে তার রুমমেট এবং সহপাঠী দেখে আমাকে ইগনোর করার কারণ বুঝতে পারি না। আর এসব কারণে আমার লেখাপড়ার যথেষ্ট বিঘ্ন ঘটছে। যেহেতু আমাকে অনেক বড় হতে হবে, আমার করণীয় কী? আর তার সমস্যাটা কী, যে কারণে আমাকে ইগনোর করছে?

উত্তর : আপনার করণীয় তো খুব সহজ। আপনার মা-বাবা তো আপনাকে ইডেন কলেজে পড়ালেখা করার জন্যে পাঠিয়েছে, প্রেম করার জন্যে না। কথাটা আপনার শুনতে খুব খারাপ লাগছে, কিন্তু এটাই হচ্ছে সত্য।

আর সেই ছেলের যদি আপনাকে পছন্দ হতো বা সে যদি আপনাকে বিয়ে করতে চাইত, তাহলে তার আচরণেই এর প্রকাশ ঘটত। তার আচরণে তো সে-রকম কিছু নেই, যা আপনি নিজেও বুঝতে পারছেন। আপনি নিজেই শুধু পাগল হয়ে গেছেন তার জন্যে। আর কোনো মেয়ে যখন কোনো ছেলের জন্যে এমন একতরফাভাবে পাগল হয়ে যায়, এটা তার জন্যে দুর্ভাগ্য, তাকে মূল্য দিতে হয় অনেক বেশি। হতাশাই তার জীবনের অন্যতম পরিণতি।

কারণ ছেলে এবং মেয়ের সাইকোলজিতে অনেক তফাত রয়েছে। ছেলে জয় করতে চায়, পেতে চায়। পেয়ে গেল, তারপর শেষ। ধরে রাখার ব্যাপারে তার আগ্রহ খুব কম। কিন্তু মেয়েরা ধরে রাখতে চায়। আর মেয়ের আগ্রহ যখন বেশি হয় তখন এই ধরে রাখাটা আর হয় না। ছেলে তখন নানানভাবে ছুটে যেতে চায়। অতএব এই ভুল করবেন না। আগ-বাড়িয়ে নিজে আগ্রহী হবেন না কখনো।

এ মাসের অটোসাজেশন

আমি দেশকে ভালবাসি।
তাই আজ দেশের জন্যে
আমি কিছু করব।

ভারতে রক্তদান বিষয়ক কনফারেন্সে কোয়ান্টাম স্বেচ্ছা রক্তদান কার্যক্রম

২৩-২৫ জানুয়ারি ভারতে রক্তদান কার্যক্রম বিষয়ক কনফারেন্সে অংশ নেয় কোয়ান্টাম। এসোসিয়েশন অব ভলান্টিরি ব্লাড ডোনরস, ওয়েস্ট বেঙ্গল-এর আয়োজনে কনফারেন্সটিতে কোয়ান্টাম এবারই প্রথম অংশ নেয়। এবারের থিম ছিল ‘ন্যাশনাল মিট অন টোটাল ভলান্টিরি ব্লাড প্রোগ্রাম : ভিশন ২০২০’।

এতে ভারতের ২৫টি রাজ্য থেকে আগত ১৫২ জন প্রতিনিধির পাশাপাশি অংশ নেন আটটি রাষ্ট্র থেকে আগত ১৬ জন বিদেশি প্রতিনিধি। প্রথমদিনের শেষ সেশনে কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন উপস্থাপন করে ডোনার মোটিভেশন স্ট্র্যাটেজি বিষয়ক একটি প্রেজেন্টেশন। আকর্ষণীয় অডিও-ভিজুয়াল মিডিয়া ও স্বতঃস্ফূর্ত উপস্থাপনার কারণে প্রেজেন্টেশনটি সবার কাছে প্রশংসিত হয়। কোয়ান্টাম স্বেচ্ছা রক্তদান কার্যক্রমের ব্যাপারে উপস্থিত সবার মাঝে সৃষ্টি হয় ব্যাপক আগ্রহ। ফলে পরবর্তী দুই দিন কোয়ান্টাম কার্যক্রমের নানা বিষয়ে ফাউন্ডেশনের প্রতিনিধিদের সাথে উচ্ছ্বসিত মত বিনিময় করেন সকলে।

এ আয়োজনে ভারতের ন্যাশনাল এইডস



‘ডোনার মোটিভেশন স্ট্র্যাটেজি’ বিষয়ে অডিও-ভিজুয়াল আলোচনা করছেন অর্গানায়ার রাবিয়া নাজরীন

কন্ট্রোল অথরিটি (ন্যাকো-র) প্রতিনিধি মিসেস শোভিনী রাজনসহ তামিলনাড়ু, গুজরাট, মহারাষ্ট্র ও কেরালা থেকে এসেছিলেন স্বেচ্ছা রক্তদানের ওপর বিশিষ্ট কর্মী ও আলোচকবৃন্দ। কোয়ান্টাম স্বেচ্ছা রক্তদান কার্যক্রমের পক্ষে এতে অংশ নেন অর্গানায়ার রাবিয়া নাজরীন, খান এ আলম মানিক, মমতাজুল ইসলাম রাজু এবং মাধবী রায়।

মিরপুর সেন্টারের উদ্যোগে বিশেষ ওয়ার্কশপ

২১ ফেব্রুয়ারি কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন মিরপুর সেন্টারের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হলো কোয়ান্টাম গ্রাজুয়েট ও প্রো-মাস্টারদের নিয়ে ওয়ার্কশপ ‘আমি লেগে থাকবো ৥ আমি সফল হবো।’ দিনব্যাপী এই ওয়ার্কশপটি অনুষ্ঠিত হয় কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন পল্লবী কার্যালয় সেমিনার হলে।

এতে বিষয়ভিত্তিক আলোচনা, মেডিটেশন, প্রশ্নোত্তরপর্ব ছাড়াও কোয়ান্টাম মেথড কোর্স প্রত্যয়নের অনুভূতি দেখানো হয়। ওয়ার্কশপটি পরিচালনা করেন মিরপুর সেন্টারের মোমেন্টিয়ার আবদুল্লাহ জুবাইর। পাঁচ শতাধিক গ্রাজুয়েট ও প্রো-মাস্টার অংশ নেন এই ওয়ার্কশপে।

কুমিল্লায় পারিবারিক ওয়ার্কশপ



২৭ ফেব্রুয়ারি কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন কুমিল্লা শাখার উদ্যোগে কুমিল্লা টাউন হলে অনুষ্ঠিত হলো তিন ঘণ্টাব্যাপী পারিবারিক ওয়ার্কশপ। এ ওয়ার্কশপে দুটি বিষয়ে আলোচনা করা হয়—‘পরিবারে অশান্তির কারণ ও প্রতিকার’ এবং ‘সুখী পরিবারের পঞ্চসূত্র’। আলোচনা করেন অর্গানায়ার মারুফ ইবনে মাহবুব।

আলোচনা, মেডিটেশন ছাড়াও অংশগ্রহণকারীরা উপভোগ করেন কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন নির্মিত ডকুমেন্টারি ‘সুখী পরিবার’।

এ ওয়ার্কশপে কোয়ান্টাম গ্রাজুয়েট, প্রো-মাস্টারদের পাশাপাশি এসোসিয়েটরাও অংশ নেয়ার সুযোগ পান। সবমিলিয়ে মোট অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা ছিল ৪১৫।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে মেডিটেশন বিষয়ক আলোকচিত্র প্রদর্শনী



১৪ ফেব্রুয়ারি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় কোয়ান্টাম মেডিটেশন সোসাইটি-র আয়োজনে বিশ্ববিদ্যালয়ের শহীদ বুদ্ধিজীবী চত্বরে অনুষ্ঠিত হয় মেডিটেশনভিত্তিক আলোকচিত্র প্রদর্শনী।

আত্মার সন্ধানে সহস্র ডুবুরি ও মিডিয়ার চোখে মেডিটেশন শীর্ষক এই আলোকচিত্র প্রদর্শনীটি উদ্বোধন করেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য ড. ইফতেখার উদ্দিন চৌধুরী।

আরো উপস্থিত ছিলেন অধ্যাপক ড. বদরুল আমিন ভূঁইয়া, বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক অধ্যাপক ড. মহিউদ্দীন চৌধুরী, অধ্যাপক ড. জাহিদ হোসেন সিকদার, সহকারী অধ্যাপক এ. জি. এম. নিয়াজ উদ্দীন, কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন চট্টগ্রাম সেন্টারের উপদেষ্টা সমন্বয় মুহাম্মদ মুজিবুর রহমান এবং অর্গানায়ার কো-অর্ডিনেশন এস. এম. সাজ্জাদ হোসেন।

পরবর্তীতে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য ড. আলাউদ্দীন উক্ত প্রদর্শনী পরিদর্শন করেন। দিনব্যাপী এই আয়োজনে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের শিক্ষক ও শিক্ষার্থী মিলিয়ে প্রায় ১৫০০ দর্শনার্থীর সমাগম ঘটে।

বুয়েট মেডিটেশন ক্লাব ৥ যাত্রা শুরু



১৯ ফেব্রুয়ারি বুয়েটে (বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়) অনুষ্ঠিত হলো শিক্ষার্থীদের বিশেষ প্রোগ্রাম আত্মনির্মাণে মেডিটেশন। এই প্রোগ্রামের মধ্য দিয়ে যাত্রা শুরু করল বুয়েট মেডিটেশন ক্লাব।

বুয়েট ক্যাম্পাসের ‘ডেল ক্যাফে’তে আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন বুয়েটের DSW (Director of Student's Welfare) অধ্যাপক ড. দেলোয়ার হোসেন। তিনি বলেন, বুয়েট মেডিটেশন ক্লাব ছাত্রদের সুন্দর ও সুস্থ জীবনচর্চায় ভূমিকা রাখবে। আরো উপস্থিত ছিলেন অধ্যাপক ড. শাহ আলম খান (IWMF) এবং গণিত বিভাগের অধ্যাপক ড. আব্দুল হাকিম। আলোচনা করেন বুয়েট এলামানাই ও অর্গানায়ার ইঞ্জি. প্রাণজিৎ লাল শীল। এতে অংশ নেন বুয়েটের ৯০ জন শিক্ষার্থী।

প্রতি বৃহস্পতিবার শিক্ষার্থীদের জন্যে বিষয়ভিত্তিক আলোচনা ও মেডিটেশন নিয়ে ‘আত্মজাগরণ’ শীর্ষক প্রোগ্রাম অনুষ্ঠিত হবে বুয়েট মেডিটেশন ক্লাবে।

আবশ্যিক

কোয়ান্টাম কসমো স্কুল ও কলেজের জন্যে শিক্ষক/শিক্ষিকা/আবাসিক শিক্ষক (ন্যূনতম অনার্স পাশ), বিজ্ঞান বিভাগের জন্যে (পদার্থ বিজ্ঞান, রসায়ন, জীব বিজ্ঞান, উচ্চতর গণিত) শিক্ষক/শিক্ষিকা আবশ্যিক। বিএড ও নিবন্ধনকৃত প্রার্থীরা অগ্রাধিকার পাবেন। শিশুকানন ও শিশুসদনের শিক্ষার্থীদের দেখাশোনার জন্যে ব্রাদার, সিস্টার (ন্যূনতম এসএসসি পাশ) ও সিকিউরিটি গার্ড আবশ্যিক।

এছাড়াও কোয়ান্টামম-এর জন্যে কিছু সংখ্যক মালি ও মাঠকর্মী প্রয়োজন। আগ্রহীরা যোগাযোগ করুন :

কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন

৩১/ভি শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদীন সড়ক,
শান্তিনগর, ঢাকা-১২১৭

কোয়ান্টাম আইসিটি ॥ প্রফেশনাল গ্রাফিক্স ডিজাইন প্রোগ্রাম



রাইসুল ইসলাম

ব্যাংকার মো. রাইসুল ইসলাম কোয়ান্টাম প্রফেশনাল গ্রাফিক্স ডিজাইন প্রোগ্রাম সম্পন্ন করে বলেন, গ্রাফিক্স ডিজাইন শেখার ইচ্ছা ছিল অনেক আগে থেকেই। টিউটোরিয়াল দেখে শেখার চেষ্টা করেছি। এমনকি নীলক্ষেত মার্কেটে দাঁড়িয়ে থেকেও কাজ শেখার চেষ্টা করেছি। কিন্তু হয়ে ওঠে নি। স্রষ্টা এই সুযোগটি করে দিলেন কোয়ান্টামে। এই প্রোগ্রাম সম্পন্ন করে আমার আত্মবিশ্বাস অনেক বেড়ে গেছে।



ইশরাত জাহান স্বর্ণা

আনন্দদায়ক শিক্ষা আমি পেয়েছি এই প্রোগ্রামে।



আসিফ নিজাম

সহজ হবে। কোয়ান্টামের এই প্রোগ্রামে প্রত্যেক

ব্যাংকার মো. রাইসুল ইসলাম কোয়ান্টাম প্রফেশনাল গ্রাফিক্স ডিজাইন প্রোগ্রাম সম্পন্ন করে বলেন, গ্রাফিক্স ডিজাইন শেখার ইচ্ছা ছিল অনেক আগে থেকেই। টিউটোরিয়াল দেখে শেখার চেষ্টা করেছি। এমনকি নীলক্ষেত মার্কেটে দাঁড়িয়ে থেকেও কাজ শেখার চেষ্টা করেছি। কিন্তু হয়ে ওঠে নি। স্রষ্টা এই সুযোগটি করে দিলেন কোয়ান্টামে। এই প্রোগ্রাম সম্পন্ন করে আমার আত্মবিশ্বাস অনেক বেড়ে গেছে।



জান্নাতুল ফেরদৌসী

একজন গ্রাফিক্স ডিজাইনার হিসেবে দেখতে চায়, তাহলে কোয়ান্টামের এই প্রোগ্রামটি তার জন্যে অত্যন্ত সহায়ক হবে।



ফজলে রাবি চৌধুরী

কাজ। বেতনের পাশাপাশি উপার্জন করতে লাগলাম অতিরিক্ত সম্মানী। দিনে সর্বোচ্চ ২৫৪ ডলার উপার্জন করেছি, যা সত্যিই পরম করুণাময়ের রহমত এবং কোয়ান্টাম আইসিটির অবদান।



মুহাম্মদ নজরুল ইসলাম

প্রশিক্ষার্থী সমান তালে অগ্রসর হতে পারে, যা আমার সবচেয়ে ভালো লেগেছে।

চাকরিজীবী জান্নাতুল ফেরদৌসী বলেন, এই প্রোগ্রামে আমরা যে ল্যাবে শেখার ও কাজ করার সুযোগ পেয়েছি, তা অত্যাধুনিক মানের একটি ল্যাব। যদি কেউ নিজেকে

চাকরিজীবী ফজলে রাবি চৌধুরী বলেন, প্রোগ্রাম চলাকালে একটা কল সেন্টারে চাকরি পেলাম। সেখানে কোনো গ্রাফিক্স ডিজাইনার না থাকায় আমার প্রশিক্ষণকে কাজে লাগানোর সুযোগ পেলাম। শুরু করলাম লোগো, ব্যানার তৈরির উপার্জন করতে লাগলাম। দিনে সর্বোচ্চ ২৫৪ ডলার উপার্জন করেছি, যা সত্যিই পরম করুণাময়ের রহমত এবং কোয়ান্টাম আইসিটির অবদান।

ব্যবসায়ী মুহাম্মদ নজরুল ইসলাম বলেন, এ প্রোগ্রামে এসে আমি নিজেকে নতুনভাবে আবিষ্কার করেছি আমার আত্মবিশ্বাস অনেক বেড়ে গেছে। এখানে শিক্ষাদান পদ্ধতি সত্যি অসাধারণ। আমার

এই প্রোগ্রামে যা আছে

কোয়ান্টাম আইসিটির আওতায় এডভান্স লেভেলের প্রোগ্রামগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো প্রফেশনাল গ্রাফিক্স ডিজাইন প্রোগ্রাম। এ প্রোগ্রামটি শুরু হয় ২০১৪ সালের আগস্ট মাসে। এ পর্যন্ত চারটি ব্যাচে অংশ নেন মোট ৩৯ জন।

দুই মাসব্যাপী এই প্রোগ্রামটি সাজানো হয়েছে অডিও-ভিজুয়াল পদ্ধতিতে। এছাড়াও প্রশিক্ষকের সার্বক্ষণিক উপস্থিতিতে রয়েছে হাতে-কলমে শেখার সুযোগ। কোয়ান্টাম আইসিটি প্রফেশনাল গ্রাফিক্স ডিজাইন প্রোগ্রাম সম্পন্ন করার মধ্য দিয়ে যে-কেউ সহজেই শিখে নিতে পারেন Web page graphics design, Image editing, Typographic work, Logo design, Icon design, Banner design, Book cover design, Image manipulation, Product packet design, 3D design ইত্যাদি।

তথ্যপ্রযুক্তির এই যুগে একজন মানুষ তার শৈল্পিক সত্তাকে সহজেই প্রকাশ করতে পারেন গ্রাফিক্স ডিজাইনের মাধ্যমে। এছাড়া বর্তমান সময়ে গ্রাফিক্স ডিজাইনের সাথে যোগসূত্র নেই, এমন ক্ষেত্র খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। তাই এ বিষয়ে দক্ষতা অর্জন করে মেধাকে যেমন বিকশিত করা সম্ভব, তেমনি রয়েছে আউটসোর্সিং ছাড়াও প্রযুক্তিক্ষেত্রে পেশা গড়ার চমৎকার সুযোগ।

বিশ্বাস, সচেতন অগ্রহ থাকলে যে-কেউ এই প্রোগ্রাম সম্পন্ন করে স্বাবলম্বী হতে পারবে।



রাজিয়া সুলতানা

হয়, যা কর্মজীবনে অত্যন্ত সহায়ক হবে।



সোলায়মান হোসেন রবিন

শেষে আমার ১০০টির মতো পোর্টফোলিও তৈরি হয়ে যায়। এরপর বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে এই পোর্টফোলিওসহ আমার সিটি জমা দেই। খুব সহজেই কাজের সুযোগ পেয়ে যাই একটি আউটসোর্সিং ফার্মে।

ডিজাইনার রাজিয়া সুলতানা বলেন, এই প্রোগ্রামে আর্ট ও ডিজাইন সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা দেয়া হয়। এছাড়াও জানতে পেরেছি, কীভাবে একটি কাজ প্রফেশনাল দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে সম্পন্ন করা যায়, কীভাবে ক্লায়েন্ট হ্যান্ডেল করতে

চাকরিজীবী সোলায়মান হোসেন রবিন বলেন, পুরো প্রোগ্রামটি অডিও-ভিজুয়াল হওয়ায় শেখাটা আমাদের জন্যে খুব সহজ হয়েছে। প্রতিটি ক্লাস এত উপভোগ করেছি যে, মোট ২৪টি ক্লাসের একটিও আমি বাদ দেই নি। প্রোগ্রাম



এপ্রিল ২০১৫

কোয়ান্টাম বুলেটিন

স্বাধীনতা দিবসে অনুষ্ঠিত জাতীয় শিশু-কিশোর সমাবেশ

কোয়ান্টাম কসমো স্কুল প্যারেডে প্রথম হলো



কোয়ান্টামের সালাম গ্রহণ করছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, পাশে ঢাকার জেলা প্রশাসক জনাব মো. তোফাজ্জল হোসেন মিয়া

২৬ মার্চ মহান স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে ঢাকার বঙ্গবন্ধু স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত জাতীয় শিশু-কিশোর সমাবেশের প্যারেড ইভেন্টে প্রথম হলো কোয়ান্টাম কসমো স্কুল। আর এ আয়োজনে এবারই প্রথম অংশ নেয় এই স্কুলের শিক্ষার্থী কোয়ান্টারা। ঢাকা জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে আয়োজিত এ অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

এবারের আয়োজনে ঢাকাসহ সারা দেশ থেকে অংশ নেয় মোট ৪৬টি স্কুল ও শিশু সংগঠন। অনন্য সাজপোশাক, আত্মবিশ্বাসী দেহভঙ্গি এবং দৃষ্টিভঙ্গি পারফরম্যান্সের কারণে পুরো অনুষ্ঠান জুড়েই বিশেষভাবে নজর কাড়ে কোয়ান্টারা। নেতিবাচকতার বৃত্ত ভেঙে অবিচল বিশ্বাসে নিরলস প্রয়াস চালিয়ে অতি সাধারণ পর্যায়ে থেকেও যে-কেউ আপাত অসম্ভবকে সম্ভব করতে পারে, প্রথম হতে পারে-স্টেডিয়ামে সেদিন



অনুষ্ঠানের বিশেষ আকর্ষণ ছিল কোয়ান্টামের ব্যান্ডবাদন

কোয়ান্টামের দৃষ্ট পদচারণাই এ চিরায়ত সত্যের প্রমাণ।

দুটি দলে মোট ৬৪ জন কোয়ান্টা প্যারেডে অংশ নেয়। এর পাশাপাশি কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠানের পুরোটা সময় ধরে বাংলাদেশ আনসার-ভিডিপি ব্যান্ড দলের সাথে যৌথভাবে ব্যান্ডবাদন পরিবেশন করে ৪৭ জন কোয়ান্টার সমন্বয়ে গঠিত একটি সুসজ্জিত ও চৌকস বাদক দল।

দেশের ঐতিহ্যবাহী স্কুল ও সংগঠনগুলোর সাথে প্রতিযোগিতা করে কোয়ান্টামের এ অভূতপূর্ব অর্জনের নেপথ্যে রয়েছে তাদের অনবদ্য টিম-ওয়ার্ক ও শ্রমানন্দময় কর্মপ্রচেষ্টা। অক্লান্ত চর্চায় রক্তকে ঘাম করে বরিয়েছে ওরা। প্রথম পুরস্কার এসেছে তারই স্বীকৃতিস্বরূপ। একই ইভেন্টে ভারতেশ্বরী হোমস ও বিএসবি ক্যামব্রিয়ান স্কুল এন্ড কলেজ যৌথভাবে দ্বিতীয় এবং বাংলাদেশ ন্যাশনাল ক্যাডেট কোর (বিএনসিসি) তৃতীয় স্থান অধিকার করে।

উল্লেখ্য, ২০০৩ সাল থেকে প্রতিবছরই লামা উপজেলা ও বান্দরবান জেলায় এবং ২০০৯ সাল থেকে চট্টগ্রাম বিভাগীয় পর্যায়ে বিজয় দিবসে অনুষ্ঠিত প্যারেড ও ডিসপ্লেটে অংশ নিয়ে বরাবরই প্রথম স্থান অধিকার করে আসছে কোয়ান্টারা।

বর্ষবরণ ১৪২২

প্রতিবারের মতো এবারও বাংলা নববর্ষ ১৪২২-কে সপরিবারে ও আনন্দমুখর পরিবেশে বরণ করে নেবে ফাউন্ডেশনের সব সেন্টার শাখা সেল প্রি-সেলের সর্বস্তরের সদস্যরা। আসন্ন বাংলা বছরটিকে এদিন স্বাগত জানানো হবে 'সুখী জীবন'-এর মেডিটেশনের মধ্য দিয়ে। এরপর থাকবে বিশেষ আত্ম উন্নয়নমূলক আলোচনা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

সেন্টার শাখা সেল প্রি-সেলের কার্যালয় ছাড়াও উন্মুক্ত মাঠ, পার্ক ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে বর্ষবরণের আয়োজন করবেন ফাউন্ডেশনের সদস্যরা। নতুন বছরে আমরা সবাই মিলে যেন সুস্থ দেহ প্রশান্ত মন কর্মব্যস্ত সুখী জীবনের পথে এগিয়ে যাই, কোয়ান্টাম পরিবারের সবার প্রতি এ আহ্বান জানিয়েছেন গুরুজী ও মা-জী।

মাটির ব্যাংক হালখাতা উৎসব

৩ ও ৪ এপ্রিল
করসেবা

ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে এপ্রিল মাস জুড়ে অনুষ্ঠিত হবে কোয়ান্টাম মাটির ব্যাংক হালখাতা উৎসব। আর এ উপলক্ষে ৩ ও ৪ এপ্রিল অনুষ্ঠিত হবে বিশেষ করসেবা।

এ হালখাতা উৎসবে দেশজুড়ে ফাউন্ডেশনের সব সেন্টার শাখা সেল প্রি-সেলগুলো অংশ নেবে মাটির ব্যাংক সংগ্রহ ও বিতরণে। আত্মীয় বন্ধু প্রতিবেশী সহকর্মী ও পরিচিতদের মাঝে ইতোপূর্বে বিতরণকৃত প্রতিটি মাটির ব্যাংক সংগ্রহ এবং নতুন মাটির ব্যাংক পৌঁছে দেয়াই বছরের এ করসেবার লক্ষ্য। আর সেই সাথে সবাইকে আমন্ত্রণ জানানো হবে আসন্ন বর্ষবরণ অনুষ্ঠানে।

উল্লেখ্য, ২০১৪ সালে মাটির ব্যাংক থেকে সারা বছরে মোট সংগ্রহ ছিল ১৯ কোটি ৪৩ লক্ষাধিক টাকা।

কোয়ান্টাম মেথড

৩৯০ তম কোর্স II ঢাকা

১৭, ১৮, ১৯ ও ২০ এপ্রিল
(শুক্র, শনি, রবি ও সোমবার)

স্থান : ইনস্টিটিউশন অব ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্স
বাংলাদেশ (আইডিইবি), কাকরাইল, ঢাকা

QUANTUM the SCIENCE of LIVING

বিশিষ্ট নাট্যব্যক্তিত্ব মান্নান হীরা। তিন দশকেরও বেশি সময় ধরে তিনি দেশের নাট্যজগতে একজন সক্রিয় কর্মী। অভিনয় করেছেন মঞ্চে, টেলিভিশনে। একাধারে তিনি একজন অভিনেতা, নাট্যকার, নির্দেশক এবং চলচ্চিত্রকার। মঞ্চনাটক, পথনাটক ও মুক্তনাটক মিলিয়ে তার রচিত নাটকের সংখ্যা অর্ধশতাধিক। সম্প্রতি তার রচনা ও পরিচালনায় মুক্তি পেয়েছে মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক পূর্ণদৈর্ঘ্য শিশুতোষ চলচ্চিত্র ‘একান্তরের ক্ষুদিরাম’। নাট্যসাহিত্যে উল্লেখযোগ্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ তিনি বাংলা একাডেমি পুরস্কার, জাকারিয়া স্মৃতি পদক, সাদত আলী আখন্দ সাহিত্য পুরস্কারসহ বিভিন্ন সম্মাননায় ভূষিত হন। মান্নান হীরা কোয়ান্টাম মেথড কোর্সের ৩৬১ তম ব্যাচে অংশ নেন। তার সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে আমাদের এবারের প্রতিবেদন।

অবিদ্যার অন্ধকার থেকে মুক্তির কথা বলে কোয়ান্টাম

মান্নান হীরা

৯০-এর দশকের গোড়ার কথা। অযোধ্যার বাবর মসজিদ ও রাম মন্দির নিয়ে তখন ভয়াবহ এক সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়েছিল ভারতের অনেক জায়গায়। এবং এর কিছুটা প্রভাব এসে পড়েছিল বাংলাদেশেও। কিন্তু অসাম্প্রদায়িক চেতনায় উদ্বুদ্ধ এদেশের সাধারণ মানুষ তা প্রতিহত করার যথাসাধ্য চেষ্টা করেন। ফলে এখানে তা বেশিদূর এগোতে পারে নি।

তখন আমি আরণ্যক নাট্যদলে কাজ করি। আমাদের মনে হয়েছিল, সাম্প্রদায়িকতার বিষবায়ু যাতে এদেশে প্রবাহিত হতে না পারে, এদেশের মানুষ যেন নিরাপদে থাকে, সেজন্যে আমাদেরও কিছু করার আছে।

সে-সময় আমি একটি সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিমূলক নাটক রচনা করি-আদাব। আরণ্যক থেকে আমরা তখন কয়েকটি দলে ভাগ হয়ে দেশের বিভিন্ন জায়গায় যাই এবং নাটকটি প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করি। আমরা এর নাম দিয়েছিলাম সাম্প্রদায়িকতার বিরোধী অভিযান।

আমি একটি দল নিয়ে যাই উত্তরবঙ্গে। বিভিন্ন শহর-গ্রামে প্রদর্শনী করে আমরা একসময় গিয়ে পৌঁছলাম পাবনা। চাটমোহরের কাছেই একটি হিন্দু-অধ্যুষিত গ্রাম। স্থানীয় লোকজনের সাথে কথা বললাম, তাদের সহায়তায় সন্ধ্যার পর নাটক প্রদর্শনের ব্যবস্থা করা হলো।

নির্ধারিত সময়ে গ্রামবাসীরা আসতে শুরু করলেন। সেদিন ছিল হাটবার। কয়েক হাজার মানুষ এলেন নাটক দেখতে। ওখানে বিদ্যুৎ ছিল না। অন্ধকারে দেখা যাচ্ছিল শুধু অগণিত কুপি বাতি। এর সাথে আমরা কিছু হাজারাক লাইটের ব্যবস্থা করেছিলাম, সেই আলোয় নাটক মঞ্চস্থ হলো।

নাটক শেষে লোকজন যে যার মতো চলে যাচ্ছেন। পুরো জায়গাটা আবার আগের মতোই অন্ধকার। আমরা সহকর্মীরা একজন আরেকজনকে খুঁজছি। আবছা আলোয় পরস্পরের হাত ধরে সবাই একসাথে থাকার চেষ্টা করছি। এর মধ্যেই হঠাৎ কারো স্পর্শ পেলাম। একটা হাত আমার ডান হাতটা ধরল। ভাবলাম, আমাদের দলেরই কেউ হবে হয়তো।

কিন্তু একটু খেয়াল করলেই দেখলাম, সাদা শাড়ি পরা বেশ প্রবীণ একজন হিন্দু বিধবা। জায়গাটা তখনো কিছুটা কোলাহলময়। মহিলার কানের কাছে মুখ নিয়ে বললাম, আপনি কিছু বলবেন? তিনি আমার হাতটা তার মাথায় ঠেকিয়ে বললেন, ‘বাবা, তোমরা আজ এখানে যা করলো তা করে কেবল দেবতারা।’

৩০ বছরেরও বেশি সময় ধরে নাটকের সাথে আমার পথচলা, কিন্তু এর চেয়ে বড় কোনো সম্মান আমি আজও পাই নি।

নাটক করব কিংবা নাটকই হবে আমার ধ্যানজ্ঞান, এমন কোনো লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য শৈশবে আমার ছিল না। বাবা ছিলেন মাঝারি গোছের সরকারি চাকুরে। তিনি চাইতেন আমি আমলা হই। কিন্তু এটা কোনোদিন মনে নিয়েছি বা প্রতিবাদ করেছি বলেও মনে পড়ে না।



রাজশাহী কলেজ থেকে ইন্টারমিডিয়েট পাশ করার পর শিল্পসংস্কৃতি জগতের অনেকের সাথে সখ্য গড়ে ওঠে। বন্ধুত্ব হয়। তারপর ৮০-এর দশকের শুরুতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র থাকা অবস্থায় যোগ দেই আরণ্যক নাট্যদলে। এভাবেই আস্তে আস্তে মঞ্চ আর অভিনয়ের সাথে জড়িয়ে যাই। একসময় নিজেও নাটক লিখতে শুরু করি। আমি লিখেছি মূলত কূপমণ্ডকতার বিরোধী, নারীনির্যাতনের বিরোধী এবং সাম্প্রদায়িকতার বিরোধী নাটক।

সাম্প্রদায়িকতা আসলে মনুষ্যত্বকে খণ্ডিত করে, চিন্তকে খণ্ডিত করে, ভূখণ্ডকে খণ্ডিত করে। যার ফলাফল আজ বিশ্বব্যাপী ধর্মাত্মতা ও এত হানাহানি আর রক্তক্ষয়। এর প্রতিকার হিসেবে চাই সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির বিকাশ ও অসাম্প্রদায়িক চেতনার বিস্তার ঘটানো।

কোয়ান্টামে আমি এ বিষয়টা খুঁজে পাই। কোয়ান্টাম মেথড কোর্সে বিজ্ঞান এবং ধর্মের যে সমন্বয় দেখেছি, তা শুধু দেশে নয়, সারা পৃথিবীতে ঘটেছে বলে আমার জানা নেই। গুরুজীর আলোচনায় বার বার ঘুরেফিরে আসে প্রত্যেক ধর্মের মহামানবদের কল্যাণবাণীগুলো। ফাউন্ডেশনের অফিসে ঢুকলে চোখে পড়ে এসব ধর্মবাণী সুন্দর করে লিখে রাখা হয়েছে। এটি আমার খুব ভালো লাগে। কাউকে ছোট করে নয়, বরং সব ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে নিজের ধর্মের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করাটাই তো আসল কথা।

সব ধর্মের উদ্দেশ্য তো আসলে একটাই, সেটা হলো, সত্য অনুসন্ধান। এ আবিষ্কারের চেষ্টা একজন বিজ্ঞানী, লেখক, শিল্পী, দার্শনিক একেকভাবে করতে পারেন, কিন্তু সবার লক্ষ্য তো সেই একটাই। কারো সাথে বিরোধে না গিয়ে আমরা সবাই যদি জীবনের সত্যসন্ধানে ব্রতী হই, তবে পৃথিবীজুড়ে এত নেতিবাচকতা আর কলহ ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা থাকে না।

আজকের এই সর্বগ্রাসী নেতিবাচকতা, এটি আমাদের একার সমস্যা নয়, এটি এখন আন্তর্জাতিক সমস্যা। এর সাথে জড়িয়ে আছে বিশ্ব রাজনীতি থেকে শুরু করে আজকের বিশ্ব অর্থনীতি ও বিশ্ব সাংস্কৃতিক ব্যবস্থা। আমাদের সবাইকে এমন একটি জায়গায় ঠেলে দেয়া হচ্ছে যে, তুমি কিছুই না, তুমি তুচ্ছ। কিন্তু কোয়ান্টামে বলা হচ্ছে, মানুষ নিজেই একটা শক্তি। সে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অংশ। গুরুজীর যত বই পড়েছি, তাতে দেখেছি, তিনি সমস্ত অজ্ঞানতা ও অবিদ্যার অন্ধকার থেকে মুক্তির কথা বলেছেন।

আর এ মুক্তির মধ্য দিয়েই মানুষ নিজেকে ভালবাসে, অন্যকে ভালবাসে, মিথ্যাকে প্রতিহত করে এবং সত্যকে জয় করে। একদিন সত্য আবিষ্কার করে। উপলব্ধি করতে পারে নিজের ‘আমি’কে।

আবার এই আমিটুকু উপলব্ধি করার পথে সবচেয়ে বড় বাধা হয়ে দাঁড়ায় আমাদের অহমবোধ। আমি যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের একটি উপাদানমাত্র এবং এর সাথে আমার যে সংযোগ, সেটা ভুলে গিয়ে তখন নিজেদেরকে আমরা একটা অন্ধকারের প্রাচীর দিয়ে ঘিরে ফেলি। আর সেই প্রাচীর ভেদ করে অসীমতার সন্ধান পাওয়া যায় না এবং সে ইচ্ছেটা-ও আমাদের ভেতর থেকে লোপ পায়। জীবনকে তখন আমরা মূল্যায়ন করি সংখ্যা দিয়ে-তোমার আছে অত ভরি, আমার এত ভরি। তোমার আছে অতটা, আমার এতটা।

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, ‘বস্তু মানুষকে একটা সীমার মধ্যে বেঁধে ফেলে’। আর এ সীমাটা ক্রমশ হয়ে উঠতে পারে দুর্ভেদ্য, যদি না থাকে এটি ভাঙার কোনো সুসজ্জবদ্ধ আয়োজন। আমি মনে করি, কোয়ান্টাম এমনই একটি আয়োজন। অন্ধকারের প্রাচীর ভেঙে অসীমে বিলীন হওয়ার জন্যে জীবনে চাই সত্যিকার আত্ম উপলব্ধি। এই আত্ম উপলব্ধির আঁতড়ঘর কোয়ান্টাম।

বান্দরবান লামার কোয়ান্টামে আমি গিয়েছিলাম। সেখানে অধ্যয়নরত শিশুদের দেখেছি। সুশৃঙ্খল ও আন্তরিক পরিচর্যার মধ্য দিয়ে ওদের যেভাবে গড়ে তোলা হচ্ছে, বাংলাদেশে তা এককথায় একটি অসাধারণ দৃষ্টান্তমূলক ঘটনা। এজন্যে কোয়ান্টামের সকল সদস্যকে আমি অভিনন্দন জানাই।

সাক্ষাৎকার গ্রহণ ও অনুলিখন : ডা. আতাউর রহমান

দেশে মেদস্থলতার হার বাড়ছে!

সচেতন হোন এখনই

মেদস্থলতা! সাম্প্রতিক কয়েক দশকে সারা পৃথিবীজুড়েই স্বাস্থ্যসচেতন মানুষের কাছে এটি দেখা দিয়েছে এক মূর্তিমান আতঙ্করূপে। এদেশেও আশঙ্কাজনক হারে বাড়ছে এর হার। সম্প্রতি বাংলাদেশের শহর এলাকাগুলোতে বসবাসরত নারী ও শিশুদের ওপর পরিচালিত একটি জরিপে এমন তথ্য মিলেছে। গবেষণাটি পরিচালনা করেছেন আন্তর্জাতিক উদরাময় গবেষণা কেন্দ্র (আইসিডিডিআর,বি)-র একদল গবেষক।

তারা বলেন, দেশে মোট জনসংখ্যার শতকরা ১৭ জন অতিরিক্ত ওজনধারী, আবার এদের মধ্যে শতকরা চার জন ভুগছেন মেদস্থলতায়। এছাড়াও সারা পৃথিবীতেই মেদস্থলতার হার বাড়ছে আশঙ্কাজনকভাবে। ইউনিভার্সিটি অব ওয়াশিংটনের ইনস্টিটিউট ফর হেলথ মেট্রিক্স এন্ড ইভালুয়েশন-এর একটি গবেষণায় বলা হয়েছে, ১৯৮০ সালের (শতকরা ২ জন) তুলনায় ২০১৩ সালে (শতকরা ৪ জন) এসে বিশ্বজুড়ে মেদস্থলতার পরিমাণ বেড়েছে দ্বিগুণ।

এখানে উল্লেখ্য, প্রত্যেক মানুষের উচ্চতা ও ওজন অনুসারে মেদস্থলতা পরিমাপের একটি সার্বজনীন পদ্ধতি হলো বিএমআই (বডি মাস ইনডেক্স)। বিএমআই নির্ণয়ের উপায় : দেহের ওজন (কিলোগ্রামে)/ উচ্চতা^২ (মিটারে)। এভাবে কারো বিএমআই মান যদি ১৮.৫ থেকে ২৫-এর মধ্যে হয় তবে তিনি স্বাভাবিক ওজনধারী। ২৫-এর বেশি হলে তিনি অতিরিক্ত ওজনধারী। আর বিএমআই মান ৩০-

বিশ্বজুড়ে মেদস্থলতা

- ১৯৮০ সালের তুলনায় বিশ্বজুড়ে বর্তমানে মেদস্থলতার হার বেড়েছে দ্বিগুণ।
- ২০১৪ সালের একটি হিসাব অনুসারে, ১৮ বছর এবং তদুর্ধ্ব বয়সী ১.৯ বিলিয়ন (৩৯%) মানুষ অতিরিক্ত ওজনের শিকার এবং এদের মধ্যে ৬০০ মিলিয়ন (১৩%) ভুগছে মেদস্থলতায়।
- প্রায় সব দেশগুলোতেই কম ওজনের মানুষের চেয়ে অতিরিক্ত ওজনের মানুষের মৃত্যুহার অনেক বেশি।
- ২০১৩ সালের একটি হিসাব অনুসারে, বিশ্বজুড়ে অনূর্ধ্ব পাঁচ বছর বয়সী শিশুদের ৪২ মিলিয়নই ভুগছে অতিরিক্ত ওজন ও মেদস্থলতায়।

(তথ্যসূত্র : বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা)



অঞ্চলভেদে অতিরিক্ত ওজন ও মেদস্থলতার হার

শহর	মা (%)	শিশু (%)
ঢাকা	৫৭	২২
চট্টগ্রাম	৬৪	১৩
সিলেট	৫৭	১৯
বরিশাল	৫৫	১৭
খুলনা	৫৫	১৫
রাজশাহী	৪৩	১০
রংপুর	৩৫	০৭

(তথ্যসূত্র : আইসিডিডিআর,বি)

এর বেশি হলে তিনি স্থলকায় বা মেদস্থল বলে বিবেচিত হবেন।

আইসিডিডিআর,বি-র উদ্যোগে দেশের সাতটি বিভাগীয় শহরে বছর দুয়েক আগে পরিচালিত এ স্বাস্থ্যজরিপে দেখা গেছে, পাঁচ থেকে ১৮ বছর বয়সী শিশু-কিশোরদের মায়েদের শতকরা ৫২ জনই অতিরিক্ত শারীরিক ওজনের শিকার এবং এদের মধ্যে ১৫ জনই মেদস্থল। আর এ শিশুদের শতকরা ১৪ জন অতিরিক্ত ওজনধারী এবং এদের মধ্যে শতকরা চার জন মেদস্থল।

অবস্থাপন পরিবারগুলোতে শিশু-মেদস্থলতার হার শতকরা ২৭ ভাগ, অন্যদিকে দরিদ্র পরিবারগুলোতে এই হার শতকরা ৩ ভাগ। গবেষকরা জানান, মাতৃ ও শিশু-মেদস্থলতার হার সবচেয়ে বেশি হলো ঢাকা ও চট্টগ্রাম শহরে। তাদের মতে, এ গবেষণা-কার্যক্রমে পরিণত বয়সের পুরুষরা অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না যদিও, কিন্তু তাদের ক্ষেত্রেও মেদস্থলতার চিত্রটা একই।

গবেষকরা সাবধান করে দিয়েছেন-‘অতিরিক্ত ওজনধারী এবং স্থলকায়দের ক্ষেত্রে হৃদরোগ, ডায়াবেটিস, ক্যান্সার, অস্টিওআর্থ্রাইটিস, লিভার ও গলগাভারের বিভিন্ন ধরনের জটিলতা এবং শ্বাসতন্ত্রের রোগে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা তুলনামূলক বেশি। এবং এসব জটিলতা থেকে তাদের অকালমৃত্যুর সম্ভাবনাও বেড়ে চলে সমানতালে।

যুক্তরাজ্য ভিত্তিক বিশ্বখ্যাত চিকিৎসা-সাময়িকী ল্যানসেট-এ প্রকাশিত একটি প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, মেদবহুলতার কারণে সৃষ্ট হৃদরোগ-সংক্রান্ত জটিলতায় সারা বিশ্বজুড়ে শুধু ২০১০ সালেই ঘটেছে

৩.৪ মিলিয়ন মৃত্যু। বিশেষজ্ঞরা জানান, বেশিমাাত্রায় উচ্চ ক্যালরিযুক্ত খাদ্যগ্রহণ এবং তুলনামূলক কম শারীরিক পরিশ্রমই পৃথিবীজুড়ে মেদবহুলতার অন্যতম প্রধান কারণ।

এ প্রসঙ্গে বাংলাদেশ ডায়াবেটিক এসোসিয়েশনের সভাপতি প্রফেসর ডা. এ কে আজাদ খান বলেন, মাত্রাতিরিক্ত চিনি ও ক্যালরিসমৃদ্ধ ফাস্টফুড ও কোমল পানীয়ের প্রতি শিশু-কিশোরদের আসক্তির ফলেই বাড়ছে তাদের মেদস্থলতার হার। কিন্তু সে তুলনায় সংশ্লিষ্ট কোনো দিক থেকেই নেই কোনো সুনির্দিষ্ট ও সুস্পষ্ট দিক-নির্দেশনা। অন্যদিকে ক্রমশ কমছে শিশুদের যে-কোনো ধরনের পরিশ্রম ও খেলাধুলা করার সুযোগ, এমনকি অধিকাংশ স্কুলেই নেই কোনো খেলার মাঠ।

আইসিডিডিআর,বি-র সহযোগী বিজ্ঞানী ও গবেষক ড. আলিয়া নাহিদ পরামর্শ দেন-স্বাস্থ্যকর জীবনযাপন ও সুস্থ খাদ্যাভ্যাস সম্পর্কে স্কুলগুলোতে প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা দেয়াটা খুব জরুরি। আর শহরবাসীদের খেলাধুলা ও পর্যাপ্ত শারীরিক পরিশ্রমের অভ্যাস করতে হবে। এটি বিভিন্নভাবে হতে পারে, যেমন : শহরের রাস্তাগুলোর এক পাশে সাইকেলের একটি লেন থাকতে পারে, যা নাগরিকদের শারীরিক পরিশ্রমে উদ্বুদ্ধ করবে।

তিনি এসব ব্যাপারে সবাইকে সচেতন হওয়ার আহ্বান জানিয়ে বলেন, শুধু উন্নত দেশগুলোতেই নয়, এর পাশাপাশি উন্নয়নশীল দেশগুলোতেও সমানে বাড়ছে মেদবহুলতার হার। আর দেহের অতিরিক্ত ওজনের ফলে নানাভাবে বাড়ছে অসংক্রামক ব্যাধির (হৃদরোগ, ডায়াবেটিস ইত্যাদি) সম্ভাবনা।

তাই আমাদের সচেতন হওয়ার সময় এখনই। মেদস্থলতা এবং এ-সংক্রান্ত রোগ-ব্যাধি জটিলতা প্রতিরোধে ভুল খাদ্যাভ্যাস ও অপরিমিত জীবনযাপনের বদলে চাই বৈজ্ঞানিক খাদ্যাভ্যাস ও পরিশ্রমসম্পন্ন সুস্থ জীবনচারণ।

তথ্যসূত্র : দ্য ডেইলি স্টার, ২১ মার্চ ২০১৫

ভোজনরসিক হবেন না।
শুধু খিদে লাগলেই খাবেন।
কিছুটা খিদে রেখেই
খাওয়া শেষ করবেন।

কোয়ান্টাম মেথড কোর্সের অনুভূতি

৩৮১ ব্যাচ ॥ ঢাকা

এই কোর্স আমার জীবনের সঠিক সিদ্ধান্তগুলোর মধ্যে অন্যতম। কোয়ান্টাম মেথড কোর্সে বিজ্ঞানের সাথে ধর্মের যে সুন্দর সম্মিলন দেখলাম, তা আমাকে মুগ্ধ করেছে।

নাজরাতান নাসিম • প্রভাষক, অণুজীব বিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

এখানে এসে বুঝলাম, আমার এতদিনের যা জ্ঞান তা ছিল খণ্ড খণ্ড জ্ঞান। কিন্তু গুরুজী কোয়ান্টাম মেথডের মাধ্যমে আমাদের এই খণ্ড খণ্ড জ্ঞানকে একটা পরিপূর্ণ রূপ দিলেন।

ডা. আজমল হুসাইন • ন্যাচারাল হিলিং কনসালটেন্ট

সবসময় ভাবতাম আমাদের পরের প্রজন্ম, আমাদের সন্তানরা কোথা থেকে শিষ্টাচার শিখবে, কোথায় জীবনের উপলব্ধিগুলো পাবে? এখন আমি আশাবিত্তি যে, আমাদের সন্তানরা সত্যিকারের মানুষ হতে শিখবে কোয়ান্টামে এসে।

ফাহিমদা খাতুন • সিনিয়র অফিসার, অগ্রণী ব্যাংক লি.

মেডিটেশন করে আমার রক্তচাপ ও হার্টবিট এখন একেবারে স্বাভাবিক এবং অসুস্থতার সমস্ত অনুভূতি যেন চলে গেছে। আমি বিশ্বাস করি, মানুষকে জাগানোর যে যাত্রা কোয়ান্টাম শুরু করেছে, তা আরো ছড়িয়ে যাবে।

আবুল কাশেম • ব্যবসায়ী

৩৮২ ব্যাচ ॥ রাজশাহী

শিক্ষক হিসেবে ছাত্রছাত্রীকে অনুপ্রাণিত করা, তাকে জড়িত করে তোলার কাজটা বোধহয় আমরা সবাই পারি না। কোর্সে এসে আমি শিখলাম, কীভাবে শেখাতে হয়। গুরুজী আমাদেরকে যে প্রশান্তির ভুবনে প্রবেশ করালেন, তার জন্যে আমি কৃতজ্ঞ।

ড. ফেরদৌসী বেগম • অধ্যাপক, উদ্ভিদ বিজ্ঞান বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

কোর্সে শিখলাম, মহান জাতি হতে হলে আমাদের প্রয়োজন উষ্ণ হৃদয় আর ঠান্ডা মাথা। হৃদয় আর মস্তিষ্কের এই সুন্দর সমন্বয়ের জন্যে কোয়ান্টাম মেথডের কোনো বিকল্প নেই।

ড. মো. মনিরুজ্জামান • অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক, কারমাইকেল কলেজ, রংপুর

আট বছর আগে প্যারালাইসিসে আক্রান্ত হই। তারপর থেকে রুকু-সেজদা দিয়ে নামাজ পড়তে পারতাম না। কোর্সের প্রথমদিন থেকেই আমি রুকু-সেজদা দিয়ে নামাজ পড়তে পারছি।

নুরজাহান বেগম • গৃহিণী

একজন পরিপূর্ণ মানুষ হওয়ার জন্যে প্রো-একটিভ হওয়া প্রয়োজন। আমি কোর্সে এসে শিখলাম কীভাবে প্রো-একটিভ হতে হয়।

আব্দুমান্নান আরা চৌধুরী • সহকারী শিক্ষক, গভর্নমেন্ট ল্যাবরেটরি হাই স্কুল, রাজশাহী

৩৮৩ ব্যাচ ॥ বরিশাল

৩৫ বছরের ধূমপানের অভ্যাস ত্যাগ করতে পেরেছি চার দিনের এই কোর্সে এসে। সবসময় বুকে একটা ব্যথা হতো, ব্যথাটাও আর অনুভব করছি না।

মো. এমাদুল হক • ব্যবসায়ী

আমার ব্যাকপেইন ছিল সাত বছর যাবৎ। আধা ঘণ্টা বসে থাকতে পারতাম না। কিন্তু এখানে প্রতিদিন ১০ ঘণ্টা বসে থেকেছি। তারপর বাসায় গিয়েও কোনো ক্লান্তি নেই। আমি দিব্যি সুস্থ।

শিল্পী কর্মকার • গৃহিণী

ছয় বছর ধরে ব্যথার কারণে আমি ঘাড় ঘোরাতে পারতাম না। কোর্সে চার দিন মেডিটেশন করার পর আমার ব্যথা অনেক কমে গেছে।

মো. নূরুল আমিন শিকদার • সরকারি চাকরিজীবী

কর্মসূত্রে বান্দরবানের লামায় কোয়ান্টামের স্কুলটিতে আমি গিয়েছি। উপলব্ধি করেছি, ভালো কাজ করতে অর্থবিত্ত, বৈভব নয়, প্রয়োজন সেবার মানসিকতা।

লুৎফুন নাহার আফরোজ • জেলা শিক্ষা অফিসার, বরিশাল

৩৮৪ ব্যাচ ॥ ঢাকা

অভিজ্ঞতায় দেখেছি, ৪০-৫০% রোগী বার বার ফিরে আসে। পরীক্ষা-নিরীক্ষায় তাদের কোনো রোগও পাওয়া যায় না। আমি মনে করি, এ সমস্ত রোগীর জন্যে কোয়ান্টাম মেথড অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

ডা. মো. শহীদুল ইসলাম সেলিম • অধ্যাপক, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়

কীভাবে যে ৪০ ঘণ্টা পার হয়ে গেল, টেরও পেলাম না। গুরুজীর আলোচনাগুলো সুস্থতার ক্ষেত্রে আমাকে প্রতিনিয়ত সাহস যুগিয়েছে।

আলী আকবর রুপু • বিশিষ্ট সংগীত পরিচালক

এখন কর্মময় জীবনের সবগুলো দিককে আমি সুন্দরভাবে সমন্বয় করতে পারব। প্রার্থনা করি, নতুন প্রজন্ম কোয়ান্টামের আলোয় আলোকিত হোক।

ডা. উম্মে সালমা আবদুল্লাহ • সহযোগী অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান, ঢাকা ভেন্টাল কলেজ

নতুন করে উপলব্ধি করলাম, সৃষ্টিকর্তাকে স্মরণ করতে হবে প্রতিদিন, প্রতিমুহূর্তে, প্রতি পদক্ষেপে।

সোমা চক্রবর্তী • সহকারী অধ্যাপক, ডুয়েট, গাজীপুর

মন আর দেহের পূর্ণ সুস্থতা নিয়ে আমাদের ভালো থাকার পথ দেখাচ্ছে কোয়ান্টাম।

ড. মো. ফজলে এলাহী ভূইয়া • অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ, গাজীপুর

এখন আমি রাগ নিয়ন্ত্রণ করতে পারছি। সন্তানদের সাথে আমার সুসম্পর্ক আরো বেড়েছে।

জয়শ্রী সেনগুপ্ত • গৃহিণী

৩৮৫ ব্যাচ ॥ সিলেট

শুধু পার্থিব জীবনই নয় পরবর্তী জীবনের জন্যেও মানুষ হিসেবে আমার করণীয় সম্পর্কে জানলাম।

ডা. কাওসারি সুলতানা • সহকারী অধ্যাপক, গণিত বিভাগ, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট

কোর্স সম্পন্ন করার পর নিজেকে একজন ইতিবাচক মানুষ মনে হচ্ছে। এই কোর্সটা জীবনের বেসিক ট্রেনিং হিসেবে প্রত্যেকের করা উচিত।

ডা. মো. আতিকুল ইসলাম

কোর্সে এসে সমস্ত রাগ-ক্ষোভ ঝেড়ে ফেলতে শিখেছি। নিজেকে খুব হালকা মনে হচ্ছে। আমার আত্মবিশ্বাস অনেক বেড়ে গেছে।

ফারজানা হোসেন • এডভোকেট

২০০১ সাল থেকে আমার সাইনুসাইটিস। নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হতো। এখন ঠিকমতো শ্বাস নিতে পারছি।

আব্দুল মালেক • প্রভাষক, লতিফা শফি চৌধুরী মহিলা ডিগ্রি কলেজ, দক্ষিণ সুরমা, সিলেট

সাত বছর ধরে আমার মাইগ্রেন। প্রায় ২৪ ঘণ্টাই মাথাব্যথা করত। এই চার দিনে একবারও মাথাব্যথা হয় নি। পড়ালেখাতেও আমার মনোযোগ বেড়েছে।

প্রীতি আহমেদ • শিক্ষার্থী

৩৮৬ ব্যাচ ॥ চট্টগ্রাম

কোয়ান্টামে বয়স পেশা ধর্ম নির্বিশেষে সবার অংশগ্রহণ এবং আনন্দ নিয়ে শেখার যে সহজ সরল পদ্ধতি, তা অভাবনীয়।

ড. অলক পাল • অধ্যাপক, ভূগোল ও পরিবেশ বিদ্যা বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

টেনশনমুক্ত সুস্থ জীবন গড়তে শিখলাম কোয়ান্টামে।

এড. সেলিনা খানম • আইনজীবী

কোয়ান্টামের শিক্ষা মানুষকে মানুষ করে। নিজেকে ও অন্যকে ভালো রাখার শিক্ষা দেয় কোয়ান্টাম।

নাইট বড়ুয়া • ব্যবসায়ী, প্রতিষ্ঠাতা, কালচারাল পার্ক

আমার ঘুমের সমস্যা ছিল। সকালে উঠতে পারতাম না। এখন মনের ঘড়িতে এলার্ম দিয়ে ঠিক সময়ে ঘুম থেকে উঠতে পারছি।

এস এম এম বাবর • চাকরিজীবী

পারিবারিক মেডিটেশনে উপলব্ধি করলাম, আমাদের জীবনে মা-বাবার গুরুত্বটা কতটুকু। মা-বাবাকে কোনোদিন এভাবে অনুভব করি নি।

মুহম্মদ মাহমুদ হোসেন রবি • শিক্ষার্থী, কলেজিয়েট স্কুল এন্ড কলেজ, চট্টগ্রাম

একবছর ধরে আমার ব্যাকপেইন। কোর্সের তৃতীয় দিন থেকে ব্যথাটা নেই।

ফাহিমদা ইয়াসমিন • শিক্ষার্থী, সাউদার্ন ইউনিভার্সিটি

কোয়ান্টাম হিলিং ও সাইকি কার্যক্রম নিরাময়ের শাস্ত্র প্রক্রিয়া

রোগ নিরাময়ে বিশ্বাস মনছবি প্রার্থনা ও সদকার এক আত্মিক প্রক্রিয়া কোয়ান্টাম হিলিং। গত ১৬ বছরে লক্ষ লক্ষ মানুষ এ প্রক্রিয়ার সাথে যুক্ত হয়ে রোগ-ব্যাদি, বালা-মুসিবত থেকে মুক্ত হয়েছেন।

অনিদ্রা মাইগ্রেন হৃদরোগ শ্বাসকষ্ট চর্মরোগ বাতব্যথা আইবিএস মাদকাসক্তি উচ্চরক্তচাপ এমনকি ক্যান্সারের মতো দুরারোগ্য ব্যাদি থেকে আরোগ্য লাভ করেছেন। সুস্থতার পাশাপাশি এসেছে শিক্ষায়-ক্যারিয়ারে সাফল্য, আর্থিক সমৃদ্ধি, পরিবারে সুখ। ২০১৪ সালে সারা দেশে ৫,৩৩,১৬৫টি সদকা হিলিং সম্পন্ন হয়।

কোয়ান্টাম হিলিংয়ের কার্যকারিতার নেপথ্যে রয়েছে মেডিটেশন বা ধ্যান। ধ্যানের

স্তরে দোয়া রূপান্তরিত হয় সঞ্চারমান কল্যাণশক্তিতে। যৌথ নিরাময়ে এ কল্যাণ বেড়ে যায় আরো বহুগুণ। শাস্ত্র এ প্রক্রিয়ার সাথে যুক্ত সদকা নিরাময়কে ত্বরান্বিত করে।

পৃথিবীর সকল শাস্ত্র ধর্মে নিরাময়ের জন্যে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে প্রার্থনাকে। আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানও একই সুরে বলছে, বিশ্বাস নিরাময়ের এক অপরিহার্য অনুষঙ্গ। আর হিলিং বা সম্মিলিত প্রার্থনার শক্তি রোগীর মনে বিশ্বাস ও ইতিবাচকতা সঞ্চারিত করে।

নিজের ও অন্যের কল্যাণে প্রার্থনার শক্তিকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রয়োগের প্রক্রিয়া শেখার চমৎকার সুযোগ হলো দুই দিনের কোয়ান্টাম হিলিং ও সাইকি কার্যক্রম।



মো. আলী মর্তুজা

এখন আমার আত্মবিশ্বাস আরো চাঙ্গা হয়েছে।



ইশরাত জাহান

প্রোগ্রামে অংশ নেয়ার জন্যে।

চাকরিজীবী মো. আলী মর্তুজা বলেন, ডাস্ট এলার্জি আর কোন্ড এলার্জিতে ভুগছিলাম দীর্ঘদিন ধরে। চিকিৎসা করিয়েও ফল পাই নি। অথচ অন্যের নিরাময় করার প্রক্রিয়া শিখতে এসে আমি নিজেও বেশ সুস্থ অনুভব করছি।

গৃহিনী ইশরাত জাহান বলেন, নিজের ও পরিবারের সদস্যদের কল্যাণ কামনায় বেশ কয়েকবার আমি সদকা হিলিংয়ে নাম দিয়েছি এবং উপকৃত হয়েছি। কোয়ান্টাম হিলিংয়ের ওপর এই আস্থা থেকেই নিজে উৎসাহিত হলাম এ



সানজিদা চৌধুরী

পেরেছি। মনে হচ্ছে, অন্তর্গতের সাথে আরো একাত্ম হওয়ার পথ আমি খুঁজে পেয়েছি।



মুহম্মদ জাকারিয়া অনন্য

এভাবে মানবতার কল্যাণে কাজে লাগানো যায় তা এখানে না এলে অজানাই রয়ে যেত।

চাকরিজীবী সানজিদা চৌধুরী বলেন, নিজের হিলিং করে যতটা ভালো লেগেছে, তার চেয়েও বেশি শান্তি পেয়েছি অন্যের হিলিং করে। সচেতন, অবচেতন ও অচেতন-মনের তিনটি স্তর সম্পর্কে জানতে

ব্যবসায়ী মুহম্মদ জাকারিয়া অনন্য জানান, প্রস্তুত দেয়া এই বিষয়কর নেয়ামত দেহকে কীভাবে সুস্থ রাখতে হয়, কীভাবে যত্ন নিতে হয়, তা জেনেছি এ প্রোগ্রামে। জেনেছি অতীন্দ্রিয় শক্তি সম্পর্কে। মনের অসীম শক্তিকে যে

এ প্রোগ্রামে যা আছে

- ♦ আত্মনিরাময় লাভের প্রক্রিয়া
- ♦ পর্যবেক্ষণ শক্তিকে শাণিত করার প্রক্রিয়া
- ♦ অন্যের (পরিচিত/ অপরিচিত) রোগ নির্ণয়, রোগ নিরাময় ও কল্যাণ কামনার প্রক্রিয়া
- ♦ পারিবারিক ও দাম্পত্য সম্পর্ক উন্নয়ন, ইন্টারভিউ ও ভাইভা বোর্ডে সাফল্য, পেশাগত উন্নতির জন্যে সহযোগিতা লাভসহ কমান্ড সেন্টার ব্যবহারের শক্তি
- ♦ প্রজ্ঞা অর্থাৎ স্বতঃস্ফূর্তভাবে সঠিক সময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত নেয়ার সামর্থ্য
- ♦ সৃজনশীল ও উদ্ভাবনী কর্মকাণ্ডে দক্ষতা
- ♦ ভালো কাজে অন্যকে উদ্বুদ্ধ করার ক্ষমতা



অধ্যাপিকা শাহীনা আরিফা

অধ্যাপিকা শাহীনা আরিফা বলেন, কোয়ান্টাম হিলিং ও সাইকি প্রোগ্রাম সম্পন্ন করে আমার নিজের ওপরে আস্থা অনেক বেড়ে গেছে। এখানে এসে জানতে পারলাম শরীরের রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থাকে সক্রিয় করার প্রক্রিয়া সম্পর্কে। আমি মনে করি, জীবনকে সঠিকভাবে পরিচালনার ক্ষেত্রে এ কার্যক্রম আমাদের জন্যে অত্যন্ত সহায়ক হবে।



মোরশেদ তৌহিদুল হাসান

পর্যবেক্ষণ ক্ষমতাও আগের চেয়ে বেড়েছে। এত সুন্দর একটি আয়োজনের জন্যে আমি কোয়ান্টামের কাছে কৃতজ্ঞ।



ডা. সারওয়াত আফরীন

কমান্ড সেন্টারে ধ্যানের স্তরে দোয়া করার প্রক্রিয়াটাও আমি শিখলাম। কোয়ান্টামের সাথে, ভালো কাজের সাথে সবসময় যুক্ত থাকার অনুপ্রেরণা অনুভব করছি নতুন করে।



মো. মাকসুদুল হাসান

প্রকৌশলী মো. মাকসুদুল হাসান তার অনুভূতি প্রকাশ করতে গিয়ে বলেন, মানবদেহের যে অসাধারণ সূক্ষ্ম গঠনতন্ত্র, তা সম্পর্কে স্বচ্ছ ও সুস্পষ্ট ধারণা পেয়েছি হিলিং ও সাইকি কার্যক্রমে এসে।



আসমা বেগম

প্রোগ্রামের প্রতিটি আলোচনা অত্যন্ত প্রাণবন্ত ও আনন্দদায়ক। ফলে নিরাময়ের প্রক্রিয়া শেখাটা খুব সহজ হয়ে গেছে।



সঞ্জীব কুমার পাল

দোয়া করার মধ্যেও যে এত প্রশান্তি এটা জানা ছিল না। হিলিং ও সাইকি প্রোগ্রামে এসে আমি আনন্দিত। এ কল্যাণচর্চার সাথে আমি যুক্ত থাকতে চাই।

প্রকৌশলী মো. মাকসুদুল হাসান তার অনুভূতি প্রকাশ করতে গিয়ে বলেন, মানবদেহের যে অসাধারণ সূক্ষ্ম গঠনতন্ত্র, তা সম্পর্কে স্বচ্ছ ও সুস্পষ্ট ধারণা পেয়েছি হিলিং ও সাইকি কার্যক্রমে এসে।

ব্যবসায়ী কাজী আসমা বেগম বলেন, দুই দিনের এ প্রোগ্রামে অংশ নিয়ে নিজেকে অনেক সতেজ আর সুস্থ মনে হচ্ছে। মানুষের মাঝে রোগ নিরাময়ের যে এত অসাধারণ ক্ষমতা দিয়ে আল্লাহ পাঠিয়েছেন, তা এভাবে কখনো উপলব্ধি করি নি। হিলিংয়ের এই প্রক্রিয়া অনুসরণের মাধ্যমে প্রস্তুতের সাথে নিজেকে আরো বেশি একাত্ম অনুভব করছি। মেডিটেশনেও আমার মনোযোগ আগের চেয়ে বেড়েছে।

সঞ্জীব কুমার পাল বলেন, সাধারণত আমরা আত্মীয়স্বজন, পরিচিতদের দুঃখকষ্ট দেখলে বিচলিত হই, তাদের দুঃখ দূর করতে পারলে আনন্দিত হই। কিন্তু সম্পূর্ণ অপরিচিত মানুষের নিরাময়ের জন্যে, কল্যাণের জন্যে

গ্রাজুয়েটদের প্রশ্ন



উত্তর দিচ্ছেন গুরুজী

প্রশ্ন : আমি একটা লাইফ ইস্যুরেস প্রতিষ্ঠানে কর্মরত আছি। বর্তমানে আমি এমন একটি পেশা খুঁজছি, যেখানে সহজ, সম্মানজনক, ভালো ও হালাল উপায়ে উপার্জন করতে পারব। অবশ্য আমি ফাউন্ডেশনে জয়েন করার জন্যেও দরখাস্ত পাঠিয়েছি। আমার জন্যে দোয়া করবেন।

উত্তর : আমরা আপনার জন্যে দোয়া করি। ফাউন্ডেশন তো সবসময়ই সবার জন্যে। ফাউন্ডেশনের কাজটা কিন্তু কোনো পেশা নয়। একে যদি পেশা মনে করেন, তাহলে আপনি ভুল করবেন। ফাউন্ডেশন হচ্ছে মিশন। এখানে সার্বজনিক কাজ করার অর্থ হচ্ছে, এটাই জীবন। আর এই জীবন হচ্ছে একজন উৎসর্গীকৃত মানুষের-আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যে। মেধার সর্বোত্তম বিকাশ এবং মানুষের সর্বোত্তম সেবা-এই নিয়ত নিয়ে যদি ফাউন্ডেশনে আসতে পারেন, আপনি শান্তি পাবেন। আপনি এখানে ভালো থাকবেন।

আর যদি একে একটি পেশা মনে করেন, আপনি সবসময় শুধু সুযোগসুবিধার হিসাব কষতে থাকবেন। এবং একটা সময় আপনি দেখবেন আপনি হতাশ হয়ে পড়েছেন এবং চলে যাবেন। কারণ, চাকরিতে সাধারণভাবে আমরা যে-সব সুযোগসুবিধার কথা চিন্তা করি, এখানে ওসব ব্যাপার খুব কম।

আর আপনি যদি কাজ করতে চান, বেহিসাব কাজ, তাহলে ফাউন্ডেশনে আসুন। এখানে কাজের কোনো শেষ নেই। রিজিক যা আল্লাহ দেবেন, তাতে আপনার ভালোই চলে যাবে। তবে শুধু এটুকু বলতে পারি, আমাদের কোনো অভাব নেই। আলহামদুলিল্লাহ! বরং অনেকে একেকসময় দুঃসাহসিক সব কাজ করে ফেলেন।

এই যে সেদিন, আমাদের এক অর্গানিয়ার, তিনি একজন মেয়ে-২১ দিনে দক্ষিণ ভারতের ১৪টা শহর সফর করে এলেন এবং একা। যাওয়ার আগে আমাকে জিজ্ঞেস করলেন যে, আমি কি যাব? আমি বললাম, কেন যাবেন না? না যাওয়ার দুটো কারণ থাকতে পারে। প্রথমত, কোনো অঘটন ঘটর ভয়; দ্বিতীয়ত, একা মহিলা বলে ঝামেলার ভয়। সেটা তো ঢাকা শহরেও হতে পারে। শুধু চোখ-কান খোলা রাখতে হবে। চোখ-কান একটু খোলা রাখলে আল্লাহ তাকে সাহায্য করেন। আলহামদুলিল্লাহ! তিনি সুন্দরভাবে সফর করে এসেছেন। এবং এসে বললেন যে, ফাউন্ডেশনে না থাকলে এভাবে একা বেরিয়ে পড়ার সাহস তার কখনোই হতো না। আর সেখানেও তিনি পদে পদে অনুভব করেছেন আল্লাহর রহমত, সন্তোষ বরকত।

অতএব, আপনাকে আগে বুঝতে হবে যে, ফাউন্ডেশন কোনো পেশা নয়। এটা হচ্ছে মিশন-অক্লান্ত কাজের মধ্যে আনন্দ খুঁজে পাওয়া এবং স্রষ্টার সন্তুষ্টির জন্যে জীবন উৎসর্গ করা। আমি সাধ্যমতো মানুষের কল্যাণ করব। আর আমার যা প্রয়োজন, সেটা আল্লাহ দেখবেন। কারণ আল্লাহ সর্বোত্তম রিজিকদাতা।

ফাউন্ডেশনে যারা কাজ করছেন, যারা বিভিন্ন পেশা ছেড়ে এখানে এসেছেন-চিকিৎসক প্রকৌশলী আইনজীবী তথ্যপ্রযুক্তিবিদ এবং অন্যান্য আরো যারা আছেন, তাদের জিজ্ঞেস করে দেখুন যে, আগের পেশা ছেড়ে এসে তাদের মধ্যে কোনো অতৃপ্তি আছে কিনা। রিজিকের কোনো অসুবিধা হয়েছে কিনা।

আল্লাহর দেয়া বরকত এক জিনিস আর আমার চাহিদা বা কী কী সুযোগসুবিধা চাই, সেটা আলাদা কথা। যখন ফাউন্ডেশনের কাজকে জীবন মনে করে আসবেন, আপনি দেখবেন আপনার মেধার সর্বোত্তম বিকাশ ঘটছে এখানে। আমাদের অর্গানিয়ারদের মধ্যে কেউ কেউ এখন দেশে-বিদেশে বিভিন্ন সেমিনার ও কনফারেন্সে অংশ নিচ্ছেন।

কিছুদিন আগে ভারতের পশ্চিমবঙ্গে অনুষ্ঠিত স্বেচ্ছা রক্তদানবিষয়ক একটি আন্তর্জাতিক কনফারেন্সে অংশ নিয়েছেন অর্গানিয়ারদের একটি টিম। যিনি ওখানে কোয়ান্টাম স্বেচ্ছা রক্তদানের ওপর মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেছেন, তাকেই আমন্ত্রণ জানানো হয় তিন দিনের কনফারেন্সের সমাপনী অধিবেশনে সভাপতিত্ব করার জন্যে। তিন দিনের অনুষ্ঠানে ওই একটি মাত্র অধিবেশনই ঠিক সময়ে সমাপ্ত হয়। কারণ সভাপতিত্বে ছিলেন আমাদের অর্গানিয়ার। কোয়ান্টামের নিয়মকানুন অনুসরণ করে তিনি অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন।

অর্থাৎ মেধার সর্বোত্তম বিকাশ ঘটানোর জন্যে ফাউন্ডেশন হতে পারে আপনার প্রথম পছন্দ। সেই সাথে মানুষের সর্বোত্তম সেবা-এটা যদি আপনার জীবনের লক্ষ্য হয় এবং এতে আপনি জীবনের সার্থকতা খুঁজে পান, তবে সানন্দে আপনি ফাউন্ডেশনে আসতে পারেন।

প্রশ্ন : আমি একজন ব্যবসায়ী। পেশাগত ক্ষেত্রে আমাদের অনেক সময় প্রতিপক্ষের সাথে প্রতিযোগিতা করতে হয় এবং সেইসময় কুশলী হয়ে অনেক কথা বলতে হয় প্রতিপক্ষের নামে। এটা কি গীবত হবে?

উত্তর : কঠিন প্রশ্ন বটে। কিন্তু কথা হচ্ছে, গীবত না করেও কিন্তু পারা যায়। আপনি তো নিশ্চয়ই কোনো পণ্য উৎপাদন বা বিপণন নিয়ে কাজ করছেন এবং আপনার পণ্যের কিছু সবল দিক আছে। অর্থাৎ যে কাজই আপনি করেন সেটার কিছু ইতিবাচক দিক আছে। আপনি সেটিকে তুলে ধরুন সবার সামনে। আর কোনো ব্যক্তির বিরুদ্ধে কখনো কিছু বলবেন না। আপনি বড়জোর আপনার যে প্রতিপক্ষ, তাদের পণ্যের অসুবিধাগুলোর তুলনায় আপনার উৎপাদিত পণ্যের ইতিবাচক দিকগুলো তুলে ধরুন। বুদ্ধিমান এবং বড় বড় ব্যবসায়ীরা এটাই করেন। অর্থাৎ পেশাগত বিষয়টিকে কখনো ব্যক্তিগত পর্যায়ে নিয়ে যাবেন না এবং মিথ্যা কিছু বলবেন না।

প্রশ্ন : আমি আমার বাস্তব জীবন ও অভিজ্ঞতা থেকে একটি সত্য উপলব্ধি করেছি যে, পরিপূর্ণ আনন্দ নিয়ে কাজ করলে যে-কোনো কঠিন কাজই সহজ হয়ে যায়। কিন্তু আনন্দটাকে আমি সবসময় নিজের মনের মধ্যে ধরে রাখতে পারি না। মেডিটেশন ছাড়া আর কী কী উপায়ে আমি সবসময় আনন্দের সাথে সব কাজ করতে পারব?

উত্তর : সারাদিন তো আপনি মেডিটেশন করতে পারবেন না। আর সারাদিন মেডিটেশন করার প্রয়োজনও নেই। আপনি সবসময় আনন্দে থাকতে চান, এটা ভালো। সকালবেলা দিন শুরু করবেন 'শোকর আলহামদুলিল্লাহ' বলে।

সারাদিন যতই ব্যস্ত থাকুন কিংবা অবসরে থাকুন, সবসময় মনে মনে বলতে থাকুন, আলহামদুলিল্লাহ! প্রভু তোমাকে ধন্যবাদ। অর্থাৎ

ভেতরে শুকরিয়া বা কৃতজ্ঞচিত্ততার অনুভূতিটা প্রতি মুহূর্তে লালন করুন। তাহলে আপনি সবসময় একটা ভালো লাগা ও আনন্দ-অনুরণনে থাকতে পারবেন।

আমাদের সমস্যাটা হচ্ছে, আমরা অধিকাংশ মানুষই বেশিরভাগ সময় দুঃখের স্মৃতিটাকে লালন করি, অবচেতনভাবে এবং কখনো কখনো সচেতনভাবেই। ফলে ওই স্মৃতিটাই দীর্ঘস্থায়ী হয়। হয়তো জীবনের নয়টা আনন্দ আমরা ভুলে থাকি একটা দুঃখস্মৃতি দিয়ে। ফলাফল-ক্লান্তি, অবসাদ এবং নেতিবাচকতা। কোনো কাজই তখন আমরা আনন্দ নিয়ে করতে পারি না এবং কাজেও একটা অনীহা চলে আসে।

তাই আনন্দের স্মৃতিটাকে সবসময় মনে রাখতে হবে। আর এটা সম্ভব যখন ভেতরে শুকরিয়া থাকবে। যত বেশি 'শোকর আলহামদুলিল্লাহ' বলবেন, দেখবেন আপনি তত আনন্দে আছেন এবং আনন্দ নিয়ে প্রতিটি কাজ করতে পারছেন।

প্রশ্ন : কোয়ান্টামে আসার জন্যে আমার বন্ধুর সাথে প্রায়ই আমার ঝগড়া হয়। এমনকি সে মেডিটেশনেও আগ্রহী নয়। সে বলে নামাজ পড়লেই পরিপূর্ণ প্রশান্তি পাওয়া সম্ভব। দিনে দিনে তার সাথে আমার সম্পর্কের অবনতি হচ্ছে। আমি তাকে কীভাবে বোঝাব?

উত্তর : আপনি তাকে মোটেই বোঝাতে যাবেন না। সে যখন নামাজ পড়তে যায় আপনি তাকে উৎসাহিত করবেন, সুযোগ হলে নিজেও তার সাথে নামাজে অংশ নেবেন। কিন্তু আপনি যখন মেডিটেশনে আসবেন তাকে বলবেন না। কারণ যা একজন মানুষ পছন্দ করে না, তাকে সেটা বলার কোনো প্রয়োজন নেই। আপনি তো তাকে মেডিটেশন করানোর দায়িত্ব নেন নি। তবে তার সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখবেন। মেডিটেশন নিয়ে তার সাথে কোনো বিতর্কে যাবেন না। কারণ মেডিটেশন বোঝার মতো মানসিক অবস্থা তার এখনো আসে নি।

আর সবসময় একজন মানুষের সাথে কথা বলবেন তার চেতনার স্তর বুঝে। সে যেহেতু আপনার বন্ধু, অপেক্ষা করুন। যেহেতু সে মেডিটেশন করে না, মনের ওপরে তার কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই। তাই তার সমস্যা হওয়া স্বাভাবিক। যখন সমস্যা আসবে তখন সে আপনার পরামর্শ গ্রহণ করবে। তার আগ পর্যন্ত সুসম্পর্ক বজায় রাখবেন।

কেউ মেডিটেশন পছন্দ না করলে তার সাথে ঝগড়া করতে যাবেন না। তাকে বিনয়ের সাথে বলবেন, ঠিক আছে, তুমি যা করছ খুব ভালো করছ। যেহেতু এটা করে আমার ভালো লাগে আমি করি। অতএব তোমার আমার সম্পর্কের মধ্যে এটাকে টেনে আনার দরকার নেই। তাহলেই আজ কাল পরশু একসময় তাকে আপনি উদ্ধুদ্ধ করতে পারবেন।

এ মাসের অটোসাজেশন

আমার চেতনার সাথে আমি, আমার কাজ-সবই হয়ে যাবে একাকার।

আমার কাজের অভিনবত্ব সবাইকে বিস্মিত করবে।

স্বাধীনতা দিবসে বনশ্রীতে স্বেচ্ছা ব্লাড ক্যাম্প



২৬ মার্চ দক্ষিণ বনশ্রী গুট মালিক কল্যাণ সমিতির উদ্যোগে কোয়ান্টাম স্বেচ্ছা রক্তদান কার্যক্রমের সহযোগিতায় অনুষ্ঠিত হলো দিনব্যাপী ব্লাড ক্যাম্প। প্রধান অতিথি হিসেবে ছিলেন সমিতির সভাপতি জনাব এ. কে. মুখা। তিনি ব্লাডক্যাম্পটি উদ্বোধন

করেন এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে ছিলেন সমিতির সাধারণ সম্পাদক দৌলত হোসেন।

দক্ষিণ বনশ্রী গুট মালিক কল্যাণ সমিতির নিজস্ব অফিসে সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয় এ ক্যাম্প। ৫৩ জন রক্তদাতা এ ক্যাম্পে স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন। রক্তদাতাদের অধিকাংশের জন্যেই এটা ছিল প্রথমবারের মতো রক্তদান। তাদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে আনন্দমুখর একটি আয়োজনে পরিণত হয় এই ব্লাড

ক্যাম্প। এছাড়াও রক্তদানের বিষয়ে জানতে এখানে আসেন নানা শ্রেণি-পেশার আগ্রহী মানুষ।

সফল এ আয়োজনের নেপথ্যে ছিল দক্ষিণ বনশ্রী সেল এবং সার্বিক সহযোগিতা করে কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন বনশ্রী কার্যালয়।

মহাজাগতিক সফরে
বিশিষ্ট সংবাদ উপস্থাপক
শাজাহান খন্দকার সাজু

বাংলাদেশ টেলিভিশনের বিশিষ্ট সংবাদ উপস্থাপক কোয়ান্টাম গ্রাজুয়েট শাজাহান খন্দকার সাজু ১৯ মার্চ ভোর ৫টা হাট-অ্যাটাকে আক্রান্ত হয়ে চিকিৎসাধীন অবস্থায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ইন্তেকাল করেন। (ইন্টালিয়াহি... রাজিউন)। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৫১ বছর।

শাজাহান খন্দকার আশির দশক থেকে বাংলাদেশ বেতারে এবং ১৯৯৭ সাল থেকে বিটিভিতে সংবাদ উপস্থাপক এবং ধারাভাষ্যকার হিসেবে কাজ করেছেন। বিভিন্ন সময় কণ্ঠ দিয়েছেন বিজ্ঞাপনে। বিটিভিতে প্রচারিত আজানের দোয়ার (হে আল্লাহ! এই পরিপূর্ণ আহ্বান এবং নামাজের তুমিই প্রভু! হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে দান করো বেহেশতের সর্বোচ্চ সম্মানিত স্থান ও সুমহান মর্যাদা.....) এ অসাধারণ কণ্ঠটি এই গুলী বাকশিল্পী।

শাজাহান খন্দকার ২০১৪ সালে অনুষ্ঠিত কোয়ান্টাম মেথড কোর্সের ৩৭৫ তম ব্যাচে অংশ নেয়ার পর সম্পূর্ণ ছিলেন কোয়ান্টাম মিডিয়া সেলস ফাউন্ডেশনের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে। সম্প্রতি তিনি কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশনের শৈল্পিক বাচনের ওপর প্রকাশিতব্য একটি ডিভিডি-র ধারাভাষ্যে কণ্ঠ দিয়েছেন। আমরা তার সামগ্রিক অবদানকে কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করি এবং তার আত্মার অনন্ত প্রশান্তি ও কল্যাণ কামনা করি।

আবশ্যিক

কোয়ান্টাম কসমো স্কুল ও কলেজের জন্যে শিক্ষক/শিক্ষিকা/আবাসিক শিক্ষক (ন্যূনতম অনার্স পাশ), বিজ্ঞান বিভাগের জন্যে (পদার্থ বিজ্ঞান, রসায়ন, জীব বিজ্ঞান, উচ্চতর গণিত) শিক্ষক/শিক্ষিকা আবশ্যিক। বিএড ও নিবন্ধনকৃত প্রার্থীরা অগ্রাধিকার পাবেন। শিশুকানন ও শিশুসদনের শিক্ষার্থীদের দেখাশোনার জন্যে ব্রাদার, সিস্টার (ন্যূনতম এসএসসি পাশ) ও সিকিউরিটি গার্ড আবশ্যিক।

এছাড়াও কোয়ান্টাম-এর জন্যে কিছু সংখ্যক মালি, মাঠকর্মী প্রয়োজন। আগ্রহীরা যোগাযোগ করুন:

কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন

৩১/ভি শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদীন সড়ক,
শান্তিনগর, ঢাকা-১২১৭

খুলনায় হৃদরোগ বিষয়ক
বিশেষ সেমিনার ও
পারিবারিক ওয়ার্কশপ

১৭ মার্চ কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন খুলনা শাখায় অনুষ্ঠিত হয় হৃদরোগ নিরাময় ও প্রতিরোধে মেডিটেশনের কার্যকারিতা বিষয়ক একটি বিশেষ সেমিনার। দুই ঘণ্টাব্যাপী এ সেমিনারে ‘হৃদরোগ নিরাময়ে মেডিটেশনের ভূমিকা’ শীর্ষক আলোচনা উপস্থাপন করেন ফরটিস স্কটস হাট ইনস্টিটিউট খুলনার কার্ডিওলজি বিভাগের চিফ কনসাল্ট্যান্ট এন্ড ক্যাথ ল্যাব ডিরেক্টর এবং কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশনের আর্ডেন্টার ডা. হাসনাইন নান্না।

এ অনুষ্ঠানে গ্রাজুয়েট প্রো-মাস্টার এসোসিয়েট মিলিয়ে ১৯৪ জন অংশগ্রহণ করেন। অংশগ্রহণকারীদের দেখানো হয় কোয়ান্টাম হাট ক্লাবের বিশেষ ডকুমেন্টারি ‘এই আমি আর হৃদয় আমার’। এছাড়াও ফাউন্ডেশন চত্বরে দেশি-বিদেশি বিভিন্ন ম্যাগাজিন ও সংবাদপত্রে প্রকাশিত হৃদরোগ নিরাময়ে মেডিটেশনের গুরুত্ব বিষয়ক রিপোর্ট ও আলোকচিত্র প্রদর্শন করা হয়।

২৬ মার্চ খুলনা শাখায় অনুষ্ঠিত হয় আলোকিত পরিবার ওয়ার্কশপ। প্রায় তিন ঘণ্টাব্যাপী এ অনুষ্ঠানে ছিল সুখী পরিবার বিষয়ক আলোচনা ও মেডিটেশন। এছাড়াও ফাউন্ডেশন প্রকাশিত সুখী পরিবার শীর্ষক ডকুমেন্টারি প্রদর্শন করা হয়। এতে আলোচনা করেন অর্গানিয়ার মারুফ ইবনে মাহবুব। অনুষ্ঠানে ৮৭ জন এসোসিয়েটসহ মোট ১৬২ জন অংশ নেন।

চট্টগ্রামে পারিবারিক
ওয়ার্কশপ ও নবীন বরণ

২০ মার্চ কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন চট্টগ্রাম সেন্টারের আয়োজনে নগরীর মুসলিম হলে পারিবারিক ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠিত হয়। ‘বিয়ে ও সংসার পর্ব’ শীর্ষক দিনব্যাপী এ ওয়ার্কশপে আলোচনা করেন অর্গানিয়ার ফয়সাল মাহমুদ এবং ফাউন্ডেশনের মেডিকেল কাউন্সেলর ডা. হাবীব জালাল উদ্দিন আহমেদ।

আলোচনার বিষয় ছিল ‘পারিবারিক সমঝোতার জন্যে করণীয়’ এবং ‘সুখী পরিবার গড়তে কোয়ান্টামের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি’। এতে অংশগ্রহণকারীদের সংখ্যা ছিল চার শতাধিক। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন চট্টগ্রাম সেন্টারের অর্গানিয়ার কো-অর্ডিনেশন মোহাম্মদ সাজ্জাদ হোসেন।

আলোকিত জীবনের বাণী
নিয়ে কোয়ান্টাম সভা

৬ মার্চ আজিমপুর সরকারী কলোনী মাঠে অনুষ্ঠিত হয় একটি কোয়ান্টাম সভা। এতে কলোনী ও পার্শ্ববর্তী এলাকার শতাধিক অধিবাসী অংশ নেন। ১৯ মার্চ কসমো স্কুল এন্ড কলেজ মিরপুরে অনুষ্ঠিত কোয়ান্টাম সভায় অংশ নেন স্কুলের প্রায় ৪০ জন শিক্ষক। ২৮ মার্চ নরসিংদী ন্যাশনাল কলেজ অব এডুকেশন-এ অনুষ্ঠিত কোয়ান্টাম সভায় উপস্থিত ছিলেন কলেজের ১২০ জন শিক্ষার্থী। এ সভাগুলোতে সুস্থ সুন্দর ও সফল জীবনের জন্যে মেডিটেশনের গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা করা হয়। এ তিনটি কোয়ান্টাম সভায় আলোচনা করেন অর্গানিয়ার মারুফ ইবনে মাহবুব।

কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন ধানমন্ডি শাখার উদ্যোগে ন্যাশনাল ব্যাংক, ধানমন্ডি-তে ২৩ মার্চ অনুষ্ঠিত কোয়ান্টাম সভায় অংশ নেন ন্যাশনাল ব্যাংকের ৪০ জন কর্মী। এতে স্ট্রেস ম্যানেজমেন্ট ও সুস্থতায় কোয়ান্টাম মেথডের ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করেন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনা বিভাগের সহকারী অধ্যাপক আর্ডেন্টার মুস্তাকিমুল বারী।



অগ্নিদধ রোগীদের পাশে দাঁড়ান ল্যাবে এসে রক্ত দিন

বার্ন ইউনিটে চিকিৎসাধীন অগ্নিদধ (বার্ন) রোগীদের জরুরি ও দীর্ঘমেয়াদি চিকিৎসার্থে প্রয়োজন হয় রক্তের একটি বিশেষ উপাদান ফ্রেশ ফ্রোজেন প্লাজমা (এফএফপি)। আর গত দেড় দশক ধরে নিরাপদ রক্তের চাহিদা পূরণে অনন্য আস্থা অর্জনের দরুন চিকিৎসকরা এখন প্রথমেই রোগীর স্বজনদের পাঠান কোয়ান্টাম ল্যাবে। ফলে ল্যাবে দিন দিন বেড়ে চলেছে জরুরি রক্তের চাহিদা।

সাম্প্রতিককালে বার্ন ইউনিটে এফএফপি-র চাহিদা বেড়ে যাওয়ায় গুরুজী শহীদ আল বোখারী মহাজাতক ফাউন্ডেশনের সর্বস্তরের সদস্য ও রক্তদাতাদের ল্যাবে এসে রক্ত দেয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। ফাউন্ডেশনের আর্ডেন্টারদের তিনি বিশেষ আহ্বান জানিয়েছেন-নিজেরা ল্যাবে এসে রক্ত দেয়ার পাশাপাশি বন্ধু-আত্মীয়-পরিচিতদের এ কাজে উদ্বুদ্ধ করুন।

উল্লেখ্য, ২০১৪ সালে বার্ন ইউনিটে অগ্নিদধ রোগীদের চিকিৎসায় প্রয়োজনীয় ফ্রেশ ফ্রোজেন প্লাজমা-র একটি বড় অংশ (২০,৮৮৪ ইউনিট) সরবরাহ করেছে কোয়ান্টাম ল্যাব। একই বছর এখন থেকে সরবরাহ করা হয়েছে মোট ৯৭,০১৯ ইউনিট রক্ত ও রক্ত উপাদান।

দুস্থ, বঞ্চিত ও মুমূর্ষু মানুষের কল্যাণে আমাদের সবার এ আন্তরিক প্রচেষ্টাকে পরম করুণাময় কবুল করুন।

কোয়ান্টাম স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রের যাত্রা শুরু

ঢাকার মিরপুরস্থ রূপনগর কার্যালয়ে চালু হয়েছে কোয়ান্টাম স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র। এ কার্যক্রমের আওতায় প্রতিদিন বিশেষায়িত স্বাস্থ্যসেবা ও চিকিৎসা-পরামর্শ দেবেন ফাউন্ডেশনের আর্ডেন্টারদের একদল বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক।

শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের ইউরোলজি বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ও সার্জন ডা. মো. আবুল হোসেনের তত্ত্বাবধানে এ কার্যক্রমটি পরিচালিত হচ্ছে।

পূর্বে নাম তালিকাভুক্ত সাপেক্ষে প্রতিদিন বিকেল ৫টা থেকে সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত কোয়ান্টাম স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র থেকে যে-কেউ এ সেবা পেতে পারেন। বিস্তারিত জানার জন্যে যোগাযোগ করুন : ০১৮৪৮-৩১৮৭৫৩।

উল্লেখ্য, একই স্থানে প্রতিদিন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের তত্ত্বাবধানে খতনা সেবা দেয়া হচ্ছে।

রক্তদাতা সম্মাননা অনুষ্ঠানে প্রফেসর ড. এ কে আজাদ চৌধুরী সব শিক্ষার্থীকে রক্তদানে উদ্বুদ্ধ করতে হবে

৬ মার্চ কোয়ান্টাম স্বেচ্ছা রক্তদান কার্যক্রমের আয়োজনে জাতীয় প্রেস ক্লাব মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হলো ১১ তম গোল্ডেন ডোনার (ন্যূনতম ২৫ বার রক্তদানকারী) ও প্রথম প্লাটিনাম ডোনার (ন্যূনতম ৫০ বার রক্তদানকারী) সম্মাননা প্রদান অনুষ্ঠান। এ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য, বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের মাননীয় চেয়ারম্যান ও বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ প্রফেসর ড. এ কে আজাদ চৌধুরী।

প্রধান অতিথি বলেন, আমাদের সংস্কৃতির উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হলো পারস্পরিক মমতা, আন্তরিকতা এবং সবার মাঝে একটা সুন্দর ঐক্য ও সম্পর্কের ঐক্যতান। কিন্তু নানা কারণে এটি আজ আমাদের সমাজে একটু নিষ্প্রাণ হয়ে গেছে। সে দৃষ্টিকোণ থেকে বলা যায়, কোয়ান্টাম স্বেচ্ছা রক্তদান কার্যক্রম একটি অত্যন্ত প্রশংসনীয় ও শুভ উদ্যোগ। এ মহান উদ্যোগটিকে দেশের সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছড়িয়ে দেয়া প্রয়োজন। সেইসাথে সব শিক্ষার্থীকে রক্তদানে উদ্বুদ্ধ করতে হবে।

ব্যক্তিগতভাবে আমি নিজেও এ প্রতিষ্ঠানের কাছে স্বাগী। বছর কয়েক আগে যখন আমার মা অসুস্থ ছিলেন, তিনি যে-কদিন বেঁচে ছিলেন কোয়ান্টাম ল্যাব থেকে সংগৃহীত রক্ত দিয়েই তাঁকে সুস্থভাবে বাঁচিয়ে রাখা সম্ভব হয়েছিল। আমি জেনেছি, আজকে দেশে যারা রক্তদান নিয়ে কাজ করছেন এবং বিপুল রক্ত সরবরাহ করার জন্যে অক্লান্ত চেষ্টা করে যাচ্ছেন



তাদের মধ্যে কোয়ান্টামের অবস্থান সর্বপ্রথম। এজন্যে আমি কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশনকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ, কৃতজ্ঞতা এবং অভিনন্দন জানাই।

অনুষ্ঠানে কোয়ান্টাম স্বেচ্ছা রক্তদান কার্যক্রমের বিভিন্ন কার্যক্রম তুলে ধরেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের হেমাটোলজি বিভাগের প্রফেসর ও কোয়ান্টাম ল্যাবের অনারারি কনসালটেন্ট বিশিষ্ট রক্তরোগ বিশেষজ্ঞ ডা. এবিএম ইউনুস। এতে সভাপতিত্ব করেন ফাউন্ডেশনের মহাপরিচালক ও রক্তদান কার্যক্রমের প্রধান সমন্বয়ক মাদাম নাহার আল বোখারী।

গোল্ডেন ডোনারদের পাশাপাশি ৫০ বার রক্তদানকারী প্রথম প্লাটিনাম ডোনার জনাব অনির্বণ হককে বিশেষ সম্মাননা জানানো হয়।



সম্মাননাপ্রাপ্ত রক্তদাতাদের একাংশ, অতিথিদের সাথে

কুমিল্লা, গাজীপুর, কক্সবাজার ও রংপুরে কোয়ান্টাম মেথড কোর্স

৩৯১ তম কোর্স ॥ কুমিল্লা

২৪, ২৫, ২৬ ও ২৭ এপ্রিল

(শুক্র, শনি, রবি ও সোমবার)

স্থান : জেলা শিল্পকলা একাডেমী, কুমিল্লা

যোগাযোগ : ০৮১-৬১৩৮৩, ০১৭৪০-৯০৮৩৭৮

৩৯৪ তম কোর্স ॥ কক্সবাজার

২২, ২৩, ২৪ ও ২৫ মে

(শুক্র, শনি, রবি ও সোমবার)

স্থান : হোটেল সী-গাল, কক্সবাজার

যোগাযোগ : ০১৮১৬-২৫২১২৬, ০১৮১৮-১৭৮৫৮৪

৩৯২ তম কোর্স ॥ গাজীপুর

১, ২, ৩ ও ৪ মে

(শুক্র, শনি, রবি ও সোমবার)

স্থান : শহীদ আহসানউল্লাহ মাস্টার অডিটোরিয়াম, ডুয়েট, গাজীপুর

যোগাযোগ : ০১৭৪৩-৯১৩৫১১, ০১৭৯৯-৩৫৫৬৫৫

৩৯৫ তম কোর্স ॥ রংপুর

২৯, ৩০, ৩১ মে ও ১ জুন

(শুক্র, শনি, রবি ও সোমবার)

স্থান : আরডিআরএস, বাংলাদেশ, রংপুর

যোগাযোগ : ০৫২১-৫৫০৯৪, ০১৭১৭-৭১৪৭৬৬

কোয়ান্টাম বুলেটিন : এপ্রিল ২০১৫ ॥ সম্পাদক : কাজী মাহতাব উদ্দিন আহমদ ॥ নাহার আল বোখারী, মহাপরিচালক, কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন কর্তৃক ৩১/৬ শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদীন সড়ক, শান্তিনগর, ঢাকা-১২১৭ থেকে প্রকাশিত ও উইন্ডোজ প্রিন্টিং সেন্টার থেকে মুদ্রিত ॥ শুভেচ্ছা মূল্য - ৫ টাকা
Phone : 9341441, 8319377, 9355756 Mobile : 01714-974333, 01711-671858, 09613-002025 ■ E-mail : bulletin@quantummethod.org.bd

আল কোরআন
বাংলা মর্মবাণী

রমজানের আগেই
পৌঁছে যাক
ঘরে ঘরে

আল কোরআন
বাংলা মর্মবাণী

পবিত্র রমজানকে
সামনে রেখে
মাতৃভাষায়
কোরআন
অনুধাবনের
অনন্য সুযোগকে
চারপাশের
সবার মাঝে
ছড়িয়ে দেয়ার
জন্যে
কোয়ান্টাম
পরিবারের
সবার প্রতি
আহ্বান

জানিয়েছেন গুরুজী শহীদ

আল বোখারী মহাজাতক, যেন আসন্ন
রমজানের শুরু থেকেই পরিচিত
পরিমণ্ডলের সম্ভাব্য প্রতিটি মানুষ ও
পরিবারে পৌঁছে যায় আল কোরআনের
পূর্ণাঙ্গ বাংলা মর্মবাণী। আলোকিত
হোক আরো লক্ষ মানুষ ও পরিবার।

উল্লেখ্য, ২০১৪ সালের পবিত্র
রমজানে কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন প্রকাশ
করেছে আল কোরআনের পূর্ণাঙ্গ বাংলা
মর্মবাণী। প্রকাশের প্রথম দিন থেকেই
ফাউন্ডেশনের সকল পর্যায়ের সদস্য
এবং তাদের আত্মীয়-পরিচিত-
বন্ধুবান্ধবসহ চারপাশের অনেকের
কাছেই পৌঁছে যায় এ মর্মবাণী।

ফলে বরবারে সহজ বাংলায়
কোরআন পড়া, বোঝা এবং স্রষ্টার
নির্দেশনা অনুসরণ করা সহজ হয়েছে
তাদের জন্যে। যিনিই পড়েছেন তিনি
অনুভব করেছেন, জীবনের সব দুঃখ
বঞ্চনা ক্লেশ অতৃপ্তি থেকে মুক্তির
বাস্তব উপায় আর দৈনন্দিন সমস্যার
কার্যকর সমাধান রয়েছে কোরআনের
আয়াতে আয়াতে।

কর্মসূচি মে ২০১৫

বাংলা বাচন পরিশীলন কর্মশালা
৮ ও ৯ মে। বনশ্রী

প্যারেন্টিং প্রোগ্রাম : স্টেপ-১
৮ ও ৯ মে। কাকরাইল

কোয়ান্টাম ব্যায়াম কার্যক্রম
৮ ও ৯ মে। প্রশান্তি হল (পুরুষ)

কোয়ান্টাম বেসিক হার্ডওয়্যার প্রোগ্রাম
৮, ৯, ১০ ও ১১ মে। বনশ্রী

হৃদরোগ প্রতিরোধ ও নিরাময় কার্যক্রম
২৯ ও ৩০ মে। বনশ্রী

কোয়ান্টাম শিক্ষার্থী কার্যক্রম
২৯ ও ৩০ মে। কাকরাইল



কোয়ান্টাম বুলেটিন

মে ২০১৫

বিশেষ আলোচনায় গুরুজী

জীবনে বড় অর্জনের জন্যে ভালো লাগা না-লাগার বৃত্ত ভাঙতে হবে

অধিকাংশ মানুষই নিজেদের অমিত
সম্ভাবনাকে বন্দি করে রাখে তাদের
পছন্দ-অপছন্দ ও ভালো লাগা না-
লাগার বৃত্তে। একজন মানুষের বেড়ে
ওঠা, চিন্তাচেতনা, মূল্যবোধ, অভ্যাস,
সংস্কার, বিদ্যাবুদ্ধি-এ সবকিছুর মধ্য
দিয়ে তার একটি পছন্দ-অপছন্দ ও
ভালো লাগার বোধ গড়ে ওঠে। এটি
হতে পারে কোনো কাজ, কথা, চিন্তা,
আচরণ, বস্তু, ব্যক্তি কিংবা কোনো
বিষয়ের প্রতি। আর এর মধ্যেই
আবর্তিত হতে থাকে তার জীবন।

কিন্তু যখন কোনো কল্যাণকর
কাজ কিংবা সামগ্রিক প্রয়োজনেও
মানুষ এই পছন্দ-অপছন্দ ও ভালো
লাগা না-লাগার বাইরে কিছু করতে
চায় না কিংবা করতে পারে না তখন
সে আসলে একটা বৃত্তের মধ্যে বন্দি
হয়ে পড়ে। একটা ক্ষুদ্র জগতে আটকে
পড়ে। সংকুচিত হয়ে যায় তার
সুবিশাল সম্ভাবনার দিগন্ত। আমাদের
অনন্ত আনন্দ ও মুক্তির পথে সবচেয়ে
বড় বাধা এটাই।

তাই যে-কোনো বড় অর্জনের
জন্যে ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দ ও
ভালো লাগার বাইরে বেরিয়ে এসে
করণীয় কাজে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে।
আর এটি পারলেই মেধা ও মনন
নবরূপে বিকশিত হয়।

১৭ মার্চ ও ২২ এপ্রিল প্রো-
মাস্টারদের নিয়ে অনুষ্ঠিত বিশেষ
কার্যক্রমে একথা বলেন গুরুজী শহীদ
আল বোখারী মহাজাতক।

তিনি বলেন, পছন্দ ও ভালো
লাগার ব্যত্যয় ঘটলে সাধারণভাবে
মানুষ হয় ক্ষোভ বা বিরক্তি প্রকাশ
করে, আর এ দুটোর কোনোটিই করার
সুযোগ না থাকলে সে কাজটি এড়িয়ে
যায়। কিন্তু যে-কোনো কাজ করার

ক্ষেত্রে প্রকৃত মানদণ্ড হলো, শাস্ত্বত
চেতনার আলোকে কাজটি কল্যাণকর
না অকল্যাণকর, গুরুত্ববহ না
গুরুত্বহীন, ভালো না মন্দ, প্রয়োজনীয়
না অপয়োজনীয়।

আর কাজটি কল্যাণকর হলে
কাজের মাঝে মিশে যেতে হবে।
কারণ, যে বীজ মাটির সাথে মিশে
গিয়ে তা থেকে পানি খনিজ এবং
অন্যান্য প্রয়োজনীয় উপাদান গ্রহণ
করতে পারে, তার অঙ্কুরোদগম সুসম
ও পরিপূর্ণ হয়। অন্যদিকে যে বীজ তা
পারে না, সেটির অঙ্কুরোদগম বাধাপ্রাপ্ত
হয় এবং শেষপর্যন্ত তা আর পরিপুষ্ট
কোনো বৃক্ষে পরিণত হতে পারে না।

তাই মেধার সর্বোত্তম বিকাশ ও
অনন্ত মুক্তির জন্যে ভাঙতে হবে
নিজেদের পছন্দ-অপছন্দ ও ভালো
লাগা না-লাগার এ ক্ষতিকর বৃত্ত।
তাহলেই আমরা লাভ করব সত্যিকার
স্বাধীনতা, অফুরন্ত কল্যাণ এবং
স্বতঃস্ফূর্তভাবে এগিয়ে যেতে পারব
যে-কোনো বড় অর্জনের দিকে।

গুরুজী আরো বলেন, আমাদের
পরবর্তী প্রজন্মের মধ্যেও এ বৃত্ত ভাঙার
সাহস অর্জন করার শক্তি সঞ্চারিত
করতে হবে। এজন্যে জীবনের শুরু
থেকেই আমাদের সন্তানদেরকে
পরিশ্রমনির্ভর জীবনাচারে অভ্যস্ত করে
তুলতে হবে। শৈশব থেকেই যেন ওরা
ভালো লাগা ও পছন্দ-অপছন্দের ক্ষুদ্র
গণ্ডিতে আটকে না থাকে, পূর্ণ উদ্যম ও
শক্তি নিয়ে যেন নিজেদের করণীয়
কাজে আত্মনিবেশ করতে পারে।
বেরিয়ে আসতে পারে আরামবলয়
থেকে। এভাবে সবার মাঝে এমন
কর্মোদ্যম সৃষ্টি হলেই জাতি হিসেবে
আমরা একটি সমৃদ্ধ অবস্থানে
পৌঁছতে পারব।

এ এক অসাধারণ
অভিজ্ঞতা!
কবি নাসির আহমেদ



জীবনের শুরু থেকেই আমি একজন
আত্মপ্রত্যায়া এবং আত্মবিশ্বাসী মানুষ।
কিন্তু বেশ কিছু বছর ধরে নানারকম
শারীরিক অসুস্থতা মানসিকভাবে
আমাকে দুর্বল করে দেয়। কোয়ান্টাম
মেথড কোর্সে এসে আমি আমার মনের
সেই হারানো শক্তিটা আবার ফিরে
পেলাম। এ এক অসাধারণ অভিজ্ঞতা!

স্পন্ডিলাইটিস, লিভার সিরোসিস
এবং পর পর তিন বার হার্ট অ্যাটাকের
পরও আমি আমার কাজ চালিয়ে
যাচ্ছিলাম। কিন্তু ঘুম হতো না, ডান
হাতটা ওপরে তুলতে পারতাম না
ইত্যাদি কিছু অসুবিধা ছিল। এখন হাত
ওপরে তুলতে পারছি। আর প্রথমদিন
থেকেই বেশ ভালো ঘুম হচ্ছে। আর
এতদিন নামাজ পড়তাম চেয়ারে বসে,
এখন সেজদা দিয়ে নামাজ পড়ছি!

কোয়ান্টাম মেথড কোর্সের মধ্য
দিয়ে গুরুজী মানুষকে আত্মপ্রত্যায়া ও
জাগিয়ে তোলার কাজ করছেন। তার
এ শিক্ষাকে কাজে লাগিয়ে দেশের ১৭
কোটি মানুষকে মানবসম্পদে রূপান্তর
করা সম্ভব।

বাংলা একাডেমি পুরস্কারে ভূষিত বিশিষ্ট
কবি, গীতিকার ও সৃজনশীল লেখক এবং
বিটিভি-৯ ডিরেক্টর-নিউজ জনাব নাসির
আহমেদ কোয়ান্টাম মেথড কোর্সের ৩৯০
ব্যাচের প্রত্যয়ে একথা বলেন।

ঢাকা, কক্সবাজার ও রংপুরে
কোয়ান্টাম মেথড কোর্স

৩৯৩ তম ব্যাচ ৯ ঢাকা

১৫, ১৬, ১৭ ও ১৮ মে

(শুক্র, শনি, রবি ও সোমবার)

স্থান : ইনস্টিটিউশন অব ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্স
বাংলাদেশ (আইডিইবি), কাকরাইল, ঢাকা

৩৯৪ তম ব্যাচ ৯

কক্সবাজার

২২, ২৩, ২৪ ও ২৫ মে

(শুক্র, শনি, রবি ও সোমবার)

স্থান : হোটেল সী-গাল, কক্সবাজার

৩৯৫ তম ব্যাচ ৯ রংপুর

২৯, ৩০, ৩১ মে ও ১ জুন

(শুক্র, শনি, রবি ও সোমবার)

স্থান : আরডিআরএস, বাংলাদেশ, রংপুর

গলফার সিদ্ধিকুর রহমান। গলফের বিশ্ব আসরে নিজেকে এবং সেইসাথে নিজের দেশকে এক অনন্য উচ্চতায় নিয়ে গেছেন তিনি। বাংলাদেশ থেকে একমাত্র খেলোয়াড় হিসেবে তিনিই প্রথম অংশ নিয়েছেন এশিয়ান গলফ ট্যুর ও গলফ বিশ্বকাপে। দেশে এবং আন্তর্জাতিক অঙ্গনে খ্যাতিমান এই গলফার সম্প্রতি কোয়ান্টাম মেথড কোর্সের ৩৮৭ ব্যাচে অংশ নেন। কোয়ান্টাম বুলেটিনের সাথে একান্ত সাক্ষাৎকারে তিনি শুনিয়েছেন তার শূন্য থেকে শিখর জয়ের গল্প এবং কোয়ান্টাম মেথড কোর্সের অনুভূতি।

এ আত্মবিশ্বাস আমাকে বহুদূর এগিয়ে নেবে

সিদ্ধিকুর রহমান



আমরা তখন থাকতাম ঢাকার অদূরে ধামালকোট। নিত্য অভাবের সংসার। স্কুল থেকে ফিরে অধিকাংশ দিনই দেখতাম ঘরে কোনো খাবার নেই। একে তো এই অবস্থা, তার ওপর বাবার দিনরাত একটাই দুশ্চিন্তা—এলাকাটা তখন সম্ভ্রাস আর মাদকের জন্যে কুখ্যাত, কুসঙ্গে পড়ে আবার বখে না যাই!

একদিন পাশের বাড়ির একটি ছেলে এসে আমাকে ডেকে নিয়ে যায় কুমিটোলার সেনাবাহিনী গলফ ক্লাবে। জানা গেল, ওখানে ‘বল বয়’ হিসেবে কাজ করলে কিছু উপার্জন হতে পারে। সেনাবাহিনীর অফিসার আর শৌখিন গলফাররা খেলতেন ওখানে। দূরদূরান্ত থেকে বল কুড়িয়ে ৩০ টাকার মতো পাওয়া যেত দিনে। ওটা দিয়ে নিজের পড়াশোনার খরচ চালানোর পাশাপাশি পরিবারকেও সাধ্যমতো সহযোগিতা করার চেষ্টা করতাম। আমার বয়স তখন আট বছর। পড়ি ক্লাস টু-তে।

তখন ভাবতাম আরেকটু বড় হলে ‘ক্যাডি’ (খেলোয়াড়দের গলফ স্টিক এবং অন্যান্য সরঞ্জাম বহনকারী) হতে পারব, উপার্জন কিছুটা বাড়বে। কিন্তু কাজটা খুব সহজ ছিল না, ১৮/২০ কেজি ওজনের একেকটা ব্যাগ নিয়ে খেলোয়াড়দের সাথে গলফ মাঠে হেঁটে বেড়ানো বেশ পরিশ্রমসাধ্য ব্যাপার।

এর পাশাপাশি অবসরে নিজেও মাঝেমধ্যে গলফ খেলতাম। আনন্দের জন্যেই খেলতাম। এভাবেই খেলাটা একসময় খুব ভালো লেগে গেল। কিন্তু গলফ খেলতে যে টাকা লাগে অনেক! দামি জুতা আর গলফ স্টিক কিনে দেয়ার সামর্থ্য তো আমার বাবার নেই।

কী করা যায় ভাবতে ভাবতে একটা বুদ্ধি এলো। লোহালকড় বালাইয়ের দোকানে গিয়ে লোহার রড দিয়ে কোনোরকম একটা স্টিক তৈরি করলাম, তা দিয়েই শুরু হলো আমার গলফ প্র্যাকটিস।

১৯৯৯ সালে একটি সুযোগ আসে আমাদের জন্যে। তৎকালীন সেনাপ্রধান ও গলফ ফেডারেশনের কর্মকর্তাদের উদ্যোগে সুবিধাবঞ্চিত পরিবারগুলো থেকে আসা বল বয়-ক্যাডীদের নিয়ে একটি গলফ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। একশ জনের মধ্যে তাতে প্রথম হই আমি।

এভাবেই শুরু। এর পর জাতীয় দলে সুযোগ পাই। মন-প্রাণ দিয়ে অনুশীলন শুরু করি। অনেকে ভেবেছিল, আমি খুব বেশিদূর যেতে পারব না, আমি আকারে ছোট এবং শারীরিক শক্তিও তুলনায় অন্যদের চেয়ে কম। কিন্তু অনুশীলনে আমার একাত্মতা দেখে কোচ বাবু আহমেদ স্যার বিশ্বাস করতেন, ভালো করলে আমার পক্ষেই সম্ভব। অনুশীলন শুরু হতো সকাল আটটায়।

কেউ আসত সকাল ন-টায়, কেউ-বা দশটায় কিংবা তারও পরে। আমি মাঠে গিয়ে উপস্থিত হতাম সকাল সাড়ে সাতটায়।

কঠোর অনুশীলনের পথ ধরে একসময় দেখা মেলে আরো বড় সাফল্যের। পরবর্তী সাত বছরে দেশে ও বিদেশে অপেশাদার গলফের একে একে ১২টি টুর্নামেন্টে চ্যাম্পিয়ন এবং ১৮টি-তে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করি। ২০০৯ সালে পেশাদার গলফের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ আসর এশিয়ান ট্যুরে কোয়ালিফাই করি। বাংলাদেশ থেকে আমিই প্রথম এ সুযোগ পাই।

পরের বছর অর্থাৎ ২০১০ সালে ক্রেনেই ওপেন-এ অংশ নিই এবং ২০টিরও বেশি দেশের খেলোয়াড়দের সাথে প্রতিযোগিতা করে চ্যাম্পিয়ন হই। ওটা ছিল আমার টার্নিং পয়েন্ট। আর এর মধ্য দিয়ে বিশ্ব গলফ আসরে সম্মানজনক একটি অবস্থান লাভ করে বাংলাদেশ। পরবর্তীতে গলফের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ আসর ২০১৩ সালে ভারতে অনুষ্ঠিত ‘হিরো ইন্ডিয়া ওপেন’ চ্যাম্পিয়ন হই।

তারও আগে থেকেই আমার একটাই স্বপ্ন—একদিন বিশ্বকাপে যাব। টাইগার উডস-সহ বিশ্বসেরা গলফারদের সাথে খেলব। তখন বিশ্বকাপে সুযোগ পাওয়া যেত দলগত পারফরমেন্স-এর ভিত্তিতে। আমার নিজের তা ছিল, কিন্তু দলগত নৈপুণ্যের অভাবে সুযোগটা হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছিল বার বার।

২০১৩ সালে এসে নিয়মটা পাল্টে গেল—একজন খেলোয়াড়ের নিজস্ব পয়েন্টের ভিত্তিতে বিশ্বকাপে অংশ নেয়া যাবে। নতুন নিয়ম অনুযায়ী আমার সুযোগ ঘটে গেল। বাংলাদেশ থেকে প্রথমবারের মতো আমি গলফ বিশ্বকাপে অংশ নিই।

আসলে জীবনের যে-কোনো ক্ষেত্রে সাফল্যের জন্যে লক্ষ্যটা নিজের কাছে সুস্পষ্ট থাকতে হবে। এবং এ চাওয়াটা হতে হবে সৎ। অধিকাংশ মানুষকেই দেখি, তার লক্ষ্যটা নিজের কাছেই স্পষ্ট নয়। প্র্যাকটিস করছে তো করছেই, কী করছে বা কেন করছে তা সে নিজেও হয়তো জানে না।

এছাড়াও সব কাজেরই একটা ব্যাকরণ আছে, মৌলিক কিছু নিয়ম আছে। গলফের ক্ষেত্রেও আমি এখনো সেটিই আয়ত্ত করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। আর এ ক্রমাগত চেষ্টার সাথে চাই একাত্ম মনোযোগে নিজের কাজটি করে যাওয়া।

আশ্চর্য মনে হলেও সত্যি, গত ১৮ বছরে আমি দেশে কিংবা বিদেশে কোথাও বেড়াতে যাই নি। দেশে থাকলে বাসা থেকে গলফ কোর্ট আর গলফ কোর্ট থেকে বাসা। আর দেশের বাইরে খেলতে গেলে হোটেল থেকে গলফ কোর্ট, আবার গলফ কোর্ট থেকে হোটেল। এভাবেই আমি দিনের পর দিন ১২/১৪ ঘণ্টা করে প্র্যাকটিস চালিয়ে গেছি। আমার সারা চেননা জুড়ে ছিল শুধু গলফ। ঘুম-জাগরণে সবসময়ই গলফ নিয়েই ছিল আমার সমস্ত চিন্তাভাবনা।

আমার সাফল্যের পথটা যে একেবারে নিশ্চল ছিল, তা কিন্তু নয়। ক্রেনেই ওপেনের আগের সময়টাতে আমার গলফ ক্যারিয়ার শেষ হয়ে যেতে বসেছিল প্রায়। এশিয়ান ট্যুরে অংশ নিতে গিয়ে এর আগের দু-বছরে আমার প্রায় ৪০ লক্ষ টাকা খরচ হয়ে যায়। সমস্ত জমানো টাকা তখন শেষ। দেয়ালে পিঠ ঠেকে গিয়েছিল। মনে হচ্ছিল এভাবে আর চলতে পারে না।

তখন সিদ্ধান্ত নিলাম, আমাকে জেতার জন্যে খেলতে হবে। গলফে টিকে থাকতে হলে এবার সামনে যাওয়া ছাড়া আর পথ নেই। যেই ভাবা সেই কাজ। রক্ষণাত্মক ভঙ্গি পাল্টে আক্রমণাত্মক খেলতে শুরু করলাম। গতি বেড়ে গেল। এর পরের ইতিহাস তো সবার জানা। আমি শিরোপা জিতলাম সে টুর্নামেন্টে। আত্মবিশ্বাসও বেড়ে গেল বহুগুণ।

সেই আত্মবিশ্বাসটাই আবার নতুন করে ফিরে পেলাম কোয়ান্টাম মেথড কোর্সে এসে। গত বছর ভারতে অনুষ্ঠিত একটা টুর্নামেন্টে আমার পারফরমেন্স খুব একটা ভালো হয় নি। ঘুরেফিরে শুধু মনে হচ্ছিল, এটা একটা দুর্ভাগ্য। কোর্সে গুরুজীর কথা শুনে ও মেডিটেশন করে আমার দৃষ্টিভঙ্গিটা বদলে গেছে। এখন মনে হচ্ছে, ওটা ছিল আমার জন্যে একটা শিক্ষা। ইতিবাচকভাবে ভাবতে পারছি পুরো বিষয়টা। এটা সত্যিই একটা বড় অর্জন আমার জন্যে।

এছাড়াও সম্প্রতি একটা ইনজুরির শিকার হয়েছি। অনেক চিকিৎসা আর ফিজিওথেরাপি নিয়েছি, তবু ব্যাকপেইনের জন্যে এক ঘণ্টার বেশি বসে থাকতে পারতাম না। কিন্তু কোর্সে এসে প্রতিদিন ১০ ঘণ্টা ধরে বসে ছিলাম, কোনো সমস্যা হয় নি। বরং ব্যাথাটাই এখন আর অনুভব করছি না।

সবমিলিয়ে নিজেকে ভাগ্যবান মনে করছি যে, আমি কোয়ান্টামে আসতে পেরেছি। গুরুজীর প্রতিটি কথায় আমি আমার ভ্রান্তিটা অনুভব করেছি। উপভোগ করেছি কোর্সের প্রতিটি মুহূর্ত। বিশ্বাস করি, এ শক্তি ও আত্মবিশ্বাস আমাকে আরো বহুদূর এগিয়ে যেতে সাহায্য করবে।

সাক্ষাৎকার গ্রহণ ও অনুলিখন : ডা. আতাউর রহমান

গুরুজীকে লেখা চিঠি

শ্রদ্ধেয় গুরুজী,
আসসালামু আলাইকুম।
আশা করি আপনি ভালো
আছেন। আমিও বেশ
ভালো আছি। জীবনের
৩০টা বছর পার করার
পর কীভাবে হঠাৎ আমার
জীবনের মোড় ঘুরে
গেল, আজ সেই গল্প
লিখছি আপনাকে।



কোর্সের প্রথম দিন যখন
আপনি স্টেজ-এ দাঁড়ালেন, আমি ভাবলাম একজন
মানুষই কি চারদিন ধরে ক্লাস নেবেন? একাই? ১৫-
২০ মিনিট পর মনে হলো, আল্লাহ আমাকে ভীষণ
ভালবাসেন বলেই এখানে এনেছেন। নিশ্চয়ই আমার
মতো দিগভ্রান্ত পথিককে তিনি সঠিক পথ দেখাবেন।

গুরুজী, কোয়ান্টামে এসে আমার শ্রেষ্ঠ অর্জন
হলো আল্লাহর ওপর পূর্ণ বিশ্বাস ও আস্থা স্থাপন।
বিশ্বাস করলেই যে সবকিছু অর্জন করা যায়—এখানে
আসার আগে এই বিশ্বাসটাই আমার মধ্যে ছিল না।
নেতিবাচকতার জালে কখন যে প্রাণচাঞ্চল্য হারিয়ে
ফেলেছিলাম! জীবিত থেকেও যেন মৃত ছিলাম আমি।

তবে হাঁ, এই সঠিক পথের সন্ধান পাওয়ার পর
যতভাবে সম্ভব আমি লেগে থেকেছি। ২০১৪ সালের
নভেম্বরে কোর্স করার পর আপনার সান্নিধ্যে থাকার
কোনো সুযোগই ছাড়ি নি আমি—কোর্স রিপিট, লামা
কোয়ান্টায়ন, প্রথমায়ন, হিলিং ও সাইকি, ব্যায়াম,

প্রজ্ঞা জালালিসহ সব প্রোগ্রামে অংশ নিয়েছি।
সাদাকায়ন ও সাপ্তাহিক হিলিংয়ে নিয়মিত গিয়েছি,
কোয়ান্টায়ার হিসেবে কিছু কাজও করেছি।

গুরুজী, এই যে সামান্য দিয়েছি সেই তুলনায়
প্রাপ্তি কতখানি তা বলে শেষ করতে পারব না।

আমি পড়ালেখায় বেশ ভালো হওয়া সত্ত্বেও
পারিপার্শ্বিক নানা সংকটের কারণে ভীষণ হীনমন্যতা,
অনিরাপত্তা আর দ্বিধাদ্বন্দ্বে ভুগতাম। কিন্তু কোর্স
করার পর মাত্র ছয় মাসের মধ্যেই নিজের মধ্যে
অভূতপূর্ব পরিবর্তন লক্ষ্য করছি। নিয়মিত
মেডিটেশনের ফলে আমি এখন একজন সাহসী,
আত্মপ্রত্যাশী ও বিনয়ী মানুষ। প্রতিদিনই নিজের
অন্তর্গত শক্তিকে অনুভব করে বিস্মিত ও মুগ্ধ হচ্ছি।

আমার আরেকটি বড় প্রাপ্তি হলো ইউএসএ-তে
মাস্টার্স প্রোগ্রামে স্কলারশিপ পাওয়া। বুয়েট থেকে
পাশ করার পর রেজাল্ট ভালো থাকা সত্ত্বেও গত
তিন-চার বছর ধরে বাইরের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো থেকে
ফান্ডিং পাচ্ছিলাম না। অবশেষে নিয়মিত মেডিটেশন
এবং সংক্ষেপে একাত্ম থাকার মধ্য দিয়ে আমেরিকার
টেন্সাস-এর অন্যতম বিদ্যাপীঠ টেন্সাস এএন্ডএম
ইউনিভার্সিটি-তে স্কলারশিপ নিয়ে আরবান প্ল্যানিং
বিষয়ে পড়তে যাওয়ার সুযোগ পেলাম। এই নিয়তে
ছয় মাস ধরে নিয়মিত সদকা হিলিংয়ে নাম দিয়েছি,
এককালীন দানেও সাধ্যমতো শরিক হয়েছি।
আল্লাহকে শুকরিয়া জানাই, সেইসাথে আপনাকে ও
মা-জীকে জানাই অশেষ কৃতজ্ঞতা।

ভানুজী ভাস্কর, ৩৭৬ ব্যাচের গ্রাজুয়েট

শ্রদ্ধেয় গুরুজী,
আসসালামু আলাইকুম।
মোহাম্মদপুর শাখার একজন
প্রো-মাস্টার বোন ফাতেমা
নাজনীর হয়ে আপনাকে
লিখছি। তিনি ও তার স্বামী
তরুণ পুণ্ড্রিপাঠক কাব্য
কামরুল গত ২৩ মার্চ রাতে
ইতালির রোম শহরে
পৌঁছান। তাদের মূল গন্তব্য
প্যারিস। সেখানে তারা
কর্মস্থলে যোগ দেবেন।
রোম এয়ারপোর্টে পৌঁছানোর
পর তারা বন্ধুর গাড়ির জন্যে
অপেক্ষা করছিলেন।



দুর্ঘটনায় দুমড়ে-মুচড়ে যাওয়া গাড়ি

অপেক্ষা করার এ সময়টুকুতে ফাতেমা আপা ৪০ বার
আয়াতুল কুরসি পড়েন। একসময় গাড়ি এলো। তিনি
গাড়ির পেছনের অংশে বাম দিকে উঠতে নিয়েও কেন
যেন ডানদিকে উঠে বসেন। গাড়ির ইঞ্জিন কিছুটা
সমস্যা করছিল, নিরাপদ যাত্রার আশায় তারা
কোয়ান্টা ভঙ্গি করে বসে ছিলেন। গাড়ি ঘণ্টায় ১২০
কি.মি. বেগে চলছিল। হঠাৎ অনেক বেশি গতির
একটা কাভার্ড ভ্যান তাদের গাড়িকে পেছন থেকে
আঘাত করে। গাড়ির বামদিক পুরো দুমড়ে-মুচড়ে
যায় (যেদিকে আপার বসার কথা ছিল)। গাড়ি
নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ছিটকে অনেক দূরে চলে যায়।

লোকজন এসে গাড়ি কেটে তাদের বের করে।
কামরুল ভাই এবং তার বন্ধু তেমন কোনো আঘাত
পেয়েছেন। হাইওয়ে পুলিশ তাদের হাসপাতালে নিয়ে
যায় এবং প্রাথমিক চিকিৎসার পর দ্রুত ছেড়েও দেয়।
গাড়িটা ক্রেন দিয়ে টেনে তুলে তাদের লাগেজ বের
করা হয়। সেখানে দুটো ল্যাপটপ ছিল, একটা সম্পূর্ণ

অক্ষত, আরেকটি ল্যাপটপের ব্যাগটি শুধু ক্ষতিগ্রস্ত
হয়েছে। আপার ব্যাগের লক জ্যাম হয়ে যাওয়া ছাড়া
কোনো ক্ষতি হয় নি। তবে ভাইয়ার ব্যাগে মূল
আঘাত লাগে। এই ব্যাগে আল কোরআনের বাংলা
মর্মবাণী ছিল, ব্যাগ খুলে দেখা যায় শ্যাম্পুর
বোতলটাই শুধু ফেটেছে, আর কিছুই হয় নি।

পুলিশসহ কাভার্ড ভ্যানের ড্রাইভার এবং এগিয়ে
আসা পথচারীরা সবাই হতভম্ব যে, এত বড় দুর্ঘটনার
পরও তারা কীভাবে বেঁচে আছেন? এমনকি সব
জিনিসও অক্ষত!

গুরুজী, এই ঘটনা শুনে আমরাও খুব বিস্মিত
হয়েছি এবং নতুন করে অনুভব করলাম যে,
সৎকর্মের সাথে থাকার কারণে আমরা সবসময়
আল্লাহর রহমতের ছায়ায় আছি। ফাতেমা আপা ও
কামরুল ভাই আপনার, শ্রদ্ধেয়া মা-জীর এবং
কোয়ান্টাম পরিবারের সবার দোয়া চেয়েছেন।

তানজীক্কামান খান

১৭ ব্যাচের প্রো-মাস্টার

কোয়ান্টাম কণিকা

শোকরগোজার হোন। আপনাকে কী দেয়া হয়েছে
তা নিয়ে ভাবুন। তাহলেই দেখবেন কী
পান নি বা কী নেই তা নিয়ে দুঃখ করার
সময় আপনার থাকবে না।

নিজে দানের পাশাপাশি অন্যকেও দান
ও সেবায় উৎসাহিত করুন।

শুরু হতে পারে ক্ষুদ্র দান দিয়ে। সৎ নিয়তে
ছোট অঙ্কের দানও বড় দান হিসেবে
গণ্য হতে পারে স্রষ্টার কাছে।

সচ্ছলতা ও অভাব-সর্বাবস্থায় সামর্থ্য অনুসারে
দান করুন। দানের ধর্মীয় নির্দেশ
ধনী-গরিব সবার জন্যেই।

দানের অর্থ কোথায়-কীভাবে ব্যয় হচ্ছে তার
খোঁজ নিন। দানের বরকত নির্ভর করে
সে অর্থের সদ্ব্যবহারের ওপর।

নিজের পছন্দনীয় ভালো জিনিস থেকে
শুধু স্রষ্টার সন্তুষ্টির জন্যে দান করুন।

যেটুকু আছে তা থেকেই দান করুন।
অল্প হোক কিন্তু নিয়মিত দিন।

দান বা সেবা করে খোঁটা দেবেন না।
'আমি এতকিছু করেছি ...' বলে উপকারের
তালিকা তুলে ধরবেন না।

দিনে বা রাতে, প্রকাশ্যে বা গোপনে, সচ্ছল
বা অসচ্ছল অবস্থায় নিয়মিত দান স্রষ্টার
রহমত আনে। তাই প্রশান্তি প্রার্থ্য ও
সমস্যামুক্তির জন্যে দান করুন।

আজ পর্যন্ত কোনো ভিক্ষুক দাতা বা
স্বাবলম্বী হতে পারে নি। যে হাত নিতে অভ্যস্ত
সে হাত কখনো দিতে পারে না।

আপনি এখনো বেঁচে আছেন, এটিই অনেক
বড় পাওয়া। তাই দিন শুরু করুন 'শোকর
আলহামদুলিল্লাহ/ থ্যাংকস গড/ হরি ওম বা প্রভ
ধন্যবাদ, বেশ ভালো আছি' বলে।

মামলার ঝামেলা মিটে গেল

আমার নামে দুটো মামলা দীর্ঘদিন ধরে চলছিল। কোনোভাবেই মীমাংসা করতে পারছিলাম না। এ থেকে মুক্তির জন্যে লামা কোয়ান্টায়নে গিয়ে সদকা হিলিংয়ে নাম দিলাম। ফিরে এসে মামলার বাদীকে ফোন করলাম দেখা করার জন্যে। তিনি সহজেই রাজি হলেন।

দেখা হলে তাকে বললাম, এভাবে আর কতদিন কষ্ট দেবেন? তিনি সাথে সাথে কেঁদে ফেললেন এবং বললেন, তিনি মামলা করতে চান নি, অন্যদের প্ররোচনায় করেছেন।

আরো বললেন, আজ এখানেই মামলা শেষ, আগামী তারিখে মামলা তুলে নেব। আমার অন্য মামলাটিও পরের তারিখে বাদী কোর্টে না আসায় উকিল নিজেই ডিসমিস করে দিলেন।

[মিজানুর রহমান মিলন, ব্যবসায়ী]

আমার বোন এখন

সুস্থ ও কর্মব্যস্ত

আমার বড় বোন দীর্ঘদিন খুবই অসুস্থ ছিলেন। তিনি হাড়ের টিবি-তে আক্রান্ত ছিলেন। ডাক্তাররা সবসময় বলেছেন, এই অসুখ সহজে নিরাময়যোগ্য নয়। আমরা নিয়মিত সদকা হিলিংয়ে নাম দিয়েছি।

বর্তমানে আমার বোন অনেক সুস্থ এবং আগে যে স্কুলে শিক্ষকতা করত, এখন আবার সেখানে যোগ দিয়েছে। এছাড়া বাসাতেও নিজের উৎসাহেই ছাত্রদের পড়াচ্ছে। তার সুস্থতা আর কর্মব্যস্ততা দেখে আমরা আল্লাহর কাছে সবসময় শুকরিয়া করি।

[ওয়াসিম মো. আদনানুল হক, শিক্ষার্থী]

সহজেই পুঁতি বেরিয়ে এলো

একটা ছোট্ট পুঁতি (স্টোন) নিয়ে খেলতে খেলতে আমার আড়াই বছরের মেয়ে ওটা নাকে ঢুকিয়ে দেয়। এরপর খুব কান্না শুরু করে, কারণ নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছিল। আমরা সবাই খুব ঘাবড়ে যাই।

এরপর মেয়ের জন্যে সদকা হিলিংয়ে নাম দিলাম এবং মাটির ব্যাংকে দান করলাম। বাচ্চা ঘুমানোর পর তার বাবা নাকের ভেতরটা ভালো করে দেখলেন। পুঁতিটা কাছেই দেখা যাচ্ছিল। একটা গুণা-তার দিয়ে তিনি আস্তে করে টান দিলেন এবং পুঁতিটা খুব সহজেই বেরিয়ে এলো।

[ইশরাত জাহান মিতু, গৃহিণী]

আমরা বাবা-মা হলাম!

বিয়ের ১০ বছর পেরিয়ে গেছে, আমাদের সন্তান হচ্ছিল না। চিকিৎসকরা একপর্যায়ে আমাদেরকে উৎসাহিত করলেন টেস্টটিউব বেবি নেয়ার জন্যে। কিন্তু আমাদের কারোই এতে মন সায় দিচ্ছিল না। এরপর আমরা নিয়মিত সদকা হিলিং দিতে শুরু করলাম। একসময় আল্লাহ তায়াল্লা অসম্ভবকে সম্ভব করলেন, আমরা একটি ফুটফুটে পুত্রসন্তানের মা-বাবা হতে পারলাম।

[সরদার ফেরদৌস আহমেদ, ব্যবসায়ী]

স্কলারশিপ পেলাম

ইউএসএ-র রাইটস্টেট বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার ভর্তি ভালোভাবে সম্পন্ন হওয়া সত্ত্বেও স্কলারশিপ আসতে দেরি হচ্ছিল। এদিকে ক্লাস নির্দিষ্ট সময়ে শুরু হয়ে যাবে। বেশ অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়ে যাই। এরপর হিলিংয়ে নাম দেই। যেদিন নাম দেই সেদিনই আমার স্কলারশিপের ই-মেইল আসে। প্রষ্টিকে ধন্যবাদ।

[ঋতু চৈতী ঘোষ, শিক্ষার্থী]

আমি এখন ওষুধ ছাড়াই সুস্থ

আমি অনিদ্রায় ভুগছিলাম, সেইসাথে শরীরের একাধিক জায়গায় ব্যথা। ডাক্তার বললেন, এটা হলো ডিপ্রেশন। ঘুমের ওষুধ খেলেই সব ঠিক হয়ে যাবে। কিন্তু হলো না। এরপর আমার নামে হিলিং দেয়া হলো। এখন আমি সম্পূর্ণ সুস্থ। ডিপ্রেশনের ওষুধ আর খেতে হয় না। দুই বেলা মেডিটেশন করছি এবং ভালো আছি।

[কল্পনা রাণী রায়, গৃহিণী]

ভাইয়ের খোঁজ পেলাম

কয়েক বছর আগে আমার ছোট ভাই রাগ করে বাড়ি ছেড়ে চলে যায়। প্রায় দুই মাস যাবৎ সে আমাদের সাথে কোনো রকম যোগাযোগ করে নি। তাকে কোথাও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না। একসময় আমরা তার জন্যে হিলিংয়ে নাম দেই। তিন দিন পরেই সে আমাদের সাথে

বিস্ময়কর নিরাময়

কোয়ান্টাম সদকা হিলিং

নিরাময়ের এক শাশ্বত কার্যকর প্রক্রিয়া হচ্ছে কোয়ান্টাম সদকা হিলিং। এতে রয়েছে রোগ-ব্যাদি ও বালা-মুসিবত মুক্তিতে বিশ্বাস মনছবি প্রার্থনা ও সদকার এক অনন্য আত্মিক সম্মিলন। গত ১৬ বছরে লক্ষ লক্ষ মানুষ এ প্রক্রিয়ার সাথে যুক্ত হয়ে রোগ-ব্যাদি, বালা-মুসিবত থেকে মুক্ত হয়েছেন। ২০১৪ সালে সারা দেশে ৫,৩৩,১৬৫টি সদকা হিলিং সম্পন্ন হয়।

নানাবিধ জটিল সমস্যার সমাধানে ও সাফল্যের জন্যে হাজারো মানুষ কখনো একবারের জন্যে, কখনো ৪০ বারের জন্যে, কখনো বা সারা বছরের জন্যে নাম দিয়েছেন এবং করণাময়ের অনুগ্রহে নিরাময় লাভ করেছেন। সদকার গুরুত্ব বোঝাতে গিয়ে নবীজী (স) বলেছেন ‘সদকা অকল্যাণের ৭০টি দরজা বন্ধ করে দেয়।’ ‘তোমরা অভাব ও বালা-মুসিবত দূরে সদকা দাও।’ ‘তোমরা রোগমুক্তির জন্যে সদকা দাও।’

সকল মহামানবই রোগমুক্তির জন্যে প্রার্থনা করতেন। হযরত ঈসা (আ)-এর নিরাময়ের প্রার্থনা সাথে সাথে করুল হওয়ার অসংখ্য দৃষ্টান্ত রয়েছে। মহামতি বুদ্ধ বলেছেন, প্রার্থনা দেহকে ব্যাধিমুক্ত করে। ঋগবেদে রোগ-ব্যাদি ও পঙ্গুত্ব থেকে মুক্ত থাকার জন্যে প্রার্থনাকে বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়েছে।

প্রার্থনা ও দানের এই শক্তির সাথে কোয়ান্টাম সদকা হিলিংয়ে যুক্ত হয়েছে যৌথ মেডিটেশন বা ধ্যানের সমমর্মী অনুরণন।

যোগাযোগ করে এবং আমরা নিশ্চিত হই যে, সে নিরাপদে আছে, ভালো আছে।

[মো. আয়াজ উদ্দিন, ব্যবসায়ী]

ব্রেন টিস্যু এখন স্বাভাবিক

ক্লাস সেভেন-এ পড়ার সময় আমার তিন বার খিঁচুনি হয়। পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে ডাক্তার বলেন, জন্মের সময় আমার ব্রেনে কোনো কারণে আঘাত লেগেছিল, যার ফলে ব্রেনের বাম পাশে কিছু টিস্যু ঠিকমতো বাড়ে নি। ডাক্তারের আশঙ্কা ছিল, এই খিঁচুনি হয়তো মৃগী রোগের লক্ষণ।

দেশের প্রখ্যাত নিউরোমেডিসিন বিশেষজ্ঞের শরণাপন্ন হলে তিনি কিছু ওষুধ দেন এবং তা সারাজীবন চালিয়ে যাওয়ার পরামর্শ দেন। এরপর নিয়মিত সদকা হিলিংয়ে আমার নাম দেয়া হয়। শোকর আলহামদুলিল্লাহ! দীর্ঘ পাঁচ বছর পর চেক-আপ করতে গেলে তিনি বিস্মিত হয়ে রিপোর্টে দেখেন, নার্ভ টিস্যুটির স্বাভাবিক বৃদ্ধি ঘটেছে, যেখানে পূর্বের তথ্যানুসারে নার্ভ টিস্যুটির বৃদ্ধি থেমে ছিল। প্রষ্টার অশেষ কৃপায় এ পর্যন্ত আমার আর খিঁচুনি হয় নি।

[আসিফুল হক জজ, শিক্ষার্থী]

আপনার করণীয়

- ফাউন্ডেশনে নিয়মিত যৌথ হিলিং অনুষ্ঠিত হয়। হিলিং স্লিপ/ কার্ডে যে-কেউ নিরাময়প্রার্থীর নাম, ঠিকানা ও সমস্যা উল্লেখ করে জমা দিতে পারেন।
- প্রতি মাসে প্রজ্ঞা জালালি ও সজ্ঞা জালালিতে অনুষ্ঠিত হয় বিশেষ হিলিং। এ বিশেষ যৌথ হিলিংয়ের জন্যে আগেই নাম দিন।
- প্রত্যেক রমজানে প্রতিদিন হিলিং এবং আখেরি দোয়ায় বিশেষ হিলিং অনুষ্ঠিত হয়।
- যে-কোনো বালা-মুসিবত থেকে মুক্তি পেতে একবার থেকে শুরু করে যতবার খুশি এমনকি সারা বছরের জন্যেও আপনি হিলিংয়ে নাম দিতে পারেন।

কোয়ান্টাম সদকা হিলিংয়ের মূল অনুঘটক হচ্ছে সদকা। প্রতিবারের জন্যে ন্যূনতম সদকা ৪০ টাকা করে দেয়া উচিত। আর যত বেশি বেশি সদকা দেবেন নিরাময় প্রক্রিয়া তত বেগবান হবে।

ছেলে এখন অনেকটাই সুস্থ

আমার ছেলে অটিজমে আক্রান্ত। ডাক্তারের পরামর্শমতো চলে সে ধীরে ধীরে বেশ সুস্থ হয়ে ওঠে। তবে একটা পর্যায়ে তার অগ্রগতি থেমে যায়। গত পাঁচ বছর যাবৎ আমি কোয়ান্টামের সাথে আছি। এবং এই পাঁচ বছর যাবৎ সারা বছরের জন্যে লামায় হিলিং দিয়েছি আমার ছেলের জন্যে। বর্তমানে সে আগের থেকে অনেকটাই সুস্থ।

[সালমা সুলতানা, আইনজীবী]

কেমোথেরাপির পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া হয় নি

আমার মামার ক্যান্সার ধরা পড়ে। পরিবারের সবাই ধরে নেয়, তিনি আর বাঁচবেন না। কারণ তার অবস্থা খুবই খারাপ ছিল। তাকে হাসপাতালে ভর্তি করে কেমোথেরাপি দেয়া শুরু হলো। পাশাপাশি চলতে থাকল

সদকা হিলিং। আশ্চর্যের বিষয়, কেমোথেরাপির কোনো পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া তার শরীরে দেখা যায় নি। এখন তিনি সুস্থ।

[বেলায়েত হোসেন মিনাল, ব্যবসায়ী]

বাচ্চার হার্টবিট পাওয়া গেল

আমার মেয়ে তখন দুই মাসের অন্তঃসত্ত্বা। চেক-আপ করে ডাক্তার বললেন, বাচ্চার হার্টবিট পাওয়া যাচ্ছে না, এবোরশন করে ফেলুন। আমরা খুব মুষড়ে পড়লাম। তারপর আরেক জায়গায় আলট্রাসোনোগ্রাফি করা হলো, সেই ডাক্তারও একই কথা বললেন। কিন্তু আমার মেয়ের কথা, সে তার সন্তানের হার্টবিট টের পায়। আমরা সদকা হিলিংয়ে নাম দিলাম এবং মাটির ব্যাংকে নিয়মিত দান করতে লাগলাম। দেড় মাস পর আরেকজন ডাক্তার পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে বললেন, বাচ্চার হার্টবিট খুব মৃদু হলেও শোনা যাচ্ছে। একথা শুনে আমার মেয়ে চিৎকার করে কাঁদতে লাগল। পুরো পরিবারে যেন খুশির ঢেউ। এখন সেই বাচ্চার বয়স সাড়ে তিন বছর এবং সে সম্পূর্ণ সুস্থ ও মেধাদীপ্ত একটা শিশু।

[সানোয়ারা আলম সিদ্দিকী, গৃহিণী]

হার্টের ছিদ্র বন্ধ হয়ে গেছে

২০১৩ সালে আমার স্ত্রীর কোল জুড়ে আসে ফুটফুটে একটি মেয়েসন্তান। জন্মের পরই ওর হার্টে দুটি ছিদ্র দেখা দেয়। ওকে আইসিইউতে রেখে সাত দিন চিকিৎসা দেয়া হয় আর সেইসাথে চলে হিলিং। আল্লাহর রহমতে তিন দিনেই ওর হার্টের ছিদ্র ৯০% ভালো হয়ে যায়। ডাক্তার বললেন, এত তাড়াতাড়ি ৯০% ভালো সাধারণত হয় না, আপনার মেয়েরটা কীভাবে হলো? হিলিং চলতে থাকে এবং ছয় মাস পর মেয়ে পুরোপুরি সুস্থ।

[সাজ্জাদ আজিম, ব্যবসায়ী]

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে মাস্টার্স-এ চান্স পেলাম

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অনার্স পাশ করার পরে মনছবি দেখতে শুরু করলাম, আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মাস্টার্স সম্পন্ন করব। প্রস্তুতি শুরু করলাম এবং নিয়মিত হিলিংয়ে নাম দিলাম। সাত হাজারের বেশি প্রতিযোগীর মধ্যে নেয়া হবে ৪০ জনকে। শোকর আলহামদুলিল্লাহ! ভর্তি পরীক্ষায় আমার অবস্থান হলো ২৬ তম!

[মো. মেহেদি হাসান, শিক্ষার্থী]

মা এখন নিজের কাজগুলো নিজেই করছেন

২০১১ সালে আমার মায়ের ব্রেন স্ট্রোক হয়। ডাক্তার বললেন, তার স্বাভাবিক হওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম। ভাগ্য ভালো যে, তখন অজ্ঞান ছিলেন বলে আমার মা নিজে একথা শোনেন নি, তাহলে স্বাভাবিক হওয়া হয়তো কঠিন হতো।

তবে আমার প্রচণ্ড বিশ্বাস ছিল, তিনি সুস্থ হবেন। আমি নিয়মিত মায়ের নামে হিলিং দিয়েছি। শোকর আলহামদুলিল্লাহ! ২২ দিন পর তার জ্ঞান ফেরে। এখন তিনি সুস্থ স্বাভাবিক একজন মানুষ এবং নিজের কাজগুলো নিজেই সুন্দরভাবে করছেন।

[সেলিম হোসেন, সিনিয়র প্রভাষক, বিএসবি ক্যামব্রিয়ান স্কুল এন্ড কলেজ]

দেনাদার নিজেই ফোন করে টাকা দিয়ে গেলেন

আমার সহকর্মী একবার জানালেন, বড় একটা আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছেন এবং তিনি হিলিংয়ে নাম দিতে চান। তিনি পোশাকের ব্যবসা করতেন। এক মহিলা তার কাছ থেকে ১০ হাজার টাকার কাপড় নিয়েছেন প্রায় দুই বছর আগে। পাওনা টাকা দিচ্ছেন না এবং কোনো যোগাযোগও করছেন না।

আমি তার নামে হিলিং জমা দিলাম। এক সপ্তাহ পর তিনি খুব খুশি হয়ে আমাকে জানালেন, সেই মহিলা নিজেই ফোন করে টাকাটা তার কাছে পৌছে দিয়ে গেছেন।

[শবনম সাবেরা, শিক্ষক]

রক্তের সমস্যা দূর হলো

আমার ছোট বোনের বাচ্চাটির সাত মাস বয়স থেকে রক্তের প্লাটিলেট ভাঙতে লাগল। প্লাটিলেট নির্দিষ্ট মাত্রা থেকে অনেক কমে গেল। ডাক্তাররা কোনো রোগই শনাক্ত করতে পারলেন না। সদকা হিলিংয়ে নাম দিয়ে যাচ্ছিলাম নিয়মিত। পরে বাচ্চাটাকে ব্যাংকক নিয়ে যাওয়া হলো। সেখানে ডাক্তার বললেন, যেহেতু সে একেবারে শিশু, তার অটো ইমিউন সিস্টেমের মাধ্যমে সব ঠিক হয়ে যাবে। সত্যিই তা-ই হলো, ধীরে ধীরে রক্তের সমস্যটা দূর হয়ে গেল এবং এখন সে সম্পূর্ণ সুস্থ-প্রাণবন্ত একটা শিশু।

[কানিজ ফাতেমা, গৃহিণী]

গ্রাজুয়েটদের প্রশ্ন » ? » উত্তর দিচ্ছেন গুরুজী

প্রশ্ন : বাংলাদেশে বর্তমানে অনেক এফএম রেডিও হয়েছে। বিনোদনের ক্ষেত্রে এগুলোর ভূমিকা কী? এই রেডিওগুলো কি আমাদের দেশ ও সংস্কৃতিকে এগিয়ে নিতে পারবে?

উত্তর : আসলে এই চিন্তাভাবনাগুলো আমি বুঝি না। এসব রেডিও নাকি সারারাত চলে! কতটা নির্বোধ হলে আমরা এসব নিয়ে মেতে থাকি। রাত তো ঘুমানোর জন্যে, পরিপূর্ণ বিশ্রামের পর যেন আপনি পরদিন সকালে উঠে কাজ শুরু করতে পারেন। কিন্তু এসব বিনোদন কি সেটা করতে দিচ্ছে?

টিভিতেও কিন্তু মোটামুটি একই ব্যাপার। চ্যানেলের কোনো শেষ নেই। চ্যানেলগুলোতে কী দেখাচ্ছে তারও কোনো শেষ নেই। ঘুরেফিরে সব চ্যানেলেই একই জিনিস। রাত জেগে এসব রেডিও শোনা এবং টিভি দেখা এগুলোও এক ধরনের আসক্তি। আর এসব আসক্তির দরুন আমাদের সমাজে সাম্প্রতিককালে অনিদ্রা, অস্থিরতা, টেনশনসহ নানা ধরনের মনোদৈহিক রোগ বেড়ে যাচ্ছে। আর এসব বলছেন সমাজবিজ্ঞানী ও চিকিৎসাবিজ্ঞানীরাই। তাই রাত ১১টার পরে রেডিও-টিভি সব বন্ধ রাখুন, যদি শারীরিক-মানসিকভাবে সুস্থ থাকতে চান।

আর রাত ১১টার পরে যিনি না ঘুমিয়ে টিভি দেখবেন, রেডিও শুনবেন, তার মানে ভেতরে অস্থিরতা রয়েছে। চিকিৎসা দরকার। তার জন্যে কাউন্সেলিংয়ের ব্যবস্থা হওয়া উচিত। সরকারিভাবেই তাদের জন্যে একটা হাসপাতাল করা উচিত। অবশ্য কাজ থাকলে আলাদা কথা। তখন ১১টা কেন, আপনি সারারাতও কাজ করতে পারেন।

আরেকটা বিষয় হলো, এসব এফএম রেডিও অধিকাংশ মানুষই কানে হেডফোন লাগিয়ে শোনে। এটি আমাদের শ্রবণ ক্ষমতার জন্যে ক্ষতিকর। তাই এ জাতীয় বিনোদন থেকে যত দূরে থাকতে পারেন তত ভালো। নিতান্ত যদি শুনতেই হয় তবে উপকারী ও প্রয়োজনীয় অনুষ্ঠানগুলোই শুধু শুনুন; তবে পরিমিত এবং অবশ্যই দিনের বেলা। রাত ১১টার পরে একমাত্র বোকা না হলে এফএম রেডিও নিয়ে কেউ পড়ে থাকে না।

প্রশ্ন : খোদাপ্রাপ্তির জ্ঞান হাসিল করতে কত সময়ের প্রয়োজন?

উত্তর : আমাদের সমস্যাটা এখানেই। খোদাকে আমরা পেতে চাই সবচেয়ে অল্প সময়ে, ধরাবাঁধা একটা নির্দিষ্ট সময়ে। এটা নিয়ে হযরত আশরাফ আলী থানভী (র), যিনি খুব বড় একজন বুজুর্গ ছিলেন, তার একটা ঘটনা আছে।

এক ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট-তখনকার দিনে কোনো স্বদেশীর ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হওয়া মানে একটা খুব বড় ব্যাপার। অবসর গ্রহণের পর তিনি এসেছেন হযরত মাওলানা থানভী (র)-এর কাছে। এসে বললেন, হুজুর, আমাকে খুব তাড়াতাড়ি আল্লাহ পাওয়ার পথ করে দেন। আমার সময় খুব কম। মাওলানা সাহেব একটু হেসে খুব সরলভাবে জিজ্ঞেস করলেন যে, আচ্ছা, ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হওয়ার জন্যে আপনাকে কী কী করতে হয়েছে? সবমিলিয়ে কতদিন লেগেছে? ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব বললেন, আমাকে

এন্ট্রান্স পাশ করতে হয়েছে। তারপর আরো এই এই পড়াশোনা করেছে। চাকরি পেয়েছি। চাকরির অনেকগুলো স্তর পার করে অবশেষে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হয়েছি এবং এটা হতে পড়াশোনা শেষ করার পরেও প্রায় ২৪/২৫ বছর লেগে গেছে। তারপরে অবসর নিয়েছি। মাওলানা সাহেব তখন বললেন, দুনিয়ার এই একটা পদ পাওয়ার জন্যে যদি আপনি জীবনের এত বছর সময় ব্যয় করে থাকেন, আল্লাহ কি এই পদের চেয়ে বড় না ছোট?

আসলে খোদাপ্রাপ্তির জ্ঞান অর্জন করতে কত সময় লাগবে এটা কারো পক্ষে বলা সম্ভব নয়। আপনি আন্তরিকতা নিয়ে অগ্রসর হোন। যে-কোনো সময় আল্লাহ আপনার কাশফ বা অন্তর্দুয়ার খুলে দিতে পারেন। এটা কেউ করে দিতে পারবে না। আরেকজন আপনাকে পথ দেখাতে পারে। কিন্তু চেষ্টা, পরিশ্রম, মেহনত যা করার আপনাকে করতে হবে এবং এর জন্যে কোনো সময় নির্ধারণ করা নেই। কত দিন বলে কোনো কথা নেই। আপনি চেষ্টা করতে থাকুন। যে-কোনো সময় আল্লাহ তার রহমতের দরজা আপনার জন্যে খুলে দিতে পারেন।

প্রশ্ন : আমার সন্তানের বয়স ছয় বছর আট মাস। আমার মেয়ে সন্তান, আমার স্বামীর ইচ্ছে ছিল ছেলের। তাই আমাদের সন্তানের প্রতি তার কোনো ভালবাসার অনুভূতি নেই। আমি অনেক বলেছি যে, এ-ও তো তোমারই সন্তান, ওকে অনুভব করো। কিন্তু এখন বুঝি যে, এভাবে বলে বুঝিয়ে অনুভূতি আনা যায় না। আমার স্বামী কীভাবে মেয়েকে আপন করে নেবে?

উত্তর : আসলে মূল সমস্যাটা আপনার মধ্যে। আপনার স্বামীকে আপনি বার বার বলছেন, এটা তোমার সন্তান, অনুভব করো। কিন্তু এখন বুঝতে পারছেন যে, এভাবে বলে বুঝিয়ে অনুভূতি সৃষ্টি করা যায় না। মূল সমস্যা কিন্তু আপনি সৃষ্টি করছেন।

কারণ, অনেক কিছু আছে যা বুঝতে দিতে হয় না। অনেক পর্দা আছে যা ভেঙে দিতে হয় না। আপনার কথা থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, আপনার মেয়েও হয়তো বোঝে যে, তার বাবা ছেলে চেয়েছিল কিন্তু সে আশা পূরণ না হওয়ায় তার বাবা তাকে পছন্দ করে না। তাকে আপন করে নিতে পারে না। কারণ আপনার এ কথা ও চিন্তা যে শুধু আপনার মধ্যে সীমিত থেকেছে সেটা মনে হয় না।

আর ‘আমার মেয়ে সন্তান’ বলে আপনি কী বোঝাচ্ছেন? সে কি আপনার স্বামীর সন্তান নয়? ‘আমার সন্তানকে স্বামী অনুভব করছে না’। এসব বলে আপনি নিজেই কিন্তু দূরত্ব সৃষ্টি করছেন। একজন চাইতেই পারে ছেলে সন্তান, আবার কেউ মেয়ে সন্তানও চাইতে পারে। এটা হচ্ছে বাস্তবতা। আপনার প্রশ্ন হচ্ছে, আপনার স্বামী আপনার বাচ্চাকে কীভাবে আপন করে নেবে? আপন করে যদি না নিত তাহলে সাড়ে ছয় বছর লালনপালন করছে কীভাবে? আপনারা একসাথেই বা আছেন কী করে?

একটা কথা মনে রাখবেন, সবার কাছ থেকে আবেগ-অনুভূতির একই রকম প্রকাশ প্রত্যাশা করা ঠিক না। আপনি যত স্বামীকে বলবেন, সন্তানকে আপন করে নাও, তত তাকে আপনি ছোট করবেন। সন্তানকে ছেড়ে দিন সন্তানের মতো, স্বামীকে ছেড়ে দিন তার মতো। আপনার যেটুকু দায়িত্ব-কর্তব্য সেটা

আপনি করুন। বাবা একসময় নিজেই বুঝবেন, তিনি সন্তানকে কতটা ভালবাসেন। সময়ের ওপর ছেড়ে দিন আর দোয়া করুন। এটা নিয়ে কখনো কথা বলতে যাবেন না। কারণ কথা বলে যে অনুভূতি আনা যায় না, তা আপনি নিজেও বুঝতে পেরেছেন। সবসময় যা চান সেটার প্রতিই মনোযোগ দেবেন।

আপনার স্বামীকে কমান্ড সেন্টারে নিয়ে আসুন। সন্তানকে তার কোলে দিয়ে দিন। তাকে অনুভব করতে দিন। কিন্তু এই ধরনের কমিউনিকেশন বিটা লেভেলে অর্থাৎ সাধারণ জাহাজ অবস্থায় করবেন না। সবসময় আলফা লেভেলে করবেন। তাতে মেসেজটা তার হৃদয়ে প্রবেশ করবে এবং আপনি সমস্যাকে সমাধানে রূপান্তরিত করতে পারবেন।

প্রশ্ন : কোয়ান্টামে আসার পর এখন ফ্যান্টাসি এবং ইমাজিনেশনের মধ্যকার পার্থক্যটা বুঝতে পারছি। কিন্তু ফ্যান্টাসির বৃত্তটা ভাঙতে পারছি না। বৃত্তটা আমি ভাঙতে চাই। আমার করণীয় কী?

উত্তর : খুব সহজ। কাজ করুন। অর্থাৎ আপনার মনছবির লক্ষ্যে সবসময় কাজের মধ্যে থাকুন। যখন কাজের মধ্যে থাকবেন ফ্যান্টাসি অর্থাৎ অলস ও অলীক কল্পনার সুযোগ আপনি পাবেন না।

আমাকে অনেকেই বলে যে, আপনার মন খারাপ হয় না? আমি বলি, মন খারাপ করার কোনো সুযোগ তো পাই না। কোনো সুযোগই আমার নেই। কখন সকাল হয়, আবার রাত হয়, টেরই পাই না। মন খারাপ হবে কখন? হওয়ার সময়টা কোথায়? মন খারাপ তাদেরই হয় যাদের মন খারাপ করার মতো সময় আছে এবং ফ্যান্টাসিও তারাই করে যাদের ফ্যান্টাসি করার সময় আছে। অতএব সবসময় কাজ, একটার পর একটা কাজ দিয়ে ভরে রাখুন আপনার সারা দিনের সময়টাকে। ফ্যান্টাসি বলে কোনোকিছু আপনার জীবনে থাকবে না।

প্রশ্ন : আমার বয়স ২৪। ভেতর থেকে ভয় ও নেতিবাচকতাগুলো এখনো দূর করতে পারছি না। আমি ভয় পাই আইইএলটিএস পরীক্ষা এবং উচ্চশিক্ষা নিয়ে।

উত্তর : পরীক্ষাকে ভয় পাওয়ার কী আছে? আর ২৪ বছর বয়সে আইইএলটিএস পরীক্ষাকে যদি ভয় পান তবে সাহস আর করবেন কখন?

আসলে আপনি নিয়মিত মেডিটেশন করেন না। তাই ভয় এবং নেতিবাচকতা আপনাকে এখনো আচ্ছন্ন করে আছে। নিয়মিত মেডিটেশন করুন। অটোসাজেশন দিন। আইইএলটিএস-এর প্রস্তুতি নিন যথাযথভাবে। পরীক্ষাই তখন আপনাকে ভয় পাবে। অর্থাৎ যে জিনিসটা যত কঠিন মনে হবে সে জিনিসটাকে তত দৃঢ়তার সাথে ধরতে হবে। তাহলেই আপনি একদিন ওটা জয় করতে পারবেন।

এ মাসের অটোসাজেশন

প্রতিদিন আমার কাজের পরিমাণ বাড়ছে। যত কাজ করব তত আমার প্রাণশক্তি বাড়বে।

যাত্রাবাড়ীতে গুরুজীর পরিচালনায় বিশেষ ধ্যানসন্ধ্যা



কোয়ান্টাম আজ পদার্পণ করেছে সাফল্যের ২৩ তম বছরে। এই ২৩ তম বছর অর্থাৎ ২০১৫ হলো আমাদের জন্যে পারা ও করার বছর।

গুরুজী আরো বলেন, ভালো থাকতে হলে, ভালো কিছু ভাবতে হলে এবং ভালো কাজ করতে হলে আমাদের সবসময় ইতিবাচক পরিবেশে থাকতে হবে। যত

ভালো কাজ করা যাবে, সোনালি ভবিষ্যতের দিকে তত এগিয়ে যাওয়া যাবে।

এজন্যই পারা ও করার বিশ্বাসকে চারপাশের সবার মাঝে ছড়িয়ে দেয়ার কাজটি কোয়ান্টাম করে যাচ্ছে। শুধু লামার শিশুদের নয়, আমাদের আশেপাশের দুস্থ মানুষদের কীভাবে সহযোগিতা করা যায়, সেবা দেয়া যায়, সে ব্যাপারে পদক্ষেপ নিতে হবে।

এছাড়াও তিনি রক্তদান ও মাটির ব্যাংক কার্যক্রমের ওপর গুরুত্বারোপ করেন। সবশেষে এ ধ্যানসন্ধ্যার বিশেষ আকর্ষণ ছিল, ২০১৫ সালে আপনি কী করতে চান-সে লক্ষ্য নির্ধারণে গুরুজীর পরিচালনায় মনছবির মেডিটেশন।

গাজীপুরে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কোয়ান্টাম সভা

গাজীপুরে এপ্রিল মাসব্যাপী অনুষ্ঠিত হয়েছে ৪০টির বেশি কোয়ান্টাম সভা। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো ডুয়েট, কেয়া গ্রুপ, গাজীপুর রোভার স্কাউট, কাপাসিয়া উপজেলা, শ্রীপুর উপজেলা, জেলা আইনজীবী সমিতি অফিস, টঙ্গি পাইলট স্কুল এন্ড গার্লস কলেজ, গাজীপুর জজকোর্ট, তাইরান্নেসা মেডিকেল কলেজ, সফিপুর আইডিয়াল কলেজ, বিজনেস ম্যানেজমেন্ট কলেজ, হাতেখড়ি স্কুল, গাজীপুর আইডিয়াল কিন্ডার গার্টেন, বিআরডিবি উপ-পরিচালকের কার্যালয় ইত্যাদি। কোয়ান্টাম সভাগুলোতে মোট উপস্থিতি ছিল প্রায় দুই হাজার।

শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে আত্মনির্মাণ

কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয় সেল-এর উদ্যোগে প্রতি সোমবার শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত হচ্ছে বিশেষ প্রোগ্রাম আত্মনির্মাণ। শিক্ষার্থীদের ইতিবাচক ও আত্মবিশ্বাসী করে গড়ে তোলার মধ্য দিয়ে তাদেরকে ক্লাসে ১ম ও জীবনে ১ম হতে সহায়তা করার লক্ষ্যেই এই নিয়মিত আয়োজন। এছাড়াও প্রতি মাসে অনুষ্ঠিত হচ্ছে শিক্ষার্থী কোয়ান্টিয়ারদের অংশগ্রহণে কোয়ান্টিয়ার্স ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম।

মতিঝিলে কোয়ান্টিয়ার ওয়ার্কশপ

১০ এপ্রিল কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন মতিঝিল শাখায় সকল কোয়ান্টিয়ারদের নিয়ে কোয়ান্টিয়ার ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠিত হয়। সাংগঠনিক কাজের ক্ষেত্রে কোয়ান্টিয়ারের করণীয় বিষয়ে আলোচনা করেন আর্ডেন্টিয়ার এস.এম মাহবুব-উল আলম। শাখার মোমেন্টিয়ার অধ্যাপিকা খাদিজা মাহতাব-এর পরিচালনায় এক ঘণ্টাব্যাপী এ ওয়ার্কশপটি উপস্থাপনা করেন আর্ডেন্টিয়ার খন্দকার সজিবুল ইসলাম সজিব। ওয়ার্কশপে উপস্থিত ছিলেন ৬২ জন কোয়ান্টিয়ার।

ময়মনসিংহে বিশেষ পারিবারিক ওয়ার্কশপ

১০ এপ্রিল ফাউন্ডেশনের ময়মনসিংহ শাখার উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হলো একটি বিশেষ পারিবারিক ওয়ার্কশপ। ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজের কনফারেন্স হলে অনুষ্ঠিত এ ওয়ার্কশপে পরিবারে অশান্তির মূল কারণ কী এবং পারিবারিক অশান্তি দূর করে সুখী পরিবার গঠন করতে পঞ্চসূত্র এবং বিভিন্ন করণীয়-বর্জনীয় বিষয়ে আলোচনা করা হয়। এছাড়াও ছিল বিষয়ভিত্তিক মেডিটেশন এবং প্রদর্শন করা হয় কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন নির্মিত ডকুমেন্টারি 'সুখী পরিবার'।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মো. ফসিউর রহমান, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাজুয়েট ট্রেনিং ইনস্টিটিউটের পরিচালক ড. মাসুমা হাবিবসহ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।



ওয়ার্কশপে আলোচনা করেন ফাউন্ডেশনের অর্গানিয়ার মারুফ ইবনে মাহবুব এবং এ অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন অর্গানিয়ার আহমেদ শরীফ। কোয়ান্টাম প্রো-মাস্টার প্রাজুয়েট এসোসিয়েট মিলিয়ে মোট ১৪৬ জন সদস্য অনুষ্ঠানে অংশ নেন।

বনানীতে শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের বিশেষ প্রোগ্রাম

কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন বনানী শাখায় ১১ এপ্রিল অনুষ্ঠিত হয় শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের নিয়ে একটি বিশেষ প্রোগ্রাম। সন্ধ্যা ৬টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত এ আয়োজনে সুখী পরিবার নির্মাণের সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি বিষয়ে আলোচনা করেন অর্গানিয়ার সাদিয়া পারভীন এবং লক্ষ্য নির্ধারণের প্রক্রিয়া ও কৌশল বিষয়ে আলোচনা করেন অর্গানিয়ার নাসিম আহমদ।

প্রো-মাস্টার প্রাজুয়েট এসোসিয়েট শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে এ অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন অর্গানিয়ার শায়লা সামাদ।

২৭ এপ্রিল বনানী শাখায় কোয়ান্টিয়ার ও দায়িত্বশীলদের নিয়ে অনুষ্ঠিত হয় লিডারশিপ স্কিল ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম। নেতৃত্বের ধাপ : সাময়িক সাফল্যে আত্মতৃপ্ত নয়, এগোব বড় সাফল্যের দিকে বিষয়ে দিক-নির্দেশনামূলক আলোচনা করেন অর্গানিয়ার ইঞ্জিনিয়ার প্রাণজিৎ লাল শীল।

প্রাজুয়েট ও প্রো-মাস্টার মিলিয়ে এতে অংশ নেন মোট ২১ জন সদস্য। কোয়ান্টিয়ারদের আরো চোঁকস করে গড়ে তুলতে প্রতি মাসে নিয়মিত অনুষ্ঠিত হচ্ছে এই প্রোগ্রাম।

আবশ্যিক

কোয়ান্টাম কসমো স্কুল ও কলেজের জন্যে শিক্ষক/শিক্ষিকা/আবাসিক শিক্ষক (ন্যূনতম অনার্স পাশ), বিজ্ঞান বিভাগের জন্যে (পদার্থ বিজ্ঞান, রসায়ন, জীব বিজ্ঞান, উচ্চতর গণিত) শিক্ষক/শিক্ষিকা আবশ্যিক। বিএড ও নিবন্ধনকৃত প্রার্থীরা অগ্রাধিকার পাবেন। শিশুকানন ও শিশুসদনের শিক্ষার্থীদের দেখানোর জন্যে ব্রাদার, সিস্টার (ন্যূনতম এসএসসি পাশ) ও সিকিউরিটি গার্ড আবশ্যিক।

এছাড়াও কোয়ান্টাম-এর জন্যে কিছু সংখ্যক মালি, মাঠকর্মী প্রয়োজন। আগ্রহীরা যোগাযোগ করুন :

কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন

৩১/ভি শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদীন সড়ক, শান্তিনগর, ঢাকা-১২১৭

ফোন : ৯৩৪১৪৪১, ০১৭১৪-৯৭৪৩৩৩

বর্ষবরণ ১৪২২

চারপাশ স্পন্দিত হলো সুখী জীবনের সুরে

ভ্রমণ ছিল সবার জন্য উন্মুক্ত। এছাড়াও কোয়ান্টাম কসমো স্কুল দুই দিনব্যাপী বৈশাখী ক্রীড়া প্রতিযোগিতা আয়োজন করে। তারপর এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

দেশে-বিদেশে সুখী জীবনের সুর

দেশের সর্বত্র কোয়ান্টাম থ্রাজুয়েট প্রো-মাস্টার এসোসিয়েটদের উদ্যোগে কোয়ান্টাম বর্ষবরণ আয়োজনের পাশাপাশি দেশের বাইরেও লন্ডন, সিডনি, মেলবোর্নসহ বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে পড়ে সুখী জীবনের এই অনুরণন।



বনানী ও মহাখালী শাখা এবং নিকেতন সেলের উদ্যোগে শহীদ ডা. ফজলে রাব্বি পার্কে সম্মিলিত বর্ষবরণ অনুষ্ঠান



শহরের প্রাণকেন্দ্রে শহীদ হাদিস পার্কে বর্ষবরণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে খুলনা শাখা



চট্টগ্রাম সেন্টারের আয়োজনে বর্ষবরণ

কোয়ান্টাম আরোগ্যশালায় বর্ষবরণে অংশগ্রহণকারীদের একাংশ

সার্বজনীন আনন্দে কোয়ান্টাম পরিবার

১ বৈশাখ ১৪২২। বাংলা বছরের প্রথম সূর্যোদয়ের সাথে সাথে শুরু হয় নববর্ষের উৎসবমুখরতা। এই সার্বজনীন আনন্দে প্রতি বছর ফাউন্ডেশনের সদস্যরাও শরিক হন পূর্ণ উদ্দীপনায়। পরিবার-বন্ধু-আত্মীয়-প্রতিবেশীদের নিয়ে অংশ নেন কোয়ান্টাম বর্ষবরণে। উন্মুক্ত মাঠ, পার্ক ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে আয়োজিত এবারের বর্ষবরণে ছিল গৌরবময় অতীত : সম্ভাবনাময় ভবিষ্যৎ শীর্ষক আলোচনা, সুখী জীবনের মেডিটেশন এবং কোয়ান্টাম থিম সং ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। নতুন বছরকে কর্মময়-সফল করার প্রদীপ্ত প্রত্যাশা সবার মাঝে ছড়িয়ে দিতে ফাউন্ডেশনের সেন্টার-শাখা-সেল-প্রি-সেলগুলোতেও ছিল বর্ণাঢ্য আয়োজন।

নববর্ষের ব্যতিক্রমী আয়োজন

কোয়ান্টাম বর্ষবরণ মানেই নববর্ষের উৎসবে যোগ দেয়া হাজার হাজার মানুষকে তেঁতুল-গুড়ের শরবত পান করানো। এর পাশাপাশি সেন্টার-শাখা-সেল-প্রি-সেলগুলোতে থাকে কোয়ান্টামের বৈশাখী মেনু

পান্তাপিয়া। উৎসবের আনন্দকে দুর্মূল্যের ঐতিহ্যে না বেঁধে সবার সাথে ভাগ করে নিতেই এই ব্যতিক্রমী আয়োজন। আবহমান বাংলার চিরচেনা পান্তাভাতের সাথে তেলাপিয়া মাছ ভাজা, সাথে আলুভাজি, পেঁয়াজ, শুকনো মরিচভাজা-সব মিলে পান্তাপিয়া।

লামার কোয়ান্টামমে বর্ষবরণ র্যালি ও বৈশাখী মেলা

এবার কোয়ান্টামম, লামায় দিনব্যাপী বর্ষবরণ উদযাপিত হয় কিছুটা ভিন্নভাবে। ভোরবেলা থেকেই কোয়ান্টা, কোয়ান্টামম স্টাফ ও তাদের পরিবারবর্গ ছাড়াও স্থানীয় মেহমানরা বর্ষবরণ উদযাপনের জন্যে আরোগ্যশালায় আসতে শুরু করেন। ফাউন্ডেশনের আর্ডেন্টিয়ার হযরত মাওলানা ছায়ীদুল হকের প্রাণবন্ত আলোচনা, সুখী জীবনের মেডিটেশন ও নতুন বছরে চারপাশের সবার সুন্দর জীবন কামনায় বিশেষ প্রার্থনা করা হয় এতে, যেখানে অংশ নেয় প্রায় সাড়ে তিন হাজার মানুষ। প্রতিবেশী ও মেহমানদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ ছিল কোয়ান্টামের প্রতি তাদের আস্থা, বিশ্বাস ও একাত্মতারই বহিঃপ্রকাশ।

এবারের বর্ষবরণ উপলক্ষে কোয়ান্টামম



চন্দ্রিমা উদ্যানে মোহাম্মদপুর শাখার বর্ষবরণ



টেনিস কমপ্লেক্স প্রাঙ্গণে রাজশাহী সেন্টারের বর্ষবরণ অনুষ্ঠানে ধ্যানমগ্ন সদস্যরা

কোয়ান্টাম বুলেটিন : মে ২০১৫ ॥ সম্পাদক : কাজী মাহতাব উদ্দিন আহমদ ॥ নাহার আল বোখারী, মহাপরিচালক, কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন কর্তৃক
৩১/ভি শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদীন সড়ক, শান্তিনগর, ঢাকা-১২১৭ থেকে প্রকাশিত ও উইন্ডোজ প্রিন্টিং সেন্টার থেকে মুদ্রিত ॥ শুভেচ্ছা মূল্য - ৫ টাকা
Phone : 9341441, 8319377, 9355756 Mobile : 01714-974333, 01711-671858, 09613-002025 ■ E-mail : bulletin@quantummethod.org.bd



রমজানে মাটির ব্যাংক করসেবা

রমজানে
যে-কোনো
সংকর্মে

সওয়াব কমপক্ষে
৭০ গুণ বেশি। এ

বিষয়টিকে গুরুত্ব

দিয়ে ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে প্রতিবছরই রমজানে আয়োজন করা হয় মাটির ব্যাংক করসেবা। এ কার্যক্রমের আওতায় বিভিন্ন সেন্টার, শাখা, সেলে কোয়ান্টাম পরিবারের সদস্যরা কর্মব্যস্ত সময় কাটাবেন নিজের ও পরিচিতদের মাটির ব্যাংক সংগ্রহ ও বিতরণে। নিজের মাটির ব্যাংকটি নিকটস্থ সেন্টার, শাখা, সেলে জমা দেয়ার পাশাপাশি আপনিও অংশ নিন এ বরকতময় করসেবায়।

রমজানে একাত্ত হোন কোরআনের ধ্যানে

কোরআন নাজিলের পুণ্যময় মাস রমজান। তাই এ মাসে বেশি বেশি কোরআন চর্চা বিশেষ বরকতপূর্ণ। আর কোরআন নাজিল হয়েছে ধ্যানের স্তরে এবং কোরআনের নির্দেশ হলো, মনোযোগ ও মৌনতার মধ্য দিয়ে এর শিক্ষাকে উপলব্ধি করা। এ লক্ষ্যে ১৯৯৬ সাল থেকে কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন প্রতিবছর ধ্যানের স্তরে মৌন থেকে কোরআন উপলব্ধির আয়োজন করে আসছে।

এবার রমজানে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে ১৭ তম কোয়ান্টামে খতমে কোরআন। ১৯ থেকে ২৫ জুন দেশজুড়ে ফাউন্ডেশনের বিভিন্ন সেন্টার, শাখা, সেলগুলোতে কোয়ান্টামে খতমে কোরআন অনুষ্ঠিত হবে। কোয়ান্টামে এটি অনুষ্ঠিত হবে ২০ থেকে ২৪ জুন। আপনিও একাত্ত হোন মহিমাম্বিত কোরআনের ধ্যানে।

আখেরি দোয়ায় অংশ নিন

রমজানে ফাউন্ডেশনের সবচেয়ে বড়, আকর্ষণীয় ও বরকতময় অনুষ্ঠান আখেরি দোয়া। কোয়ান্টামে খতমে কোরআন-পরবর্তী এ কমপ্যাক্ট আখেরি দোয়ায় শরিক হোন।

ঢাকার কাকরাইলস্থ আইডিইবি মিলনায়তনে গুরুজীর পরিচালনায় ২৬ ও ২৭ জুন গ্রাজুয়েট কমপ্যাক্ট আখেরি দোয়া এবং ৩ ও ৪ জুলাই প্রো-মাস্টার্স কমপ্যাক্ট আখেরি দোয়া অনুষ্ঠিত হবে।
সময় : সকাল ৯টা – ইফতার পর্যন্ত।



রক্তদাতা সম্মাননা অনুষ্ঠানে ডা. সামন্ত লাল সেন

নিয়মানুবর্তিতা ও সেবার অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে কোয়ান্টাম



কিছু প্রতিষ্ঠান আছে যেখানে না গেলে বাইরে থেকে কিছুই বোঝা যায় না। এখানে না এলে আমারও অনেক কিছু অজানা থেকে যেত। বাংলাদেশে বহু জায়গায় বহু অনুষ্ঠানে আমি গিয়েছি, কিন্তু এরকম ঠিক সময়ে অনুষ্ঠান শুরু হতে দেখি নি। একটি জাতি কখনো এগোতে পারে না, যদি না তারা সময় ও নিয়মানুবর্তিতার ব্যাপারে সচেতন হয়। আমি মনে করি, নিয়মানুবর্তিতা ও সেবার ক্ষেত্রে অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে কোয়ান্টাম।

২৭ মে কোয়ান্টাম স্বেচ্ছা রক্তদান কার্যক্রম আয়োজিত ১১৪ তম শত আজীবন রক্তদাতা সম্মাননা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এ কথা বলেন ঢাকা মেডিকেল কলেজের বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইউনিটের কো-অর্ডিনেটর ডা. সামন্ত লাল সেন।

তিনি বলেন, আঘাতপ্রাপ্ত হলে বা শরীরের কোথাও কেটে গেলে ক্ষতস্থান দিয়ে যেমন রক্তক্ষরণ হয়, তেমনি শতকরা ২৫ থেকে ৩০ ভাগ অগ্নিদগ্ধ রোগীর ক্ষেত্রেও রক্তক্ষরণ হয়। এটি রক্তের সাদা রংবিশিষ্ট একটি উপাদান (প্লাজমা)। সাধারণ রক্তক্ষরণের মতো এটি দেখা যায় না, কিন্তু রক্ত দিয়েই এ ক্ষয় পূরণ করতে হয়।

আমাদের বার্ন ইউনিটে প্রতিদিন গড়ে ৪০ থেকে ৫০ ইউনিট রক্তের প্রয়োজন হয়। আর এখানে যারা আসেন তাদের অধিকাংশই ঢাকাসহ দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে আসা গরিব অসহায় মানুষ। তাই আপনারা যারা স্বেচ্ছায় রক্তদান করছেন, তারা মানুষের জন্যে ও জাতির জন্যে যে কত বড় কাজ করছেন, তা আমার পক্ষে ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়।

তিনি আরো বলেন, আপনারা জানেন সরকারি উদ্যোগে একটি জাতীয় প্লাস্টিক সার্জারি ও বার্ন ইনস্টিটিউট নির্মিত হতে যাচ্ছে। সেখানে আমরা একটি সুবৃহৎ রক্ত পরিসঞ্চালন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করব। সেখানে আমরা কোয়ান্টামকে সাথে রাখতে চাই। এখানে একটি জিনিস আমার খুবই ভালো লাগছে, সেটি হলো, একটি ফেস্টুনে লেখা রয়েছে—রক্তদান অত্যন্ত পুণ্যের বা সওয়াবের কাজ। একজন মানুষের জীবন রক্ষা করা সমগ্র মানবজাতির জীবন রক্ষা করার মতো মহান কাজ। এ কথাটি আমরা আমাদের হাসপাতালে বড় করে লিখে রাখব, যাতে আরো অনেক বেশি মানুষ রক্তদানে উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত হতে পারে।

আল কোরআন
বাংলা মর্মবাণী

রমজানে পৌছে যাক ঘরে ঘরে

পবিত্র রমজানকে
সামনে রেখে
মাতৃভাষায়
কোরআন



অনুধাবনের অনন্য সুযোগকে চারপাশের সবার মাঝে ছড়িয়ে দেয়ার জন্যে কোয়ান্টাম পরিবারের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন গুরুজী শহীদ আল বোখারী মহাজাতক। আসন্ন রমজানের শুরু থেকেই পরিচিত পরিমণ্ডলের সম্ভাব্য প্রতিটি মানুষ ও পরিবারে পৌছে যাক আল কোরআন বাংলা মর্মবাণী, আলোকিত হোক আরো লক্ষ মানুষ ও পরিবার।

উল্লেখ্য, ২০১৪ সালের পবিত্র রমজানে কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন প্রকাশ করেছে আল কোরআনের পূর্ণাঙ্গ বাংলা মর্মবাণী। প্রকাশের প্রথম দিন থেকেই ফাউন্ডেশনের সকল পর্যায়ের সদস্য এবং তাদের আত্মীয়-পরিচিত-বন্ধুবান্ধবসহ চারপাশের অনেকের কাছেই পৌছে যায় এ বাংলা মর্মবাণী।

ফলে সহজ বাংলায় কোরআন পড়া, বোঝা এবং স্রষ্টার নির্দেশনা অনুসরণ করা এখন অনেক সহজ হয়েছে। যিনিই পড়েছেন তিনি অনুভব করেছেন, জীবনের সব দুঃখ বঞ্চনা অতৃপ্তি থেকে মুক্তির বাস্তব উপায় আর দৈনন্দিন সমস্যার কার্যকর সমাধান রয়েছে কোরআনের আয়াতে আয়াতে।

সম্ভবদ্বাভাবে যাকাত আদায় করুন

সম্ভবদ্বাভাবে যাকাত আদায় স্বয়ং আল্লাহর নির্দেশ। তাই যাকাত দানে সমর্থ ফাউন্ডেশনের সদস্যরা কোয়ান্টাম যাকাত ফান্ডে যাকাতের অর্থ জমা করেন, সেইসাথে পরিচিতদেরও উদ্বুদ্ধ করেন। এ ফান্ডে জমাকৃত সব অর্থ শরিয়া নির্ধারিত খাতে ব্যয় করা হয়।

এ রমজানে আপনিও যাকাত জমা দিন কোয়ান্টাম যাকাত ফান্ডে। এগিয়ে আসুন বঞ্চিতের কল্যাণে।

কোয়ান্টাম মেথড কোর্স

৩৯৬ তম ব্যাচ ১১ ঢাকা

১২, ১৩, ১৪ ও ১৫ জুন

(শুক্র, শনি, রবি ও সোমবার)

স্থান : ইনস্টিটিউশন অব ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্স
বাংলাদেশ (আইডিইবি), কাকরাইল, ঢাকা

বিশিষ্ট কবি, গীতিকার ও সৃজনশীল লেখক নাসির আহমেদ। কবিতা গান নাটক উপন্যাস শিশুসাহিত্য ও কলামসহ সাহিত্যের নানা মাধ্যমে তিনি লিখছেন গত চার দশক ধরে। তার রচিত গানগুলো গীত হয়েছে দেশের প্রধান শিল্পীদের কণ্ঠে। সাহিত্যে অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ বাংলা একাডেমি পুরস্কারসহ তিনি বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গে বিভিন্ন সম্মাননায় ভূষিত হয়েছেন। পেশায় তিনি একজন সাংবাদিক। দেশের একাধিক জাতীয় দৈনিকে বিভিন্ন সময় নানা গুরুত্বপূর্ণ পদে দায়িত্ব পালন করেছেন। বর্তমানে তিনি বাংলাদেশ টেলিভিশনের পরিচালক (বার্তা) হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। সম্প্রতি তিনি কোয়ান্টাম মেথড কোর্সের ৩৯০ ব্যাচে অংশ নেন।

বিশ্বাস ও ইচ্ছাশক্তিকে জাগিয়ে তোলে মেডিটেশন

নাসির আহমেদ

আমার শৈশব কেটেছে দ্বীপজেলা ভোলা-র প্রত্যন্ত গ্রামে। ধারেকাছে কোনো স্কুল ছিল না। কয়েক মাইল দূরের আলীনগর প্রাইমারি স্কুলে যেতে হতো কাদামাথা পথ আর খাল পাড়ি দিয়ে। বাবার আয় ছিল সামান্য, তার ওপর সাত ভাই-বোন একত্রে পড়াশোনা করতাম। সবমিলিয়ে নানা রকম প্রতিকূলতা ছিল নিত্যসঙ্গী।

আজ এই পরিণত বয়সে এসে বুঝতে পারি, সেই দারিদ্র্য আর সংগ্রাম আমাকে জীবনে কষ্টসহিষ্ণু ও আত্মপ্রত্যয়ী হতে সাহায্য করেছে, ফলে পরবর্তীতে পারিপার্শ্বিক প্রতিকূলতাগুলোকে আমি জয় করতে পেরেছি।

সে-সময় আমাদের গ্রাম থেকে ঢাকা যেতে লাগত দুদিন। পত্রিকা আসত দু-তিন দিন পরে। চারপাশের চরম অসহায়তা আর কষ্টপীড়িত জীবন দেখে মনে হতো, এ আমার জন্যে নয়। জীবনটাকে বদলাতে হবে। স্বপ্ন দেখতাম, একদিন ঢাকায় যাব। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করব। বড় কিছু করতে হবে আমাকে।

ভোলা কলেজ থেকে উচ্চ মাধ্যমিক সম্পন্ন করে ষাটের দশকে ঢাকায় আসি। ঢাকা তখন ছোট শহর। জগন্নাথ কলেজে বাংলায় অনার্সে ভর্তি হই। মূলত আর্থিক অনটন ঘোচাতেই পড়াশোনার পাশাপাশি সাংবাদিকতায় যোগ দিয়েছিলাম। সাপ্তাহিক গণমুক্তি পত্রিকায় দু শ টাকা বেতনে কাজ শুরু করি।

আমার মা ছিলেন সৃজনশীল চিন্তাচেতনার মানুষ। পুঁথিসাহিত্য ও রূপকথা পড়তে ভালবাসতেন। পড়তেনও প্রচুর। তার কাছ থেকে সে-সব শুনে ও পড়ে ছোটবেলাতেই আমার মধ্যে একটা সাহিত্যবোধ গড়ে ওঠে। ছাত্রবয়স থেকেই আমি কবিতা লিখি। কিছু কবিতা এখানে-ওখানে ছাপা হচ্ছিল।

খ্যাতিমান কবি ও সাহিত্যিক আহসান হাবীব তখন দৈনিক বাংলা-য় কর্মরত। এক কবিরন্ধুর মাধ্যমে তার কাছে দুটো কবিতা পাঠালাম। কবিতা দুটো তিনি ছাপলেন। একদিন দেখা করতে বললেন তার সাথে।

গেলাম। বললেন, কবিতা দুটো তার ভালো লেগেছে। গদ্য কেমন লিখি জানতে চাইলেন। তারপর দুটো বই দিয়ে বললেন রিভিউ লিখে নিয়ে যেতে।

সে-রাতেরই বই দুটো পড়ে ফেললাম। সকালে রিভিউ লিখে দুপুরে নিয়ে গেলাম কবি আহসান হাবীবের কাছে। তিনি বিস্মিত! বলেই ফেললেন, এ-ও কি সম্ভব? এক রাতের মধ্যে দুটো বই পড়ে তার রিভিউ লিখে আনা?

যা-হোক, লেখা দুটো তার ভালো লাগল। পত্রিকায় ছাপলেন। একসময় তার সম্মেহ আহ্বান ও আমার আগ্রহে সাহিত্য সম্পাদকের সহকারী হিসেবে যোগ দিলাম দৈনিক বাংলা-য়। কবি শামসুর রাহমান তখন ওখানে সাহিত্য সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করছেন।



এভাবে সাংবাদিকতাই হয়ে উঠল আমার পেশা। একসময়, অনার্স সম্পন্ন করার ঠায় ১৩ বছর পর, বিশেষ ব্যবস্থায় ভর্তি হলাম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে, মাস্টার্সে। নিয়মিত ছাত্রদের সাথে পরীক্ষা দিয়ে এবং প্রতিযোগিতা করে আমি প্রথম শ্রেণিতে প্রথম স্থান অর্জন করলাম। সবাই খুব অবাক হয়েছিলেন। কারণ একে তো পড়াশোনা দীর্ঘ বিরতি, তার ওপর আমি তখন একসাথে তিনটা চাকরি করি।

আসলে এর পেছনে ছিল আমার একটা জেদ। মাস্টার্স করি নি বলে যারা চাকরিতে আমার পদোন্নতি আটকে রেখেছিল, তারা দেখুক আমি কী পারি! আসলে আমার জীবনে আঘাত, উপেক্ষা, অপমানগুলোর কাছে আমি ভীষণ ঋণী। যা আমাকে এগিয়ে যাওয়ার প্রেরণা যুগিয়েছে সবসময়।

কেউ আঘাত পেয়ে আত্মহত্যা কিংবা ধ্বংসের পথ বেছে নেয়। একই আঘাতে কেউ জেদের বশে জীবনকে আরো বিকশিত করে। আরো আত্মপ্রত্যয়ী ও আত্মবিশ্বাসী হয়ে ওঠে। আমি তা-ই করতে চেয়েছি।

এ বিশ্বাসেরই অনুরণন আমি অনুভব করলাম কোয়ান্টাম মেথড কোর্সে এসে। চারটি দিন মন্ত্রমুগ্ধের মতো এখানে কাটিয়ে মনে হয়েছে, এ সত্যিই এক আনন্দজগত!

গুরুজী কী এক অভূতপূর্ব জাগরণ ঘটান চারপাশের মানুষের মধ্যে। স্বাধীনতা দিবসে কোয়ান্টাম কসমো স্কুলের শিক্ষার্থীরা ঢাকা স্টেডিয়ামে যে নৈপুণ্য প্রদর্শন করল, তা সবাই দেখেছে টিভিতে কিংবা ভিডিও-তে। পেশাগত দায়িত্বের কারণে আমার সেটি দেখার সৌভাগ্য হয়েছে মাঠে বসে, খুব কাছ থেকে।

দেখেছি, কী গভীর প্রত্যয়, বিশ্বাস আর উদ্যম ওদের চোখেমুখে, দেহভঙ্গিতে। দেশের খ্যাতিনামা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর সাথে প্রতিযোগিতা করে দুর্গম অঞ্চলের এই শিশুরাই দৃষ্ট পদক্ষেপে প্রথম স্থান অধিকার করে নিল!

আমি বিশ্বাস করি, সুশৃঙ্খল বিকাশের পাশাপাশি মেডিটেশনের নিম্নগুতাই ওদের দিয়েছে এমন গভীর প্রত্যয় আর বিশ্বাস। জীবনের যে-কোনো পর্যায়ে, যে-কোনো অর্জনের জন্যে চাই এ নিম্নগুতা। এটি মানুষের ইচ্ছাশক্তিকে জাগিয়ে তোলে।

আধুনিক বিজ্ঞানের যত আবিষ্কার, সেটি এসেছে এ নিম্নগুতার পথ ধরেই। কোরআনও তা-ই। রসুল (স) লোকালয় ছেড়ে হেরা পাহাড়ে কেন গেলেন? গিয়েছিলেন একটা নৈশদময় জগতের সন্ধানে, যেখানে তিনি এক গভীরতর নিম্নগুতায় স্রষ্টার বাণী অনুধাবন করতে পেরেছিলেন।

সুফিরাও এই আত্মনিম্নগুতার কথা বলেছেন। সুফিজম নিয়ে আমি কিছু পড়াশোনা করেছি। এর শাস্ত্রত কল্যাণকর শিক্ষাগুলোই ভিন্ন আঙ্গিকে এবং আধুনিক ভাষায় ও বিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে গুরুজী আমাদের বলছেন। এটি মানবসভ্যতাকে জাগিয়ে দেয়ার কাজ।

জীবনের শুরু থেকে আমি একজন আত্মপ্রত্যয়ী মানুষ হলেও মাঝখানে স্পন্ডাইলাইটিস, লিভার সিরোসিস এবং পর পর তিন বার হার্ট অ্যাটাকে মানসিক শক্তি কিছুটা হারিয়ে ফেলেছিলাম। কোয়ান্টাম মেথড কোর্সে এসে সেই শক্তিটা আমি আবার ফিরে পেলাম। আমার জন্যে এ এক অসাধারণ অভিজ্ঞতা! প্রতিটা মুহূর্ত আমি এখানে উপভোগ করেছি।

কোয়ান্টাম মেথডকে আরো ছড়িয়ে দেয়ার লক্ষ্যে ইংরেজি, ফরাসি-সহ বিশ্বের প্রধান প্রধান ভাষায় এ কথাগুলো অনূদিত হওয়া প্রয়োজন বলে আমি মনে করি। তাতে পৃথিবীজুড়ে আরো বেশি মানুষ এ থেকে কল্যাণ ও নিরাময় লাভ করতে পারবে। আর গুরুজীর এ শিক্ষাকে কাজে লাগিয়ে দেশের ১৭ কোটি মানুষকে মানবসম্পদে রূপান্তর করা সম্ভব।

সাক্ষাৎকার গ্রহণ ও অনুলিখন : ডা. আতাউর রহমান

দুই চিরতরুণের গল্প ॥ সুস্থ জীবন-অভ্যাসে কর্মময় দীর্ঘ জীবন

বার্ধক্য শুরু হয় ঠিক কত বছর বয়সে? ৫০ পেরোলেই অবচেতনে কেউ হয়তো নিরানন্দ অবসর যাপনের প্রস্তুতি শুরু করে দেন। কেউ-বা আবার ৮০ পেরিয়েও দেহে-মনে-প্রাণে ছন্দময় থাকেন একজন তরুণের মতোই। উচ্ছ্বসিত থাকেন তারুণ্যের প্রাণস্পন্দনে। অশীতিপর এস এম হাবিবুর রহমান এবং আশি ছুই ছুই তৈয়বুর রহমান কোয়ান্টাম পরিবারের এমনই দুজন নিয়মিত সদস্য ও সপ্রাণ উদ্যমী কর্মী। নিরন্তর কর্মচাঞ্চল্যময় জীবনযাপনের মধ্য দিয়ে তারা আমাদের সামনে আবারো প্রতিষ্ঠিত করেছেন চিকিৎসাবিজ্ঞানের সাম্প্রতিক ধারণাটিকেই-বহুর গুণিততে কেউ বুড়ো হয়ে যায় না আর তারুণ্যকেও বাঁধা যায় না বয়সের ফ্রেমে। বরং সঠিক জীবনদৃষ্টি ও সুস্থ জীবনচার অনুসরণের পথ ধরেই একজন মানুষ লাভ করতে পারে কর্মব্যস্ত ও আনন্দময় দীর্ঘজীবন। গুনুন এই দুই চিরতরুণের গল্প।

কোয়ান্টাম আমার তারুণ্যের উৎস

এস এম হাবিবুর রহমান

১৯৯২ সালে সরকারি চাকরি থেকে অবসর নেন এস এম হাবিবুর রহমান। বছর কয়েক পরেই তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। চিকিৎসক জানান, তার হৃৎপিণ্ডের একটি ভালভ অকেজো হয়ে গেছে। চলৎশক্তি হারিয়ে ফেললেন। কোলে করে তাকে বাসা থেকে নামাতে হতো। একপর্যায়ে পুরোপুরি শয্যাশায়ী হয়ে পড়লেন। প্রতিটি কাজেই তাকে তখন নির্ভর করতে হতো অন্যের সাহায্যের ওপর।

নানান ঘটনাপরম্পরায় একসময় তার মনে হলো, ‘রোগী’ পরিচয়ে এই গ্লানিময় জীবন আর চলতে পারে না। বাঁচতে হবে সুস্থ স্বাভাবিক একজন আত্মনির্ভরশীল মানুষের মতো। কারণ, মনেপ্রাণে তিনি এখনো ফুরিয়ে যান নি। এমন ভাবনা থেকেই আত্মবিশ্বাস জন্মাল যে, তিনি সুস্থ হবেন।

ছোট ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে ব্যঙ্গালোর গেলেন চিকিৎসার উদ্দেশ্যে। অপারেশন হলো। জটিল সেই অপারেশনের পর তার দৃঢ় মনোবল আর দ্রুত আরোগ্যলাভ দেখে চিকিৎসকরাও বিস্মিত হলেন! সেই থেকে আজ এই ৮১ বছরেও তিনি একজন তরুণের মতোই গতিময়। একজন পূর্ণ সুস্থ মানুষ।

হাবিবুর রহমানের জন্ম ১৯৩৪ সালে। কর্মজীবনের শুরুতে তিনি এ উপমহাদেশে পল্লী উন্নয়নের প্রবাদপুরুষ ও বার্ড-এর (BARD) প্রতিষ্ঠাতা আখতার হামিদ খানের সংস্পর্শে আসার সুযোগ লাভ করেছিলেন। মেধা, কঠোর পরিশ্রম আর

সততার কারণে খুব দ্রুত তার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এবং গুরুত্বপূর্ণ অনেক দায়িত্ব পালনের সুযোগ পান। তিনি বরাবরই বিশ্বাস করে এসেছেন যে, দায়িত্বের প্রতি সং থাকলে স্রষ্টা নিশ্চয়ই উত্তম প্রতিদান দেবেন।

হাবিবুর রহমান সবসময় নিজের সামর্থ্যমতো মানুষের সেবা করার চেষ্টা করেছেন। তার বিশ্বাস, এর প্রতিদানই স্রষ্টা তাকে দিয়েছেন কোয়ান্টাম নিয়ে এসে। ২০১১ সালে ৩২৭ ব্যাচে তিনি কোয়ান্টাম মেথড কোর্সে অংশ নেন। সেই শুরু। তারপর একে একে ফাউন্ডেশনের অন্যান্য সহকার্যক্রম এবং পরবর্তীতে উচ্চতর প্রোগ্রামও সম্পন্ন করেন।

গুরুজীর পরিচালনায় ফাউন্ডেশনের প্রতিটি অনুষ্ঠান এবং কোয়ান্টামের সব ধরনের কার্যক্রমে তার সপ্রতিভ উপস্থিতি এখন নিয়মিত ঘটনা। অনুষ্ঠান শুরু হওয়ার কথা সকাল ৯টায়, তিনি চলে আসেন সকাল ৭টায়।

এ বয়সেও তিনি সাধ্যমতো অনুসরণ করেন কোয়ান্টাম খাদ্যাভ্যাস ও সুস্থ জীবনচার। তার দিন শুরু হয় ভোর চারটায়। প্রতিদিন ভোরে হাঁটেন। নিয়মিত মেডিটেশন এবং হাঁটার অভ্যাসটাই এই বয়সেও তার সুস্থ থাকাটা অনেক সহজ করে দিয়েছে বলে তার ধারণা। এখনো তিনি চলাফেরা করেন বাসে চড়ে এবং কারো সাহায্য ছাড়াই।

ভোরে হাঁটতে বেরিয়ে পথে কিংবা পার্কে ছোট-



বড় যার সাথেই দেখা হোক, তাকে আগে সালাম দেন কোয়ান্টাম পরিবারের এই বর্ষীয়ান সদস্য। কিছুটা পরিচয় হতেই নিঃসংকোচে বলেন, ‘কোয়ান্টামে আসুন। আপনিও আমার মতো সুস্থ থাকবেন’। তার তারুণ্যময় জীবনযাত্রা দেখে অনেকেই উদ্ভুদ্ধ হয়েছেন কোয়ান্টামের প্রতি এবং কোর্সে অংশ নিয়েছেন, যেমনটা ঘটেছিল তার বেলাতেও। বছর চারেক আগে ভোরে হাঁটার সঙ্গীদের একজনের অনুপ্রেরণাতেই তিনি কোয়ান্টামে এসেছিলেন।

তিনি বিশ্বাস করেন, কোয়ান্টাম চেতনার কল্যাণবাণী ছড়িয়ে দেয়ার যে কাজটি তিনি করে যাচ্ছেন, তার শারীরিক সুস্থতা এরই প্রতিদান। সেইসাথে কোয়ান্টাম পরিবারের সবার দোয়া ও ভালবাসা তাকে যোগায় ভালো থাকার শক্তি।

অবসরের পর হয়ে উঠেছি আরো কর্মব্যস্ত

ইঞ্জিনিয়ার তৈয়বুর রহমান



সরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে ৩৪ বছর সুনামের সাথে চাকরি করেছেন তিনি। অতঃপর ১৯৯৪ সালে বাংলাদেশ কেমিকেল ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশনের (বিসিআইসি) ম্যানেজিং ডিরেক্টর হিসেবে অবসর গ্রহণ করেন। সফল পেশাজীবন নিঃসন্দেহে। গল্পটা শেষ হতে পারত এখানেই। কিন্তু গল্পটা যে ইঞ্জিনিয়ার তৈয়বুর রহমানের, বয়স এখন যার ৭৮। অন্যরকম গল্পের শুরুটা তাই এখান থেকেই।

অন্য আর দশজনের মতো অবসরের পর ঝিমিয়ে পড়েন নি তৈয়বুর রহমান; বরং আরো কর্মব্যস্ত ও উদ্যমী হয়ে উঠেছেন। বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান ও প্রকল্পে উর্ধ্বতন কর্মকর্তা কিংবা উপদেষ্টা হিসেবে কাজ করছেন গত ২১ বছর ধরে। একটি দিনের জন্যেও তাকে কর্মহীন থাকতে হয় নি। বর্তমানে তিনি ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন অব বাংলাদেশ (আইইবি)-এর ইন্সটিটিউশাল সেক্রেটারি বোর্ডের সচিব এবং একই প্রতিষ্ঠানের কেন্দ্রীয় কাউন্সিলের সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। সম্প্রতি বিদেশ থেকে সার আমদানি হ্রাস করার উদ্দেশ্যে তিনি সাভারে একটি মিশ্র সার কারখানা স্থাপনের উদ্যোগ নিয়েছেন।

জীবনের শুরু থেকে তৈয়বুর রহমান একজন কর্মোদ্যমী মানুষ। ১৯৬০ সালে জাপানে উচ্চতর প্রশিক্ষণ গ্রহণকালে তরুণ এই প্রকৌশলী লক্ষ করেন, সে দেশের শিল্প কারখানাগুলোতে সম্ভাব্য যে-কোনো দুর্ঘটনা প্রতিরোধে উন্নত নিরাপত্তা পরিকল্পনা রয়েছে। অর্থাৎ তখন পর্যন্ত আমাদের দেশে এসব ব্যাপারে ন্যূনতম প্রস্তুতি তো দূরের কথা, কোনো ধরনের নিরাপত্তা নীতিমালাই ছিল না। দেশে ফিরে তিনি অকুপেশনাল সেক্রেটারি বোর্ড গঠনের জন্যে সরকারের কাছে সুপারিশ করেন। অবশেষে ১৯৭০

সালে তৎকালীন সরকার তার প্রস্তাব গ্রহণ করে এবং তিনি ন্যাশনাল সেক্রেটারি কাউন্সিলের প্রতিষ্ঠাতা-সচিব পদে নিয়োগ লাভ করেন। শিল্প কারখানা নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে দীর্ঘ পাঁচ দশকের অভিজ্ঞতা তাকে এক্ষেত্রে দেশের একজন শীর্ষস্থানীয় ও প্রথমসারির বিশেষজ্ঞে পরিণত করেছে।

১৯৩৭ সালে জন্ম নেয়া তৈয়বুর রহমানের বয়স এখন ৭৮, কিন্তু এখনো যে-কোনো কাজে তিনি তারুণ্যের উদ্দীপনা নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েন। তিনি মনে করেন, এ বয়সেও তার সুস্থতা আর বহুমুখী কর্মোদ্যমের নেপথ্যে কোয়ান্টাম মেথডের রয়েছে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা।

আইআইবি-র একজন সতীর্থ-সদস্যের অনুপ্রেরণায় তিনি ২০১০ সালে কোয়ান্টাম মেথড ৩০৯ ব্যাচে অংশগ্রহণ করেন। এরপর থেকে প্রতিটি কোর্সে রিজুভিনেশন, জালালি, আলোকায়ন, সাদাকায়নসহ সব কার্যক্রমে তার সহাস্য উপস্থিতি প্রায় অনিবার্য।

ফাউন্ডেশনের হৃদরোগ প্রতিরোধ ও নিরাময় কার্যক্রম ‘কোয়ান্টাম হার্ট ক্লাব’-এরও তিনি একজন সক্রিয় সদস্য। মেডিটেশন ও নিত্যদিন হাঁটার পাশাপাশি সর্বতোভাবে অনুসরণ করেন সুস্থ জীবন-অভ্যাস। তাই-তো তিন-চারতলা পর্যন্ত ওঠানামার জন্যে এখনো লিফটে চড়েন না তিনি, স্বচ্ছন্দে সিঁড়ি ব্যবহার করেন। আর স্বপ্ন দেখেন মানুষের জন্যে আরো আরো কাজ করার। করেন নতুন নতুন কর্মপরিকল্পনা।

ভালো-মন্দের ব্যাপারে সে এখন নিজেই সচেতন

আমার নাতি ক্লাস এইটে পড়ার সময় কুসঙ্গে পড়ে আবাধ্য হতে শুরু করে। মা-বাবার সাথে সম্পর্কের অবনতি ঘটছিল। পড়ালেখাতেও হয়ে পড়ছিল অমনোযোগী। পরিবারের সবাই ওর জন্যে খুব দুশ্চিন্তা করত। তখন আমি প্রতি জালালিতে নাতির জন্যে সদকা হিলিংয়ে নাম দিয়েছি। আল্লাহ তায়ালার রহমতে ধীরে ধীরে তার মধ্যে পরিবর্তন আসতে লাগল। পড়ালেখায় মনোযোগী হলো। এখন সে ক্লাসে ভালো ফলাফল করছে এবং ভালো-মন্দের বিষয়ে সে নিজেই সচেতন হয়ে উঠছে।

[রওনক পারভীন, গৃহিণী]

মা এখন ভালো আছেন

২০১১ সালে আমার মায়ের ইউরিনারি র্লাডারে ক্যান্সার ধরা পড়ে। ডাক্তার বলেন, ক্যান্সারটা ফাইনাল স্টেজ-এ চলে গেছে। তখন আমরা নিয়মিত হিলিংয়ে নাম দিতে থাকি। একপর্যায়ে অপারেশন করতে হলো। অপারেশন পরবর্তী সময়ে যে ধরনের জটিলতা হওয়ার কথা, সেগুলো প্রায় কিছুই হলো না। আমার মা খুব দ্রুত স্বাভাবিক কর্মময় জীবনে ফিরে এলেন। এখন তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ এবং স্বাভাবিক কর্মোদ্যমী মানুষের মতো চাকরি করছেন, সংসারের কাজকর্ম করছেন এবং ভালো আছেন।

[খন্দকার জাহিদুল ইসলাম, শিক্ষার্থী]

মিথ্যা মামলা থেকে মুক্তি পেল ছোট ভাই

একটি মিথ্যা চাঁদাবাজির মামলায় আমার ছোট ভাইয়ের দুই বছরের কারাদণ্ড হয়। ছয় মাস পর উচ্চ আদালতে আপিল করা হলে মামলা চলতে থাকে কিন্তু প্রশাসনিক জটিলতার কারণে মামলাটি নয় বছর ধরে ঝুলে থাকে। কোনোভাবেই সমাধান খুঁজে পাচ্ছিলাম না আমরা।

এরপর সদকা হিলিংয়ে নাম দেই এবং বিশেষ নিয়তে মাটির ব্যাংকে দান করি। নিয়মিত হিলিং চলতে থাকে এবং এক বছরের মধ্যে আমার ছোট ভাই চাঁদাবাজির মামলা থেকে বেকসুর খালাস পায়। শোকর আলহামদুলিল্লাহ!

[মো. সাইদুল ইসলাম সন্টু, সরকারি চাকরিজীবী]

ছেলের চাকরিটা হয়ে গেল

ছেলের চাকরির জন্যে সবসময় সদকা হিলিংয়ে নাম দিয়ে রাখতাম এবং নিজেও হিলিং করতাম। পড়ালেখা শেষ করে আমার ছেলে সরকারি চাকরির জন্যে আবেদন করল। লিখিত পরীক্ষাসহ প্রতিটি ধাপ সফলভাবে পেরিয়ে গেলেও সবশেষে মৌখিক পরীক্ষা নিয়ে সবাই খুব দুশ্চিন্তায় ছিলাম। তখন নিয়মিত সদকা হিলিংয়ে নাম দিয়েছি। যেদিন চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ হলো, দেখা গেল, সে উত্তীর্ণ হয়েছে। আমার স্বামীর খুব ইচ্ছা ছিল, তিনি সরকারি চাকরি থেকে অবসর নেয়ার আগেই যেন ছেলের চাকরি হয়। আল্লাহর অশেষ রহমতে তার সেই ইচ্ছা সুন্দরভাবে পূরণ হয়েছে।

[নাসরীন জাহান, গৃহিণী]

মেয়েটি নিরাপদে বাড়ি পৌঁছেছে

লামা কোয়ান্টায়নে যাওয়ার জন্যে সব প্রস্তুতি সম্পন্ন করেছি। যাওয়ার আগের দিনই হঠাৎ আমাদের গৃহকর্মী মেয়েটা হারিয়ে গেল। মনে ভীষণ অশান্তি আর নানা দুশ্চিন্তা নিয়ে কোয়ান্টায়নে রওনা হলাম। লামায় সদকা হিলিংয়ে নাম দিলাম। কোয়ান্টায়ন সম্পন্ন হওয়ার পর বাসা থেকে ফোন পেলাম এবং জানলাম, মেয়েটি তার বাবা-মার কাছে নিরাপদে পৌঁছে গেছে।

[মো. তসলিম উদ্দীন, ব্যবসায়ী]

আঙুল আর কাটতে হয় নি

গত বছর বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে আমার বাম হাতের তিনটি আঙুল ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ডাক্তার বললেন তর্জনী ও বৃদ্ধাঙ্গুলি কেটে ফেলতে হবে। হিলিংয়ে নাম দেয়া হলো। কিছুদিন পর দেখা গেল, ডাক্তার তার সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করেছেন। আমার তর্জনী ও বৃদ্ধাঙ্গুলি দুটো সে-যাত্রায় আর কেটে ফেলতে হয় নি।

এ বছরের ফেব্রুয়ারিতে এক্সরে-তে দেখা গেল, বৃদ্ধাঙ্গুলির ওপরের হাড়টা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং ডাক্তার বললেন, অর্ধেকটা কেটে ফেলতে হতে পারে। আমি আরো একজন বিশেষজ্ঞের মতামত নিই, তিনিও একই কথা বলেন। পরবর্তীতে লামায় গিয়ে নিজে হিলিং করি এবং সদকা হিলিংয়ে নাম দেই। ফিরে এসে ডাক্তার দেখালাম। তিনি বললেন, আমার বৃদ্ধাঙ্গুলি আগের চেয়ে অনেক ভালো আছে। আঙুলটা আর কাটতে হবে না।

[তাসনিম আনোয়ার, শিক্ষার্থী]

বিস্ময়কর নিরাময় কোয়ান্টাম সদকা হিলিং

নিরাময়ের এক শাস্ত্রত কার্যকর প্রক্রিয়া হচ্ছে কোয়ান্টাম সদকা হিলিং। এতে রয়েছে রোগ-ব্যাদি ও বালা-মুসিবত মুক্তিতে বিশ্বাস মনছবি প্রার্থনা ও সদকার এক অনন্য আত্মিক সম্মিলন। গত ১৬ বছরে লক্ষ লক্ষ মানুষ এ প্রক্রিয়ার সাথে যুক্ত হয়ে রোগ-ব্যাদি, বালা-মুসিবত থেকে মুক্ত হয়েছেন। ২০১৪ সালে সারা দেশে ৫,৩৩,১৬৫টি সদকা হিলিং সম্পন্ন হয়। নানাবিধ জটিল সমস্যার সমাধানে ও সাফল্যের জন্যে হাজারো মানুষ কখনো একবারের জন্যে, কখনো ৪০ বারের জন্যে, কখনো বা সারা বছরের জন্যে নাম দিয়েছেন এবং করণাময়ের অনুগ্রহে নিরাময় লাভ করেছেন। সদকার গুরুত্ব বোঝাতে গিয়ে নবীজী (স)

টাকা ফেরত পেলাম সহজেই

১৯৯০ সালে সাভারে আমাদের একটি জমি কেনা হয়। তিন লক্ষ টাকা দিয়ে পাঁচ কাঠা পরিমাণ কমাশিয়াল স্পেস। আমরা সেই জমি বা টাকা কোনোটাই পাচ্ছিলাম না। পরে ঢাকায় বাড়ি তৈরির সময় টাকার খুব প্রয়োজন হয়। আর্থিক সমৃদ্ধি ও সার্বিক কল্যাণের জন্যে নিয়মিত সদকা হিলিংয়ে নাম দিতে থাকি এবং নিজেও হিলিং করতে শুরু করি।

এর মধ্যে একদিন আমাদের একজন ভাড়টিয়া বাসায় এলেন। তিনি আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীতে কর্মরত। কথাপ্রসঙ্গে আমাদের সাভারের সেই জমিটার ব্যাপারে তিনি জানলেন। পরদিন বিকেলেই তিনি (ভাড়াটিয়া) আমাদের জমির সব কাগজপত্র নিয়ে ধানমণ্ডির একটা ঠিকানায় যেতে বললেন। গিয়ে দেখি, এটা সেই রিয়েল এস্টেট কোম্পানির অফিস, যাদের কাছ থেকে আমরা জমি কিনেছিলাম। তিনটি চেকের মাধ্যমে তৎক্ষণাৎ আমাদের জমির টাকাটা ফেরত পেলাম। অথচ এই টাকার জন্যে বিভিন্ভাবে অনেক চেষ্টা করেছি কিন্তু কিছুতেই কিছু হচ্ছিল না। সদকা হিলিংয়ের মাধ্যমে আল্লাহ কত সহজেই না এর সমাধান করে দিলেন!

[তাহমিনা খানম, গৃহিণী]

আপনার করণীয়

- ফাউন্ডেশনে নিয়মিত যৌথ হিলিং অনুষ্ঠিত হয়। হিলিং স্লিপ/ কার্ডে যে-কেউ নিরাময়প্রার্থীর নাম, ঠিকানা ও সমস্যা উল্লেখ করে জমা দিতে পারেন।
- প্রতি মাসে প্রজ্ঞা জালালি ও সজ্ঞা জালালিতে অনুষ্ঠিত হয় বিশেষ হিলিং। এ বিশেষ যৌথ হিলিংয়ে আগেই নাম দিন।
- প্রত্যেক রমজানে প্রতিদিন হিলিং এবং আখেরি দোয়ায় বিশেষ হিলিং অনুষ্ঠিত হয়।
- যে-কোনো বালা-মুসিবত থেকে মুক্তি পেতে একবার থেকে শুরু করে যতবার খুশি এমনকি সারা বছরের জন্যেও আপনি হিলিংয়ে নাম দিতে পারেন।

কোয়ান্টাম সদকা হিলিংয়ের মূল অনুঘটক হচ্ছে সদকা। প্রতিবারের জন্যে ন্যূনতম সদকা ৪০ টাকা করে দেয়া উচিত। আর যত বেশি বেশি সদকা দেবেন নিরাময় প্রক্রিয়া তত বেগবান হবে।

বলেছেন ‘সদকা অকল্যাণের ৭০টি দরজা বন্ধ করে দেয়।’ ‘তোমরা অভাব ও বালা-মুসিবত দূরে সদকা দাও।’ ‘তোমরা রোগমুক্তির জন্যে সদকা দাও।’ সকল মহামানবই রোগমুক্তির জন্যে প্রার্থনা করতেন। হযরত ঈসা (আ)-এর নিরাময়ের প্রার্থনা সাথে সাথে কবুল হওয়ার অসংখ্য দৃষ্টান্ত রয়েছে। মহামতি বুদ্ধ বলেছেন, প্রার্থনা দেহকে ব্যাধিমুক্ত করে। ঋগবেদে রোগ-ব্যাদি ও পঙ্কুত্ব থেকে মুক্ত থাকার জন্যে প্রার্থনাকে বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়েছে।

প্রার্থনা ও দানের এই শক্তির সাথে কোয়ান্টাম সদকা হিলিংয়ে যুক্ত হয়েছে যৌথ মেডিটেশন বা ধ্যানের সমর্ম্মী অনুরণন।

পোড়া ক্ষত ভালো হয়ে গেল

আমার ছোট ছেলের বয়স তখন ১৩/১৪ মাস। একদিন সকালে সে ফুটন্ত গরম পানির মধ্যে পা দিয়ে বসে, ফলে তার পায়ের গোড়ালির ওপর পর্যন্ত পুড়ে যায়। যদিও ডাক্তার বলছিলেন হাসপাতালে কিছুদিন রাখতে কিন্তু আমি দুই ঘন্টা পর হাসপাতাল থেকে বাসায় নিয়ে আসি আমার এক ডাক্তার ভাইয়ের পরামর্শে। ওর জন্যে সদকা হিলিংয়ে নাম দিলাম সেদিনই। রাতে সে বেশ কান্নাকাটি করল, কারণ তার কষ্ট হচ্ছিল। সারারাত ঘুমাতে পারলাম না। কিন্তু আল্লাহর রহমতে পরের দিন থেকে সে আগের চেয়ে অনেক ভালো বোধ করতে শুরু করল। একদিন রাতে আবার সে কান্নাকাটি করতে লাগল। বুঝতে পারছিলাম তার অনেক কষ্ট হচ্ছে। হঠাৎ মনে হলো, আমার দেয়া হিলিংয়ের মেয়াদ গতকালই মাত্র শেষ হয়েছে। আমি আবার ছুটলাম হিলিংয়ে নাম দিতে। শোকর আলহামদুলিল্লাহ! এর সপ্তাহ তিনেক পরে আমার ছেলে আবার আগের মতো সুস্থ স্বাভাবিক হয়ে উঠল। আগের মতোই খেলাধুলা করতে লাগল।

[এ.টি.এম. বদরুদ্দোজা, চাকরিজীবী]

সন্তানরা এখন পড়াশোনায় ভালো করছে

আমার বড় ছেলের বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষার প্রস্তুতি ভালো ছিল। কিন্তু অনেক ছেলেমেয়েই ভালো রেজাল্ট থাকা সত্ত্বেও বিশ্ববিদ্যালয়ে সুযোগ পাচ্ছে না দেখে আমরা কিছুটা শঙ্কিত হয়ে পড়ি। বিশ্বাস নিয়ে হিলিংয়ে নাম দেই। স্ট্রটার কৃপায় আমার বড় ছেলে বর্তমানে পটুয়াখালি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ালেখা করছে। আর ছোট ছেলে পড়ছে বরিশাল জিলা স্কুলে। মেধাবী হওয়া সত্ত্বেও সে ক্লাসে প্রথম হতে পারত না। সদকা হিলিংয়ে নাম দিলাম এবং লক্ষ করলাম, সে পড়াশোনার ব্যাপারে আরো সচেতন হয়ে উঠছে। সে-বছরই সে ক্লাসে প্রথম হলো এবং পরবর্তী বছরেও তার অবস্থান ধরে রেখেছে।

[রমেশ চন্দ্র দাস, প্রধান শিক্ষক, চরকরনর্জী মাধ্যমিক বিদ্যালয়, বরিশাল সদর]

একের পর এক চাকরির সুযোগ এসেছে

আমার স্বামী প্রায় চার বছর বেকার ছিল। আমি আমার সাধ্যমতো সদকা হিলিংয়ে নাম দিতে শুরু করলাম। কিছুদিন পরই বেশ ভালো একটা কোম্পানিতে তার চাকরি হলো। আজ পর্যন্ত তাকে আর বেকার থাকতে হয় নি। একটা চাকরি করা অবস্থায় অন্য আরেকটি চাকরির সুযোগ এসেছে। এছাড়াও নিয়মিত হিলিংয়ে নাম দেয়ার ফলে পরিবারের সবাইকে নিয়ে আমাদের ভালো থাকার পরিমাণ বেড়েছে।

[হাজেরা ইসলাম নীলা, গৃহিণী]

আমরা ভালো আছি

আমার শরীরে নানা রকমের ব্যথা-বেদনা ছিল। ঘুম হতো না। খুব টেনশন হতো, অনিশ্চয়তায় ভুগতাম। হিলিংয়ে নিয়মিত নাম দিতে শুরু করলাম। আল্লাহর রহমতে আমার সমস্যাগুলো দূর হয়েছে। এছাড়া ছেলেমেয়েদের লেখাপড়ায় উন্নতি হয়েছে। কোয়ান্টাম সদকা হিলিংয়ের ফলে ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবনে আমি নানাভাবে উপকৃত হয়েছি। শুধু নিজেদের জন্যেই নয় অপরের জন্যে সদকা হিলিংয়ে নাম দিয়েও আমি অনেক প্রশান্তি পেয়েছি।

[জাহানারা বেগম, গৃহিণী]

মেয়ে সুস্থ হয়ে উঠল

আমার মেয়ে তখন অন্তঃসত্ত্বা। দুই মাস যাবৎ সে খুব অসুস্থ বোধ করছিল। কিন্তু বাইরে থেকে দেখে তাকে সুস্থ স্বাভাবিকই মনে হয়। ডাক্তারও কোনো অসুখ খুঁজে পেলেন না। আমি সদকা হিলিংয়ে নাম দিলাম তার সুস্থতার নিয়তে। এরপর একদিন তলপেটে প্রচণ্ড ব্যথা নিয়ে আমার মেয়ে বাথরুমে অজ্ঞান হয়ে পড়ল। হাসপাতালে নেয়া হলে ডাক্তার অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে জানালেন, আমার মেয়ের ১০ সপ্তাহের প্রেগনেন্সি ফেলোপিয়ান টিউবসহ বাস্ট করেছে, জরুরি ভিত্তিতে তার অপারেশন করতে হবে। ডাক্তারের কথায় বুঝতে পারলাম অবস্থা আশঙ্কাজনক। শাখায় ফোন করে আমি আবারো হিলিংয়ে নাম দিলাম। অপারেশনের পর আল্লাহর রহমতে কোনোরকম জটিলতা ছাড়াই আমার মেয়ে সুস্থ হয়ে উঠেছে।

[নাফিসা গুলশান, ব্যবসায়ী]

অপারেশন ছাড়াই মা সুস্থ

আমার মা একবার কোষ্ঠকাঠিন্যে আক্রান্ত হলেন, তা খুবই গুরুতর আকার ধারণ করল। কোনোভাবেই নিরাময় হচ্ছিল না। হোমিওপ্যাথি এলোপ্যাথিসহ সব ধরনের চিকিৎসা দিয়েও কোনো কাজ হলো না। মা খুবই কষ্ট পাচ্ছিলেন। বিশেষজ্ঞ ডাক্তার বললেন, অপারেশন লাগবে। মা কান্নাকাটি শুরু করলেন। আমরা সদকা হিলিংয়ে নাম দিলাম। এছাড়া মাটির ব্যাংকেও তার সুস্থতার জন্যে দান করলাম। শোকর আলহামদুলিল্লাহ! অপারেশন ছাড়াই মা পুরোপুরি সুস্থ হয়ে গেলেন।

[মো. আরিফ খান, হোমিওপ্যাথি চিকিৎসক]

পারিশ্রমিক পেলাম নির্বিঘ্নে

আমি আইটি ফ্রি-ল্যান্সার হিসেবে কাজ করতাম। কিছু টেকনিক্যাল সমস্যার কারণে একবার আমার একটি কাজের পুরো পারিশ্রমিক আটকে গেল। টাকার পরিমাণও ভালো ছিল, প্রায় দুই হাজার ডলার। যে প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে টাকা আসার কথা, তারাও কোনো যোগাযোগ করছিল না। বেশ অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়ে গিয়েছিলাম। এরপর কোয়ান্টাম সদকা হিলিংয়ে নাম দেই। কয়েকদিনের মধ্যেই তারা আমার সাথে যোগাযোগ করে এবং নির্বিঘ্নে আমার পারিশ্রমিক পেয়ে যাই।

[মো. শহীদুল্লাহ জুয়েল, ব্যবসায়ী]

৪ কোয়ান্টাম বুলেটিন

কোয়ান্টাম ৫ বুলেটিন

জুন ২০১৫

প্রশ্নোত্তর : গ্রাজুয়েটদের প্রশ্ন ? উত্তর দিচ্ছেন গুরুজী

প্রশ্ন : আমি নিয়মিত ক্লাসে যেতে পারি না। কোয়ান্টামের প্রোগ্রামে উপস্থিত থাকতে পারি না। আমার প্রচণ্ড রাগ, অভিমান ও ঘুমের সমস্যা আছে। আবার ঘুমাতে গেলে মাঝে মাঝে শরীরে জ্বালাপোড়া হয়। এই সমস্যার সমাধান কীভাবে পেতে পারি?

উত্তর : আপনি নিয়মিত মেডিটেশন করবেন, এসব রাগ-অভিমান এমনিতেই চলে যাবে। কোয়ান্টাম মেথড কোর্স রিপট করবেন। কোর্স রিপট করাটা আসলে খুব গুরুত্বপূর্ণ। কোর্সের পর একটা ভালোলাগার অনুভূতি তৈরি হয়, যত রিপট করবেন এটা তত স্থায়ী হতে থাকবে। অনুভূতিটা বাড়তে থাকবে। অতএব কোর্স রিপট করুন। লামায় কোয়ান্টায়ন করুন। এবং নিয়মিত মেডিটেশন করুন। আপনার এই সমস্যাগুলো আর থাকবে না। মনে রাখবেন, আপনার ভেতরের বৃত্ত আপনাকেই ভাঙতে হবে।

নিয়মিত ক্লাস করতে পারেন না, কোয়ান্টামের প্রোগ্রামে আসতে পারেন না—একজন ছাত্রী হয়ে কেন এগুলো পারছেন না? কারণ আপনার শান্তির কোনো ব্যবস্থা নেই। উপযুক্ত শান্তির ব্যবস্থা থাকলে ঠিকই পারতেন। তাই নিজেই নিজের জন্যে শান্তির ব্যবস্থা করুন। কারণ, এই খেয়ালিপনা একজন মানুষের সমস্ত সম্ভাবনাকে নষ্ট করে দেয়। আজকে ইচ্ছে হলো না, মন ভালো না, মেজাজ খারাপ—তাই গেলাম না। এই খেয়ালিপনা থেকে বেরিয়ে আসতে হবে এবং সে উদ্যোগটাও নিতে হবে আপনাকেই।

প্রশ্ন : হিলিংয়ে নাম দিলে আসলে কি কোনো উপকার হয়?

উত্তর : আসলে হিলিং তো সর্বাবস্থায় উপকারী। হিলিংয়ে আপনার শুভকামনা করা হয়, কল্যাণ কামনা করা হয়। শুভকামনার চেয়ে বড় উপকার আর কী হতে পারে? ফাউন্ডেশনে আমরা বলি যে, আমাদের ওপর বিপদ আসতে পারে তুফানের মতো কিন্তু চলে যায় বৃদ্ধবৃদ্ধের মতো। কেন? হাজার হাজার মানুষের দোয়ার ফলে। সেজন্যেই হিলিং অত্যন্ত উপকারী এবং এই হিলিংয়ের সাথে আপনি সদকা দিচ্ছেন, যা বালা-মুসিবত দূর হওয়ার জন্যে খুব গুরুত্বপূর্ণ।

রসুলুল্লাহ (স) বলেছেন, রোগমুক্তির জন্যে তোমরা সদকা দাও। সদকা অমঙ্গলের ৭০টা দরজা বন্ধ করে দেয়। ৭০ মানে হচ্ছে সকল দরজা। শুধু রোগমুক্তি না, মৃত্যু ছাড়া সমস্ত বালা-মুসিবতের দরজা বন্ধ করে এই সদকা।

আর সদকা দেবেন আপনার বামেলার অবস্থা বুঝে। একবারের জন্যে হিলিং দিতে পারেন; ৪০ বারের জন্যে, একশ বারের জন্যে, হাজার বারের জন্যেও দিতে পারেন। কারণ সদকা হচ্ছে নিরাময়ের অনুঘটক। তাই বিপদের অবস্থা বুঝে সদকার পরিমাণ নির্ধারণ করবেন।

সদকাটা আসলে কী? এটা আল্লাহর ওয়াস্তে দান। মানুষের কল্যাণে দান অত্যন্ত শক্তিশালী। অতএব সবসময় হিলিংয়ের জন্যে সদকা দেবেন। সুযোগ থাকলে আপনিও হিলিংয়ে অংশ নেবেন। এছাড়াও যখনই শুনবেন যে, পরিচিত কেউ একটা বামেলায় পড়েছে, কোনো অসুবিধায় পড়েছে, আপনি

মেডিটেশনে তার জন্যে কল্যাণ কামনা করুন। দোয়া করুন। যখনই কমান্ড সেন্টারে যান তার কথা মনে করে হিলিং করুন। আপনার বিপদ-মুক্তির জন্যে এটা একটা অগ্রিম সদকা হয়ে গেল। কারণ অন্যের মঙ্গল কামনা করা, অন্যের জন্যে দোয়া করাও হচ্ছে সদকা।

প্রশ্ন : স্থানীয় মসজিদের হুজুর বলেছেন, সোনার পরিমাণ সাড়ে সাত ভরি না হলে যাকাত দিতে হয় না। আমার পাঁচ ভরি সোনার গয়না আছে। আমার কি যাকাত দিতে হবে?

উত্তর : যাকাতের বিষয়ে বিস্তারিত বিবরণ দেয়া আছে ফাউন্ডেশন থেকে প্রকাশিত যাকাতের ব্রোশিউরে, এটা সংগ্রহ করে পড়ে নেবেন। শুধু সোনা নয়, সোনা-রূপা টাকাপয়সা সবকিছু মিলিয়ে যদি আপনার সম্পদের পরিমাণ যাকাতযোগ্য হয় তাহলেই আপনি যাকাতদাতা হয়ে গেলেন। আপনি কীভাবে, কোন কায়দায় যাকাত দিতে পারেন, সে চেষ্টা করুন। কোন কায়দা করলে যাকাত দিতে না হয়, সে কৌশল করতে যাবেন না। একটি কথা মনে রাখবেন, ফরজ আদায় না করার ফাঁকফোকর খুঁজবেন না, বরং আপনি যাকাতদাতা হওয়ার জন্যে চেষ্টা করুন। আপনার সম্পদের পরিমাণ ইনশাল্লাহ বাড়তে থাকবে। আল্লাহ আপনার সম্পদের পরিমাণ বাড়তে থাকবেন।

আল্লাহ তায়ালা আপনার নিয়তটা দেখছেন—নিয়তটা কি দেয়ার, নাকি না দেয়ার? যখনই না দেয়ার দলে গেলেন, আপনি আল্লাহর রহমত থেকে বঞ্চিত হয়ে গেলেন। আর যখন দেয়ার নিয়ত করলেন, আল্লাহর রহমত আপনার ওপরে বর্ষিত হবে। বাড়বে আপনার ওপর তাঁর বরকত।

প্রশ্ন : আমার ২৯ বছরের জীবনে আমি কিছুই পাই নি। আল্লাহ আমাকে কিছুই দেয় নি। কী জন্যে আমি শুকরিয়া আদায় করব?

উত্তর : প্রথমত, আপনি এখানে এসে প্রশ্ন করতে পারছেন, এজন্যে শুকরিয়া আদায় করবেন। আর আল্লাহ যদি কিছু না-ই দিয়ে থাকেন—ভালো খাবার পাই নি, ভালো জামা পাই নি, এই পাই নি, সেই পাই নি— তাহলে আপনি শুধু চিন্তা করুন যে, ২৯ বছর ধরে আপনি বিনা পয়সায় অক্লিঞ্জন পেয়েছেন। এই ২৯ বছর যদি অক্লিঞ্জন কিনতে হতো আপনাকে!

হাসপাতালে অক্লিঞ্জন সিলিন্ডার থেকে অক্লিঞ্জন নিতে দিনে কত টাকা লাগে? তিন শ টাকা যদি হয় প্রতিদিন, তাহলে একমাসে কত? নয় হাজার টাকা। বছরে একলক্ষ টাকার বেশি। একলক্ষও যদি ধরি, তাহলে ২৯ বছরে ২৯ লক্ষ টাকা। ২৯ লক্ষ টাকার অক্লিঞ্জন আল্লাহ আপনাকে দিয়েছেন ফ্রি। এর জন্যে কোনো পয়সা কেউ কখনো দাবি করে নি, অক্লিঞ্জনের সরবরাহও বন্ধ করে নি। এই যে ২৯ লক্ষ টাকার অক্লিঞ্জন ফ্রি পেয়েছেন, আপনার শ্বাসকষ্ট হয় নি এবং আপনি প্রশ্ন করার জন্যে এখন পর্যন্ত বেঁচে আছেন, এজন্যে শুকরিয়া আদায় করবেন। তা-ও যদি না পারেন শুকরিয়া আদায় করতে, তবে হাসপাতালে যান, শ্বাসকষ্টের রোগীদের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকুন, একটু নিঃশ্বাসের

জন্মে ওদের আকৃতিটা খেয়াল করুন। আপনি শুকরিয়া আদায় করতে পারবেন।

আর আপনি যে বলছেন আপনি কিছুই পান নি, এর কারণ হলো আপনার বিশ্বাসের অভাব। আসলে আমাদের সমস্যাটা কোথায়? আমাদের সমস্যাটা হচ্ছে বিশ্বাসের। তাই আপনার বিশ্বাসটাকে প্রথমে প্রবল করতে হবে যে, হ্যাঁ, আমি পাব, আমিই পারব। অর্থাৎ আপনি যে বিশ্বাসই করুন, সেটা নিখাদ হতে হবে। তখনই আপনি উদ্যোগী হতে পারবেন এবং সেটা পাবেন।

প্রশ্ন : আমি প্রচণ্ড রাগী ছিলাম। রাগের কারণে আমার মেয়েকে ও গৃহকর্মীকে প্রহার করতাম। আমার গৃহকর্মী মেয়েটা তো চলে গেছে। আমি তার কাছে কীভাবে ক্ষমা চাইব? যার সাথে অন্যায় করেছি তার কাছে নাকি ক্ষমা চাইতে হয়। আমি এখন প্রতিনিয়ত অনুশোচনায় ভুগি এবং চোখে জল আসে। কিন্তু তারপরও স্বস্তি পাচ্ছি না। আমি এখন কী করব?

উত্তর : যেহেতু আপনার মধ্যে আন্তরিক অনুশোচনা এসেছে এবং আপনি ক্ষমা চাওয়ার জন্যে যাকে খুঁজছেন সে এ মুহূর্তে নেই, কিন্তু আপনার অন্তর তো আল্লাহ দেখছেন। তাই এখন থেকে তার নামে কিছু সদকা দেবেন। আল্লাহকে বলবেন, এই দানের সমস্ত সওয়াব যাতে ঐ মেয়েটি পায়। যেহেতু তার কাছ থেকে আপনি ক্ষমা চাইতে পারছেন না। আপনি যদি আপনার সাধ্যমতো সদকা দিতে থাকেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমা করবেন। কারণ আল্লাহ ক্ষমাশীল। আর ভবিষ্যতে যেন এই ঘটনার পুনরাবৃত্তি না হয় সে ব্যাপারে সতর্ক থাকবেন।

প্রশ্ন : রমজানে খাবারের কোনো হিসাব দিতে হবে না—কথাটি কি ঠিক?

উত্তর : রমজানে খাবারের কোনো হিসাব দিতে হবে না, এটা মনে করে যদি প্রতিদিন ইফতারের সময় মাত্রাতিরিক্ত খেতে থাকেন, আপনার শরীর কি হিসাব চাইবে না? শরীর ঠিকই হিসাব চাইবে। তা না হলে শত শত রোজাদার হাসপাতালে কেন যাবে?

বছর কয়েক আগে একটা খবর পড়েছিলাম—‘সৌদি আরবে শত শত রোজাদার হাসপাতালে’ কেন? ওরা রোজার সময় দিনে কাজ করে না। সারাদিন ঘুমায়। ইফতারের আগে ঘুম থেকে ওঠে। তারপর ইফতার থেকে খাওয়া শুরু করে এবং সেহরি পর্যন্ত জেগে থাকে এবং সেইসাথে খাওয়াদাওয়া চলতে থাকে সমানে, সারাদিন রোজা রাখতে হবে এই চিন্তায়। তারপর সেহরি খেয়ে আবার ঘুম। এরকম লাগাতার যদি কেউ খেতে থাকে তাহলে তো হাসপাতালে যেতে হবেই। অর্থাৎ ওদের শরীর যেমন হিসাব নিচ্ছে, আপনারও নেবে।

এ মাসের অটোসাজেশন

নিয়মিত দান ভয় দূর করে।
আমি নিয়মিত দান করব।

খুলনা শাখার উদ্যোগে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা করসেবা



১৪ মে কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন খুলনা শাখার উদ্যোগে খুলনা আযম খান কমার্স কলেজে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা করসেবা অনুষ্ঠিত হয়। এ কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন কলেজের অধ্যক্ষ জনাব কালীপদ মজুমদার। প্রায় চার ঘণ্টাব্যাপী এ করসেবায় অংশ নেন ফাউন্ডেশনের ৬২ জন কোয়ান্টিয়ার।

এ কর্মসূচির আওতায় কলেজ ক্যাম্পাস সংলগ্ন ড্রেন, শহীদ মিনার, প্রধান ভবনের পাঁচটি ক্লাসরুম, তিনটি হলরুম, একটি অডিটোরিয়াম, বারান্দা, সিঁড়ি এবং ২২টি টয়লেট পরিষ্কার করেন তারা।

নিকেতন সেল-এ যাকাত বিষয়ক প্রোগ্রাম

৯ মে কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন নিকেতন সেল-এ যাকাত-বিষয়ক একটি বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সন্ধ্যা ৭টা থেকে রাত ৮.৩০ পর্যন্ত পরিচালনা করেন ফাউন্ডেশনের আর্ডেন্টারিয়ার হযরত মাওলানা ছায়ীদুল হক।

এতে যাকাত-বিষয়ক অবিদ্যা ও ভুল ধারণা, সঠিক প্রক্রিয়ায় সম্ভবভাবে যাকাত আদায়ের গুরুত্ব এবং কোয়ান্টাম যাকাত ফান্ডের লক্ষ্য ও কার্যক্রম বিষয়ে আলোচনা করা হয়। এছাড়াও ছিল প্রশ্নোত্তরপর্ব এবং বিশেষ প্রার্থনার মেডিটেশন। সমাপনী আলোচনা করেন নিকেতন সেল-এর আহ্বায়ক শাহনাজ বেগম। এসোসিয়েট, প্রাজুয়েট, প্রো-মাস্টারসহ সর্বমোট ৫৯ জন উপস্থিত ছিলেন।

সেল অর্গানের আয়োজনে কোয়ান্টিয়ার মাসিক কার্যক্রম

১৮ মে কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন সেল অর্গানের আয়োজনে ঢাকার কাকরাইলস্থ কোয়ান্টাম মেডিটেশন হলে অনুষ্ঠিত হলো সেল, প্রি-সেল-এর কোয়ান্টিয়ারদের অংশগ্রহণে বিশেষ কার্যক্রম। এতে কাজ শুরু করার এবং কাজে লেগে থাকার পথে বাধা ও উত্তরণের উপায় বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশনের পরিচালক সমন্বয় মিসেস সুরাইয়া রহমান।

১০ পর্বে সাজানো মাসিক এ সিরিজ কার্যক্রমের নাম *যা চাই তা-ই পাব*। আলোচনা ও মেডিটেশন ছাড়াও এতে থাকে গ্রুপ ডিসকাশন ও প্রেজেন্টেশন। এতে মোট ৫৮ জন কোয়ান্টিয়ার অংশ নেন। কার্যক্রমটি পরিচালনা করেন অর্গানায়ার ইমাম উদ্দীন চৌধুরী।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশেষ শিক্ষার্থী সেমিনার

মানুষের মস্তিষ্ক ও মনের ক্ষমতা অসীম। যথাযথ প্রক্রিয়ায় এ শক্তিকে জাগ্রত ও ব্যবহার করতে পারলে এটি মানুষের চাওয়াগুলোকে স্বতঃস্ফূর্ত পাওয়ায় পরিণত করতে পারে।

১১ মে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় কোয়ান্টাম মেডিটেশন সোসাইটি কর্তৃক আয়োজিত বিশেষ শিক্ষার্থী সেমিনারে এ কথা বলেন অতিথি ও আর্লোচক বৃন্দ। সমাজবিজ্ঞান অনুষদ অডিটোরিয়ামে যা চাই তা-ই পাব, আমি পারি আমি করব শীর্ষক এ শিক্ষার্থী সেমিনারটি শুরু হয় শিক্ষার্থী মনছবি মেডিটেশন-এর মধ্য দিয়ে।

একজন শিক্ষার্থীর মেধা বিকাশে মেডিটেশনের কার্যকারিতা বিষয়ে আলোচনা করেন অর্গানায়ার ফেরদৌসী সুলতানা। নিউরোসায়েন্সের সাম্প্রতিক তথ্য-উপাত্তের আলোকে মস্তিষ্কের ক্ষমতার বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন তিনি।

সভ্যতার বিকাশে ধ্যানের ভূমিকা বিষয়ে আলোচনা করেন ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের সহকারী অধ্যাপক এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টরিয়াল বডির সদস্য ও সহকারী প্রক্টর মো. মোরশেদুল আলম। প্রতিটি সভ্যতার উত্থান, বিকাশ ও বিবর্তন প্রক্রিয়ায় মেডিটেশনের প্রভাব নিয়ে বিশ্লেষণধর্মী আলোচনা উপস্থাপন করেন তিনি।

বাংলার সোনালি অতীত ও সম্ভাবনাময় ভবিষ্যৎ শীর্ষক একটি বিশেষ আলোচনা উপস্থাপন করেন



কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন চট্টগ্রাম সেন্টারের অর্গানায়ার কো-অর্ডিনেশন এস এম সাজ্জাদ হোসেন। তিনি বাংলার সোনালি সমৃদ্ধ অতীতের বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন এবং জাতিগতভাবে একটি নতুন পর্যায়ে যে আমাদের উত্তরণ ঘটতে যাচ্ছে, এ বিষয়ে তিনি আলোকপাত করেন এবং শিক্ষার্থীদের মেধার বিকাশ ও জাতি গঠনে করণীয় দিক-নির্দেশনা দেন।

প্রায় তিন ঘণ্টাব্যাপী এ সেমিনারে সমাপনী বক্তব্য রাখেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় মেডিটেশন সোসাইটির সম্মানিত উপদেষ্টা এবং ভূগোল ও পরিবেশবিদ্যা বিভাগের অধ্যাপক ড. অলক পাল।

আলোচনার পাশাপাশি শিক্ষার্থী বিষয়ক বিশেষ ভিডিও ডকুমেন্টারি প্রদর্শিত হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগের শিক্ষক-শিক্ষার্থীসহ সর্বমোট ৩২০ জন অংশ নেন। সেমিনারে স্বাগত বক্তব্য দেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় কোয়ান্টাম মেডিটেশন সোসাইটির আহ্বায়ক মো. হাবিবুর রহমান।

শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশেষ সেমিনার



২৩ মে সিলেটের শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয় সেলের উদ্যোগে বিশ্ববিদ্যালয়ের মিনি অডিটোরিয়ামে মেডিটেশন বিষয়ক একটি শিক্ষার্থী সেমিনারের আয়োজন করা হয়। সেমিনারে প্রতিপাদ্য ছিল *মনোযোগ ও স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধিতে মেডিটেশন*। এ বিষয়ে আলোচনা করেন কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশনের আর্ডেন্টারিয়ার কাজী শামীম।

মনোযোগায়নের গুরুত্ব, মনোযোগায়নের পথে বাধা ও মনোযোগী হওয়ার উপায় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন তিনি। আলোচনা ছাড়াও ছিল শিক্ষার্থী মনছবির মেডিটেশন। সেমিনারে উপস্থিত ছিলেন মোট ১৬২ জন শিক্ষার্থী।

কোয়ান্টাম আইসিটি-র সাথে যুক্ত হতে আগ্রহীরা নাম, রেজিস্ট্রেশন নম্বর, শিক্ষাগত যোগ্যতা ও পেশা উল্লেখ করে ই-মেইল করুন :
ict@quantummethod.org.bd

আবশ্যিক

কোয়ান্টাম কসমো স্কুল ও কলেজের জন্যে শিক্ষক/শিক্ষিকা/আবাসিক শিক্ষক (ন্যূনতম অনার্স পাশ), বিজ্ঞান বিভাগের জন্যে (পদার্থ বিজ্ঞান, রসায়ন, জীব বিজ্ঞান, উচ্চতর গণিত) শিক্ষক/শিক্ষিকা আবশ্যিক। বিএড ও নিবন্ধনকৃত প্রার্থীরা অধাধিকার পাবেন। শিশুকানন ও শিশুসদনের শিক্ষার্থীদের দেখাশোনার জন্যে ব্রাদার, সিস্টার (ন্যূনতম এসএসসি পাশ) ও সিকিউরিটি গার্ড আবশ্যিক। এছাড়াও কোয়ান্টাম-এর জন্যে কিছু সংখ্যক মালি, মাঠকর্মী প্রয়োজন। আগ্রহীরা যোগাযোগ করুন :

কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন

৩১/তি শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদীন সড়ক,
শান্তিনগর, ঢাকা-১২১৭
ফোন : ৯৩৪১৪৪১, ০১৭১৪-৯৭৪৩৩৩

সিলেট, রাজশাহী ও চট্টগ্রামে অনুষ্ঠিত ধ্যানসন্ধ্যায় গুরুজী

সুস্থ জীবনদৃষ্টি ও নিয়মিত দান প্রশান্তিকে স্থায়ী করে



রাজশাহী মেডিকেল কলেজ মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত ধ্যানসন্ধ্যায় অংশগ্রহণকারীদের একাংশ

কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন সিলেট, রাজশাহী ও চট্টগ্রাম সেন্টারের আয়োজনে গুরুজীর পরিচালনায় অনুষ্ঠিত হলো বিশেষ ধ্যানসন্ধ্যা। ৭ মে সিলেট (সানরাইজ কমিউনিটি সেন্টার), ১৩ মে রাজশাহী (মেডিকেল কলেজ মিলনায়তন) এবং ২৭ মে চট্টগ্রামে (ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন মিলনায়তন) অনুষ্ঠিত তিন ঘণ্টাব্যাপী এ কার্যক্রমে প্রাজুয়েট, প্রো-মাস্টারদের উদ্দেশ্যে গুরুজী শহীদ আল বোখারী মহাজাতক বিভিন্ন দিক-নির্দেশনামূলক আলোচনা করেন।

গুরুজী বলেন, মেডিটেশনের প্রথম প্রাপ্তি হচ্ছে প্রশান্তি আর এই প্রশান্তি হলো জীবনের একক। এই প্রশান্তিকে স্থায়ী করার জন্যে চাই প্রো-একটিভ বা ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি অর্থাৎ সুস্থ জীবনদৃষ্টি। সহজ ভাষায় যাকে আমরা বলতে পারি শোকরগোজারি দৃষ্টিভঙ্গি। আপনি যদি সুস্থ জীবনদৃষ্টি গ্রহণ করেন, আপনি সুস্থ থাকবেন, দীর্ঘায়ু হবেন। প্রশান্তি পাবেন। এখন বিজ্ঞানও তা-ই বলছে। সারা পৃথিবীজুড়ে তাই সচেতন মানুষ এখন মেডিটেশনের প্রয়োজনীয়তা

অনুভব করছেন। আর গত ২৩ বছর ধরে এ কথাগুলোই আমরা বলে আসছি।

প্রশান্তিকে স্থায়ী করার আরেকটি উপায় হলো দান। গ্রহীতা আর দাতা কখনো এক নন। যত উপার্জনই করুক, ভিক্ষুক সবসময়ই ভিক্ষুক। তাই দাতা হতে হবে, গ্রহীতা নয়। যখনই আপনি অন্যেরটা কেড়ে নিলেন, অন্যকে শোষণের কারণ হলেন, অকল্যাণের কারণ হলেন, আপনি গ্রহীতা হয়ে গেলেন। অন্যদিকে, যখন আপনি অন্যের কল্যাণের কারণ হলেন, আপনি দাতা হলেন। সজ্ঞবদ্ধভাবে দান করা এবং তা দিয়ে প্রকৃত দুস্থ ও বঞ্চিত মানুষের কল্যাণ করার বিষয়টিকে শুরু থেকেই ফাউন্ডেশন সুন্দর ও স্বচ্ছভাবে সমন্বয় করার চেষ্টা করেছে।

আমি পারি আমি করব, সারা পৃথিবী আমার-এ কথাগুলো আজ আমরা শুধু নই, চারপাশের অনেকেই ভাবেন, বলেন এবং বিশ্বাস করেন। কোয়ান্টাম আমাদের জাতির সামনে একটা স্বপ্ন দিতে পেরেছে- সম্ভাবনার স্বপ্ন।

বর্তমান সময়ের প্রেক্ষিতে কোয়ান্টাম চেতনার উপযোগিতা ব্যাখ্যা করে গুরুজী বলেন, পুরো জাতি যখন নেতিবাচকতায় আচ্ছন্ন তখন আমরা অনুভব করলাম, এই হতাশা আর নেতিবাচকতা থেকে মুক্তির জন্যে প্রয়োজন একটা অন্তঃজাগরণ। আর এ জাগরণ সম্ভব মেডিটেশন বা আত্মনিমগ্নতার মধ্য দিয়ে। এখানেই কোয়ান্টামের প্রাসঙ্গিকতা।

মানুষ যখন আত্মার সাথে সংযুক্ত হয়, তখনই সম্ভব হয় এই অন্তঃজাগরণ। তখন মাথা ঠান্ডা হয় এবং মস্তিষ্কের বিশাল শক্তিভান্ডারকে ব্যবহার করে আমরা নিজেরাই নিজেদের ভবিষ্যতকে গড়ে নিতে পারি। তাই আমরা অনুভব করলাম যে, উষ্ণ হৃদয়ের সাথে শুধু যদি মাথা ঠান্ডা করতে পারি, তাহলে আমাদের সকল ব্যর্থতাকে সাফল্যে, রোগকে সুস্থতায় আর অশান্তিকে প্রশান্তিতে রূপান্তরিত করতে পারি।

বৈচিত্র্যময় আয়োজনে কোয়ান্টাম আইসিটি



শামীম আহসান



চামপিকা ওয়াজায়তুঙ্গা



সুমন আহমেদ সাবির

২৭ মে প্রথমবারের মতো অনুষ্ঠিত হলো কোয়ান্টাম আইসিটি বিশেষজ্ঞদের বার্ষিক পুনর্মিলনী ২০১৫। বনশ্রী কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত এ প্রোগ্রামে প্রধান অতিথি ছিলেন দেশের স্বনামধন্য তথ্যপ্রযুক্তি উদ্যোক্তা শামীম আহসান। এতে সভাপতিত্ব করেন কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশনের মহাপরিচালক মাদাম নাহার আল বোখারী।

কোয়ান্টাম প্রো-মাস্টার শামীম আহসান পেশাগত জীবনে এখনই ডট কম-এর ম্যানেজিং ডিরেক্টর, প্রাইম মিনিস্টারস ডিজিটাল বাংলাদেশ

টাস্ক ফোর্স-এর সদস্য, এফবিসিসিআই-এর পরিচালক এবং বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব সফটওয়্যার এন্ড ইনফরমেশন সার্ভিসেস (বেসিস)-এর প্রেসিডেন্ট।

অনুষ্ঠানে তিনি বলেন, তথ্যপ্রযুক্তি খাতে প্রশিক্ষণের যে উদ্যোগ কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন নিয়েছে তা অত্যন্ত প্রশংসনীয় ও ইতিবাচক। আমাদের দেশের মোট জনসংখ্যার ৬৫% তরুণ। আমরা যদি এই তরুণ প্রজন্মকে তথ্যপ্রযুক্তিতে দক্ষ করে তুলতে পারি, তাহলে অবশ্যই একদিন উন্নত

বাংলাদেশের মনছবি পূরণ করতে পারব।

২১ মে কোয়ান্টাম আইসিটি মাসিক কার্যক্রমে প্রধান আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন যুক্তরাষ্ট্রের ইন্টারনেট করপোরেশন ফর এসআইন্ড নেইমস এন্ড নামসারস-এ (ICANN) রিজিওনাল সিকিউরিটি, স্ট্যাবিলিটি এন্ড রিসাইলেন্সি এনগেজমেন্ট ম্যানেজার, এশিয়া প্যাসিফিক এবং শ্রীলঙ্কার সফল প্রযুক্তিবিদ চামপিকা ওয়াজায়তুঙ্গা। তিনি বলেন, যে-কোনো প্রতিকূলতা জয় করে একজন মানুষ সাফল্যের শীর্ষে উঠতে পারে, যদি সে পরিশ্রমী হয় এবং কাজে অবিচলভাবে লেগে থাকে।

৩০ এপ্রিল কোয়ান্টাম আইসিটি মাসিক কার্যক্রমে আলোচনা করেন বাংলাদেশের বিশিষ্ট প্রযুক্তিবিদ সুমন আহমেদ সাবির। তিনি বর্তমানে চিফ স্ট্র্যাটেজি অফিসার হিসাবে ফাইবার অ্যাট হোমে কর্মরত আছেন। এছাড়াও তিনি বাংলাদেশ এমেচার রেডিও ল্যাংগুয়েজ-এর প্রেসিডেন্ট, বাংলাদেশ নেটওয়ার্ক অপারেটরস গ্রুপের চেয়ার বোর্ড অব ট্রাস্টি, সাউথ এশিয়ান নেটওয়ার্ক অপারেটরস গ্রুপের কোর কমিটি সদস্য এবং বাংলাদেশ ইন্টারনেট এক্সচেঞ্জ-এর (BDIX) টেকনিক্যাল এডভাইজার হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।

তিনি বলেন, জীবনে যে-কোনো ক্ষেত্রে সাফল্য লাভের জন্যে একটি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যকে সামনে রেখে কাজ করতে হবে।

কোয়ান্টাম বুলেটিন : জুন ২০১৫ ॥ সম্পাদক : কাজী মাহতাব উদ্দিন আহমদ ॥ নাহার আল বোখারী, মহাপরিচালক, কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন কর্তৃক

৩১/ভি শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদীন সড়ক, শান্তিনগর, ঢাকা-১২১৭ থেকে প্রকাশিত ও উইন্ডোজ প্রিন্টিং সেন্টার থেকে মুদ্রিত ॥ শুভেচ্ছা মূল্য - ৫ টাকা

Phone : 9341441, 8319377, 9355756 Mobile : 01714-974333, 01711-671858, 09613-002025 ■ E-mail : bulletin@quantummethod.org.bd

গুরুজী ও মা-জীর সাথে ঈদ মোলাকাতে শরিক হোন

পবিত্র ঈদুল ফিতর উপলক্ষে কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে দেশের ও দেশের বাইরের সকল গ্রাজুয়েট প্রো-মাস্টার এসোসিয়েট ও শুভাকাঙ্ক্ষীকে ঈদের আগাম শুভেচ্ছা জানিয়েছেন গুরুজী এবং মা-জী।

প্রতিবারের মতো এবারো থাকছে ঈদ মোলাকাতে বিশেষ আয়োজন। কাকরাইলস্থ আইডিইবি মিলনায়তনে ঈদের দিন সকাল ১০টা থেকে দুপুর ১টা পর্যন্ত চলবে এ আয়োজন। এতে কোয়ান্টাম পরিবারের সবাইকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন গুরুজী ও মা-জী।

মাটির ব্যাংক করসেবা ১০ ও ১১ জুলাই

রমজানের মাটির ব্যাংক করসেবা অনুষ্ঠিত হবে আগামী ১০ ও ১১ জুলাই। এ করসেবার লক্ষ্যে দেশজুড়ে ফাউন্ডেশনের সেন্টার শাখা সেল প্রিন্সিপালগণ রমজানের শুরু থেকেই গ্রহণ করেছে নানা প্রস্তুতি। ফাউন্ডেশনের কোয়ান্টিয়ার ও আর্ডেন্ট্রিয়াররা এতে অংশ নেবে মাটির ব্যাংক সংগ্রহ ও বিতরণে। আত্মীয় বন্ধু প্রতিবেশী সহকর্মী ও পরিচিতদের মাঝে ইতঃপূর্বে বিতরণকৃত প্রতিটি মাটির ব্যাংক সংগ্রহ এবং নতুন মাটির ব্যাংক পৌঁছে দেয়াই রমজানের এ করসেবার লক্ষ্য।

উল্লেখ্য, ২০১৪ সালে মাটির ব্যাংক থেকে সারা বছরে মোট সংগ্রহ ছিল ১৯ কোটি ১১ লক্ষাধিক টাকা।

অক্টোবরে ২০ তম রিয়েলাইজেশন প্রোগ্রাম

আগ্রহীরা আবেদন করুন

অক্টোবরে দুটি ব্যাচে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে ২০ তম কোয়ান্টাম মেথড রিয়েলাইজেশন প্রোগ্রাম। ঢাকার কাকরাইলস্থ আইডিইবি মিলনায়তনে ১ম ও ২য় ব্যাচ অনুষ্ঠিত হবে যথাক্রমে ৯-১২ অক্টোবর ও ১৬-১৯ অক্টোবর।

ফাউন্ডেশনের সব সেন্টার শাখা সেল-এ রিয়েলাইজেশন প্রোগ্রামের প্রাথমিক আবেদনপত্র জমা নেয়া হচ্ছে। আগ্রহী গ্রাজুয়েটার কোর্স রিজুভিনেশন, লামা কোয়ান্টায়ন, প্রথমায়ন, কোয়ান্টাম হিলিং ও সাইকি কার্যক্রম এবং কোয়ান্টাম ব্যায়াম কার্যক্রম সম্পন্ন করা সাপেক্ষে আবেদন করতে পারেন ধ্যানের স্তরে নিজেকে এগিয়ে নেয়ার এই অনন্য প্রোগ্রামে।

কোয়ান্টাম বুলেটিন



জুলাই ২০১৫

গ্রাজুয়েট আখেরি দোয়ায় গুরুজী

কোরআন মানুষকে ধ্যান জ্ঞান ও কর্মে উদ্বুদ্ধ করে

কোনোকিছু সত্যিকারভাবে বুঝতে চাইলে বা অন্তর দিয়ে উপলব্ধি করতে হলে চাই গভীর ধ্যানে নিমগ্ন হওয়া। তাই কোরআনের নির্দেশ হচ্ছে, যখন কোরআন পাঠ করা হয় তখন মৌন থাকো এবং মনোযোগ দিয়ে শোনো। এছাড়াও কোরআনের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য হলো, মানুষকে জ্ঞানী করা এবং এর পাশাপাশি তাকে কর্মে উৎসাহিত করা। তাই আমরা বলতে পারি, মানুষকে ধ্যান জ্ঞান ও কর্মে উদ্বুদ্ধ করে কোরআন।

গত ২৬ ও ২৭ জুন ঢাকার আইডিইবি মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত গ্রাজুয়েট আখেরি দোয়ার বিশেষ আলোচনায় একথা বলেন গুরুজী শহীদ আল বোখারী মহাজাতক।

তিনি বলেন, কোরআনে কী বলা হয়েছে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আমরা তার অর্থ বুঝি না বলেই কোরআনের প্রভাব আমাদের ওপর পড়ে না। কিন্তু জীবনে সবচেয়ে বড় ফরজ অর্থাৎ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হচ্ছে কোরআন জানা। আর কোরআন জানার জন্যে চাই মুক্তমন। এই মুক্তমন নিয়ে যিনি কোরআন বুঝতে চান, আল্লাহ তার জন্যে কোরআন উপলব্ধি করা সহজ করে দেন। কারণ, মুক্ত বিশ্বাস মানুষকে মুক্তি দেয়, অন্যদিকে গোঁড়ামি মানুষকে শৃঙ্খলিত করে।

কোরআন নাজিলের সেই প্রথম যুগে সাহাবীদের অধিকাংশই ছিলেন নিরক্ষর। কিন্তু প্রচলিত সংস্কারের বৃত্ত ভেঙে কোরআনের শিক্ষা বুঝতে চেয়েছেন বলেই তারা কোরআন বুঝেছেন। তারা কোরআনের শিক্ষায় শিক্ষিত হয়েছেন, জ্ঞানী হয়েছেন

কোরআনের জ্ঞানে। কারণ, আল্লাহ সুস্পষ্টভাবে বলেছেন, কোরআন এসেছে মানুষকে জ্ঞানী করার জন্যে। তাই কোরআনে কী বলা হয়েছে সেটা জানা খুব গুরুত্বপূর্ণ।

গুরুজী আরো বলেন, শুরু থেকেই কোরআন মানুষকে ধ্যান জ্ঞান ও কর্মে উৎসাহিত করেছে, যা তার জীবন বদলে দিয়েছে। দিয়েছে এক সুখী সফল প্রাচুর্যময় জীবনের সন্ধান। আর ইতিহাসে এর বাস্তব প্রমাণ আমরা দেখতে পাই নবীজী (স) ও তাঁর অনুসারীদের জীবনে। যখন তারা কোরআনের এই শিক্ষাকে নিজেদের জীবনে ধারণ করলেন, তারা পৃথিবী জয় করলেন। কিন্তু পরবর্তীতে তাদেরই উত্তরপ্রজন্মের

অধঃপতন হলো যখন তারা এই ধ্যান জ্ঞান ও কর্ম থেকে নিজেদের ফিরিয়ে নিল। অথচ আমরা নবীজী (স)-এর পুরো জীবনজুড়ে দেখি এই তিনের সমন্বয়। তাই, কোরআনের জ্ঞান অর্জন করুন। যে ব্যক্তি কোরআনের জ্ঞান অর্জন করেন আল্লাহ তাকে দুঃখ থেকে বাঁচান। কারণ, সবচেয়ে বড় জ্ঞান হলো সুন্দর জীবনযাপনের জ্ঞান। আর কোরআনে তা-ই রয়েছে। সে কারণেই কোরআনের জ্ঞান সবসময় প্রাসঙ্গিক এবং সার্বজনীন। সব ধর্মের সব বর্ণের সর্বস্তরের মানুষের জন্যে কোরআনের জ্ঞান উন্মুক্ত। জীবনে যত ধরনের সমস্যা রয়েছে তার সমাধান রয়েছে কোরআনে। আর মায়ের ভাষায় পাঠ করলেই আমরা তা ভালোভাবে বুঝতে ও অনুধাবন করতে পারব। আমাদের জীবনও আলোকিত এবং সমৃদ্ধ হবে ধ্যান জ্ঞান ও কর্মে।



এবারের রমজানে ফাউন্ডেশন প্রকাশ করেছে আল কোরআন বাংলা মর্মবাণীর পেপারব্যাক সংস্করণ

মহাজাগতিক সফরে কাজী মাহ্‌তাব



কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশনের ভাইস চেয়ারম্যান ও প্রতিষ্ঠাতা সদস্য, কোয়ান্টাম বুলেটিন সম্পাদক, কোয়ান্টাম স্বেচ্ছা রক্তদান কার্যক্রমের পরিচালক (মোটিভেশন) এবং কোয়ান্টাম কসমো স্কুল এন্ড কলেজের অন্যতম পৃষ্ঠপোষক কাজী মাহ্‌তাব উদ্দিন আহমদ (৬৯) আর নেই। গত ২৫ জুন রাত ১২টা ৫০ মিনিটে ঢাকার একটি হাসপাতালে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজিউন।

ব্যক্তিগত জীবনে সদালাপী, সদাচারী ও সদা-হাস্যোজ্জ্বল কাজী মাহ্‌তাব ফাউন্ডেশনের শুরু থেকেই সর্বতোভাবে এর সব ধরনের সেবামূলক কার্যক্রমের সাথে জড়িত ছিলেন। পেশাজীবনে তিনি ছিলেন দেশের অন্যতম সফল শিল্পপতি-মৌসুমী গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজ-এর ম্যানেজিং ডিরেক্টর ও চেয়ারম্যান।

এছাড়াও একাধিক সামাজিক ও ক্রীড়া সংগঠনের সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন তিনি। ছিলেন বাংলাদেশ হ্যান্ডবল ফেডারেশনের সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট, বাংলাদেশ কসমেটিক ম্যানুফেকচারিং এসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট এবং পাকিস্টান প্রিয়জন ম্যাগাজিন-এর উপদেষ্টা।

২৫ জুন বাদ জোহর বায়তুল মোকাররম জাতীয় জামে মসজিদে মরহুমের জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। ফাউন্ডেশনের সর্বস্তরের সদস্য ও অসংখ্য শুভানুধ্যায়ী জানাজায় অংশগ্রহণ করে মরহুমের আত্মার মাগফেরাত কামনা করেন।

তিনি স্ত্রী, এক কন্যা, দুই পুত্রসহ অগণিত শুভানুধ্যায়ী রেখে গেছেন। উল্লেখ্য, মরহুমের স্ত্রী অধ্যাপিকা খাদিজা মাহ্‌তাব ফাউন্ডেশনের মতিঝিল শাখার মোমেন্ট্রিয়ার।

আমরা কাজী মাহ্‌তাব উদ্দিন আহমদের সামগ্রিক অবদান গভীর শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করি এবং তার আত্মার অনন্ত প্রশান্তি কামনা করি।

ডা. সামন্ত লাল সেন। অগ্নিদগ্ধ রোগীদের চিকিৎসার ক্ষেত্রে আমাদের দেশে তার ভূমিকা অগ্রগণ্য। ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের বিশেষায়িত বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইউনিট মূলত তার ঐকান্তিক প্রচেষ্টা ও দীর্ঘ পরিশ্রমের ফসল। বর্তমানে তিনি এর কো-অর্ডিনেটর এবং দেশের ১৪টি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে বার্ন এন্ড প্লাস্টিক সার্জারি ইউনিট সম্প্রসারণ কার্যক্রমের জাতীয় প্রধান সমন্বয়ক হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করছেন। ডা. সেন গত ২৭ মে কোয়ান্টাম স্বেচ্ছা রক্তদান কার্যক্রম আয়োজিত ১১৪ তম রক্তদাতা সম্মাননা অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি হিসেবে আমন্ত্রিত হন। পরবর্তীতে কোয়ান্টাম বুলেটিনের সাথে একান্ত সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছেন তার জীবন ও কাজ সম্পর্কে।

সং নিয়ত আর ধৈর্য থাকলে সবকিছুই সম্ভব

ডা. সামন্ত লাল সেন

কিছুদিন আগের কথা। সিএনজি ট্যাক্সি চড়ে বাসায় ফিরছিলাম। গন্তব্যে পৌঁছে ড্রাইভারকে ভাড়া দিলাম, কিন্তু তিনি ভাড়া নেবেন না। বললাম, কেন? তার বক্তব্য হলো, ‘স্যার, আপনি মানুষের উপকার করেন আমরা জানি। পেট্রোল বোমায় আমাদের অনেক ড্রাইভার পুড়ে গিয়েছিল। আপনি ওদের চিকিৎসা করেছেন।’

একজন চিকিৎসক হিসেবে সাধারণ মানুষের এই ভালবাসাটা আমাকে তৃপ্তি দেয়। আরো কাজ করার শক্তি যোগায়।

চিকিৎসক হওয়ার ইচ্ছেটা ছিল আমার ছোটবেলা থেকেই। শৈশবে ডাক্তারি ডাক্তারি খেলতাম, কলাগাছে ইঞ্জেকশন দিতাম। বাবাও চাইতেন আমি চিকিৎসক হই।

বাবা ছিলেন সরকারি চাকুরে। দেশের নানান জায়গায় ঘুরে বেড়াতাম তার সাথে। সিলেটে আমার জন্ম হলেও, কুষ্টিয়া ও দিনাজপুরে স্কুল-কলেজের পড়াশোনা শেষ করে ১৯৬৭ সালে ভর্তি হই চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজে।

১৯৭২ সালে ডাক্তারি পাশ করি। ইন্টার্নশিপ শেষ করে আমার পোস্টিং হলো হবিগঞ্জের বানিয়াচং থানা হেলথ কমপ্লেক্সে। একবছর ছিলাম ওখানে। সে-সময় আজকের মতো এত রাস্তাঘাট ছিল না। প্রায়ই বৃষ্টিতে ভিজে নৌকায় আর সাইকেলে চড়ে কর্মস্থলে যেতাম।

কর্মজীবনের শুরুতে আসলে ডাক্তারদের গ্রামে যাওয়া উচিত, তাহলে বোঝা যায় ওখানকার মানুষের জীবনযাত্রার ধরন এবং ওদের সমস্যাটা কোথায়। এ অভিজ্ঞতাটা পরবর্তীতে অনেক কাজে লাগে।

যা-হোক, ১৯৭৫-এ বদলি হয়ে আসি ঢাকার সোহরাওয়ার্দী হাসপাতালে। ওখানে তখন একজন মার্কিন অর্থোপেডিক সার্জন ছিলেন-ডা. আর জে গাস্ট। যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসার জন্যে বঙ্গবন্ধুর আমন্ত্রণে তিনি বাংলাদেশে এসেছিলেন। তার অদম্য কর্মস্পৃহা দেখে সেই তরুণ বয়সে আমি ভীষণ অনুপ্রাণিত হই। পঙ্গু হাসপাতাল তৈরির সময় তাকে দেখতাম নিজেই বালির বস্তা টানছেন, কিছু একটা লিখতে হলে নিজে টাইপ করছেন।

ডা. গাস্ট একসময় ভারত থেকে একজন প্লাস্টিক সার্জনকে নিয়ে আসেন পঙ্গু হাসপাতালে। আমাকে বললেন, ‘তুমি ওর সাথে কাজ করো’। আমি তখন নবীন চিকিৎসক। উৎসাহ নিয়ে কাজে লেগে গেলাম। মনে হলো, প্লাস্টিক সার্জারি বিষয়টা তো দারুণ! আমি বড় একজন প্লাস্টিক সার্জন হবো। মানুষের চেহারা সুন্দর করব। অনেক টাকাপয়সা রোজগার করব। এমন একটা স্বপ্ন নিয়ে প্লাস্টিক সার্জারিতে ক্যারিয়ার শুরু করলাম।

বছর কয়েক পর ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পোস্টিং হলো। সম্ভবত ১৯৮১ সালের কথা সেটা। প্লাস্টিক সার্জনদের কাজের একটা অংশ হচ্ছে অগ্নিদগ্ধ রোগীদের চিকিৎসা করা। সেইসূত্রে খুব কাছ থেকে দেখলাম ওদের দুঃসহ কষ্ট আর যন্ত্রণা।

দেখেছি, কী নিদারুণ অবহেলার শিকার অগ্নিদগ্ধ রোগীরা। কয়েকটি মাত্র বিজ্ঞান ওদের জন্যে, অধিকাংশই পড়ে আছে মেঝেতে। কেউ টয়লেটের পাশে, কেউ-বা বারান্দায়। তেমন কোনো চিকিৎসাও হতো না ওদের। বেশিরভাগ রোগীই দরিদ্র আর অসহায়।

এই অগ্নিদগ্ধ রোগীদের সংস্পর্শে এসেই আমার মনটা পাল্টে গেল। মানুষের চেহারা সুন্দর করা আর অনেক টাকাপয়সা রোজগার করার স্বপ্নটা পুরোপুরি বিদায় নিল মাথা থেকে। তখন আমার একটাই চিন্তা-এদের জন্যে কিছু করতে হবে, কীভাবে তা করতে পারি।

সার্জারি বিভাগে তখন ছিলেন প্রফেসর ডা. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ ও প্রফেসর ডা. কবীর উদ্দিন আহমেদ। এ দুজন শ্রদ্ধেয় শিক্ষককে সাথে নিয়ে কাজ শুরু করলাম। ১৯৮৬ সালে সরকারের কাছে বার্ন এন্ড প্লাস্টিক সার্জারি নামে একটি স্বতন্ত্র বিভাগ চালু করার প্রস্তাব দেই আমরা।

২০০৩ সালে যাত্রা শুরু করে ৫০ শয্যা বিশিষ্ট আজকের বার্ন এন্ড প্লাস্টিক সার্জারি ইউনিট। অবশ্য এর পেছনে রয়েছে আমাদের দীর্ঘ দেড় যুগের অক্লান্ত সংগ্রাম। অনেক ঘুরতে হয়েছে, সহ্য করতে হয়েছে অনেক গল্পনা তামিষ্য বাধাবিপত্তি। কেউ বিরক্ত হয়ে ফাইল ছুড়ে ফেলে দিয়েছে; কেউ বলেছে, ‘উনি ঘুরছেন ধান্দা নিয়ে, টাকাপয়সা মেরে দিয়ে ইন্ডিয়া চলে যাবেন’। আরো কত কী!

কিন্তু এসব আমাকে কখনো বিচলিত করে নি। আজ এখান থেকে শত শত রোগী যে চিকিৎসা পাচ্ছেন এবং সুস্থ হয়ে বাড়ি

ফিরছেন, এটাই আমার সবচেয়ে বড় শান্তি।

আমি একা কতগুলো অপারেশন করতে পারতাম? আর আমি তো চিরকাল থাকবো না, তাই সবসময় মনে হতো যদি একটা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে পারতাম, বহু রোগী চিকিৎসা পেত। আজ এখানে এত জন ডাক্তার কাজ করছেন, অগ্নিদগ্ধ রোগীদের চিকিৎসায় একটা ভরসাস্থলে পরিণত হয়েছে এই বার্ন ইউনিট, এটি যে দেখে যেতে পারছি তা-ই আমাকে তৃপ্তি দেয়।

আসলে নিয়ত যদি ভালো থাকে এবং সেইসাথে ধৈর্য থাকে তাহলে স্রষ্টাই সাহায্য করেন। তখন সবই সম্ভব। সেই বিশ্বাস থেকেই বলতাম-একদিন এটা করেই ছাড়ব।

আমরা শূন্য থেকে শুরু করেছিলাম। শুরুর দিনগুলো সহজ ছিল না। ছুটির দিন বা অবসর বলে কিছু ছিল না আমাদের। মোটামুটি রাতদিন পুরোটা সময় এখানে কাটাতে হয়েছে কখনো কখনো। আসলে অনেক ত্যাগ-তীতিষ্কার পথ ধরেই একেকটা প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে।

কোয়ান্টাম স্বেচ্ছা রক্তদান কার্যক্রমও এমনই একটি প্রতিষ্ঠান। শূন্য থেকে যাত্রা শুরু করে মানুষকে যে সেবাটা তারা দিচ্ছেন, তা এককথায় অভূতপূর্ব এবং প্রশংসনীয়। আমাদের বার্ন ইউনিটে দিনে ৪০-৫০ ইউনিট রক্ত লাগে, আর এ রোগীদের অধিকাংশই গরীব, অসহায়। বিশুদ্ধ রক্তের জন্যে আমরা তাদের কোয়ান্টামে পাঠাই। ওখান থেকে তারা রক্ত নিয়ে আসেন। অনেক সং মানুষের সম্ভাব্য প্রচেষ্টার ফলেই এ সেবাদান সম্ভব হয়েছে।

আমাদের দেশের মানুষ আসলেই খুব ভালো। মুক্তিযুদ্ধের সময় দেখেছি গ্রামেগঞ্জে মানুষ কীভাবে মানুষকে সাহায্য করেছে। এখানে যে-কোনো জাতীয় দুর্যোগে সর্বস্তরের সাধারণ মানুষ ঝাপিয়ে পড়ে। কাউকে ডাকতেও হয় না। আমাদের দেশটাও খুব ভালো। অনেক সম্ভাবনার একটা দেশ। অনেক ভালো কাজ হচ্ছে এখানে। সবার সম্মিলিত চেষ্টায় এ দেশ আরো অনেকদূর এগিয়ে যাবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

সাক্ষাৎকার গ্রহণ ও অনুলিখন : ডা. আতাউর রহমান

গুরুজীকে লেখা চিঠি

শ্রদ্ধেয় গুরুজী,
আসসালামু আলাইকুম। আমি এ বছর এপ্রিলে কোর্স করেছি। তারপর থেকেই আমার জীবন নতুন গতিতে চলছে। আমি বলব, কোয়ান্টাম মেথড হলো নিজেকে খুঁজে পাওয়ার কোর্স।

পেশাগত কারণে আমাকে খুব ব্যস্ত থাকতে হয়। কিন্তু এখন কাজ করার সময় আমি আনন্দ নিয়ে কাজ করি। হাসপাতালে সব কাজ সেয়ে আমি আমার ছেলেকে নিয়ে শুক্রবার সাদাকায়নে এবং মঙ্গলবার আলোকায়নে আসি। এই পরিবেশে এত ভালো লাগে! সবচেয়ে বড় কথা, আমার স্যার ও সহকর্মী সকলের মুখেই একটি কথা—মেডিটেশন তোমার অনেক উপকারে এসেছে। শোকর আলহামদুলিল্লাহ! আমি বেশ ভালো আছি।

একটা সময় জীবন সম্পর্কে আমার সেরকম কোনো ধারণাই ছিল না। জীবন যে কত জটিল তা সময়ের সাথে সাথে মানুষ বুঝতে পারে। সবার মতো আমার জীবনেও নানা প্রতিকূলতা ছিল। কিন্তু কোর্সে এসে আমি উপলব্ধি করেছি—জীবন আমার। আমার জীবনে পরিবর্তন আমাকেই আনতে হবে।

এ বছর সাত দিনব্যাপী কোয়ান্টায়নে খতমে কোরআনে আমি প্রতিদিন এসেছি। কোনো

কোনোদিন প্রচণ্ড ব্যস্ততার মধ্যেও কীভাবে যেন সুযোগ হয়ে গেছে। এটা আদ্বাহর অশেষ রহমত। ধ্যানের স্তরে কোরআন শোনার অনুভূতি অপূর্ব। কোরআনে নিয়মিত দান সম্পর্কিত আয়াতগুলো শুনে নতুনভাবে



উপলব্ধি করেছি মানুষের কল্যাণে কাজ করার গুরুত্ব।

গুরুজী, আমি একজন পোস্ট গ্রাজুয়েট প্লাস্টিক সার্জন। কোয়ান্টামে এসে শুকরিয়া করতে শিখেছি যে, আমার দেশের

কয়জন মানুষ এ পর্যন্ত আসার সুযোগ পায়! আমি নিজের মেধাকে মানুষের জন্যে উৎসর্গ করতে চাই। দোয়া করবেন আমি যেন সৎসঙ্গে থাকতে পারি।

ডা. আয়েশা হান্না
সহকারী রেজিস্ট্রার, বার্ন এন্ড প্লাস্টিক সার্জারি
ইউনিট, ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল
৩৯৬ ব্যাচের গ্রাজুয়েট

শ্রদ্ধেয় গুরুজী,

আমার সালাম নিবেন। কোয়ান্টাম মেথড কোর্সে এসে আমি বহুমুখী আর বিচিত্র পথের সন্ধান পেলাম। ধ্যান, জ্ঞান, সুখ-সমৃদ্ধি, উজ্জীবনী শক্তি—কী নেই এখানে? গুরুজী, আশানুরূপ রেজাল্ট না থাকায় পছন্দনীয় অনেক চাকরিতে আবেদন করতে পারি না বলে হতাশায় ভুগতাম। একটা সময় মনে হলো, আমার মনের শক্তি একেবারে শূন্যের কোঠায় চলে গেছে, আমাকে দিয়ে কিছু হবে না।

কোর্সে এসে সাহস ও শক্তি ফিরে পেলাম। এখন মনে হয়—জীবনে চলার পথে একটি দরজা বন্ধ হয়ে গেছে তো কী হয়েছে? আরো হাজার দরজা খোলা আছে আমার জন্যে। আমি আর বন্ধ দরজার দিকে তাকিয়ে থাকব না। মেডিটেশন করে আমি আত্মপ্রত্যয় ও দৃঢ়তার সন্ধান পেয়েছি। আমি এখন আপনার মতো করেই বলতে চাই—আমার যা আছে এবং যেখানে আছি, সেখান থেকেই আমি শুরু করব।

আমার জন্যে দোয়া করবেন গুরুজী।

মেরিনা বেগম
৩৯৬ ব্যাচের গ্রাজুয়েট

শ্রদ্ধেয় গুরুজী,
আসসালামু আলাইকুম।
আশা করি ভালো আছেন। আমি আইন বিষয়ে স্নাতক সম্পন্ন করেছি। স্কলারশিপ নিয়ে দেশের বাইরে স্নাতকোত্তর সম্পন্ন করব ভাবছিলাম। জানতে পারলাম নয়াদিল্লীর সাউথ এশিয়ান ইউনিভার্সিটিতে আইন বিষয়ে স্নাতকোত্তর করার সুযোগ আছে। সার্কভুক্ত দেশগুলোতে মানসম্মত উচ্চশিক্ষার অগ্রগতির লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত এই বিশ্ববিদ্যালয়ে আইনে স্নাতকোত্তর বিভাগে আছে মাত্র ৩০টি সিট। এর মধ্যে ১৫টি ভারতের জন্যে বরাদ্দ আর বাকি ১৫টি সার্কভুক্ত অন্য সাতটি দেশের জন্যে।

আশা ছাড়লাম না। আপনি সবসময় বলেন, এ ধরনের প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি হবে—নিজের জন্যে প্রয়োজনীয় সিটি রেখে বাকিগুলো অন্যদের জন্যে ছেড়ে দেয়া। তা-ই করলাম। শুরু থেকে সেভাবেই মনোবল দেখলাম। নির্ধারিত দিনে পরীক্ষা হলো। প্রতিযোগীরা সব বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম সারির শিক্ষার্থী। কোয়ান্টা ভঙ্গি করে পরীক্ষা দিলাম। আর পরীক্ষায় কীভাবে উত্তর দেবো তা আপনার *হাজারো প্রশ্নের জবাব-২* বইটি পড়ে আগেই ঠিক করে রেখেছিলাম। পরীক্ষায় তা-ই করলাম।

পরীক্ষা শেষে দু-একজনের সাথে কথা হলো। তারা খুবই আত্মবিশ্বাসী। কেউ বললেন ৯০টি এমসিকিউ-এর উত্তর দিয়েছেন, কেউ একটাও ছেড়ে আসেন নি। তাদের কথা শুনে ভড়কে গিয়েছিলাম। মনে মনে ভাবলাম, এত জটিল প্রশ্ন, এত বেশি সংখ্যক উত্তর তারা দিতে পেরেছে! না জানি তারা কত জানে! মন কেমন যেন করতে লাগল।

কিন্তু পরীক্ষার হল থেকে বাসায় ফেরার পথে ভাবলাম, উত্তর দিতে তো কোনো বাধা নেই। চাইলে সবগুলোই দেয়া যায়। কিন্তু সঠিক হবে কয়টা সেটাই প্রশ্ন। আর ভুল উত্তরের জন্যে নেগেটিভ মার্কিং তো

আছেই। আর তাদের কথায় যদি আমি নিরাশ হই তাহলে তো আমি অন্যের দ্বারা প্রভাবিত হলাম। একজন কোয়ান্টাম গ্রাজুয়েট হিসেবে যা আমার সাথে মানানসই নয়। তখন প্রস্তার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে করতে পূর্ণ বিশ্বাস নিয়ে বাসায় ফিরলাম।

আগে থেকেই মাটির ব্যাংকে দান করেছি নিয়মিত। একটি ওয়ার্কশপে একজন অর্গানায়ার ভাইয়া বলেছিলেন, ঘুম থেকে উঠে আমাদের ২য় কাজটি হওয়া উচিত মাটির ব্যাংকে দান। এর চর্চা শুরু করলাম।

এদিকে ভর্তির জন্যে প্রাথমিক তালিকা প্রকাশ পেল। আমি তাতে স্থান পেলাম। শুকরিয়া আদায় করলাম প্রস্তার কাছে। মানতের নির্দিষ্ট অংক মাটির ব্যাংকে পরিশোধ করব কিন্তু হাতে টাকা নেই। চিন্তায় পড়ে গেলাম। এর মধ্যে এক মেহমান বাসায় এলেন আর জোরপূর্বক হাতে গুঁজ দিলেন ঐ নির্দিষ্ট অংকের অর্থ! শুকরিয়া আদায় করে নিয়মিত দান করতে লাগলাম।

ওদিকে চূড়ান্ত নির্বাচনের জন্যে কাগজপত্র জমা দিতে বলল। সব কাগজপত্রই আছে। কিন্তু আমার পাসপোর্ট এবং জাতীয় পরিচয়পত্রের কোনোটিই নেই। প্রাথমিক ফল প্রকাশের ১১ দিনের মধ্যে সকল কাগজপত্র জমা দিতে হবে। যাকেই জিজ্ঞেস করি, তিনি বলেন জাতীয় পরিচয়পত্র তো তিন মাসের আগে পাওয়া যাবেই না আর পাসপোর্টও ১৫ দিন থেকে ২০ দিন লাগবেই। তবু আশা ছাড়লাম না।

প্রস্তার কৃপায় আমাকে আশাহত হতে হয় নি। সদাচরণ ও বিনয় এসব সরকারি কাজের প্রতিটি ধাপ সহজ করে দিল। এমনও ঘটেছে, একদিন অফিসের কর্মীরা আমার জন্যে বিকাল ৫টার পর আরও ৩০ মিনিট বেশি অফিস করলেন। অবিশ্বাস্য! আমি এক মুহূর্তের জন্যেও না-শোকর হই নি। নির্দিষ্ট সময়ের আগেই তৈরি হলো প্রয়োজনীয় সব কাগজপত্র। আমি সব জমা দিলাম নির্দিষ্ট সময়ের একদিন আগেই।

এর মধ্যেই

মোহাম্মদপুরে আপনার পরিচালনায় ধ্যানসন্ধ্যা প্রোগ্রামের তারিখ নির্দিষ্ট হলো। শাখার দায়িত্ব শীলদের নির্দেশনা অনুসারে প্রোগ্রাম সফল করার জন্যে কাজ শুরু করলাম। মাঝে একবার বিশেষ প্রয়োজনে ঢাকার বাইরে যেতে হলো। নিয়ত করলাম গুরুজীর প্রোগ্রামের এক সপ্তাহ আগেই ঢাকায় ফিরে শাখার কাজ করব।

১ মে রাতে ঢাকার উদ্দেশ্যে রওনা দিলাম। পরদিন ভোরে যখন মোহাম্মদপুরে বাসার সামনে পৌছলাম তখন মোবাইলটি হাতে নিয়ে দেখি, একটি নম্বর থেকে দুটি মিসড কল ও একটি মেসেজ। মেসেজে জানানো হলো, আমি নয়াদিল্লীর সাউথ এশিয়ান ইউনিভার্সিটিতে মাস্টার্স করার জন্যে চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত হয়েছি। শুকরিয়া আদায় করলাম প্রস্তার কাছে।

খুশির সংবাদটি আপনাকে প্রথম জানাব বলে আর কাউকে কিছু বললাম না। বাসার সবাই ঘুম থেকে ওঠার আগেই আপনাকে চিঠি লিখে ছুটলাম শান্তিনগরের উদ্দেশ্যে।

গুরুজী, জুলাইয়ের শেষ সপ্তাহ থেকে আমার ক্লাস শুরু হবে। ক্লাসে ১ম এবং জীবনে ১ম হয়ে কোয়ান্টাম চেতনাকে আরো বড় পরিসরে যাতে ছড়িয়ে দিতে পারি, সেজন্যে আপনার ও সকল কোয়ান্টাম সহযাত্রীর দোয়া কামনা করছি।

আশফাকুজ্জামান চৌধুরী সাক্ষাত
২২৫ ব্যাচের গ্রাজুয়েট



প্রথমবারের মতো রংপুরে অনুষ্ঠিত হলো কোয়ান্টাম মেথড কোর্স। কোয়ান্টাম পরিবারের থাজুয়েট, প্রো-মাস্টার, আডেন্টিয়ার, কোয়ান্টিয়ার, অর্গানিয়ার সকলের নিরলস পরিশ্রম ও প্রচেষ্টার ফসল এই ৩৯৫ তম ব্যাচ। তারা রংপুরের বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, সরকারি-বেসরকারি অফিসে আয়োজন করেন কোয়ান্টাম সভা।

২৯, ৩০, ৩১ মে ও ১ জুন শহরের আরডিআরএস মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত কোর্সে অংশ নেয় সর্বস্তরের মানুষ। আর এ কোর্সটি বিশেষ মাত্রা পায় ৩৪ জন চিকিৎসকের অংশগ্রহণে। রংপুর মেডিকেল কলেজে 'স্ট্রেস নিয়ন্ত্রণে মেডিটেশনের ভূমিকা' বিষয়ে সিরিজ সেমিনার আয়োজন করা হয় কোর্সের আগে।

রোগ নিরাময়ের ক্ষেত্রে মেডিটেশনের কার্যকারিতায় উদ্বুদ্ধ হয়ে রংপুর মেডিকেল কলেজের ভাইস প্রিন্সিপাল, নয় জন বিভাগীয় প্রধানসহ আরো ২৪ জন চিকিৎসক এ কোর্সে অংশ নেন। মেডিটেশন ও সঠিক জীবনদৃষ্টির ব্যাপারে তাদের স্বতঃস্ফূর্ত আগ্রহ ও উৎসাহ ছিল চোখে পড়ার মতো।

পরিবারের সবাই কোর্সে অংশ নিয়েছি

ডা. সৈয়দ মো. আবু তালেব

আমার কোমরে ডিস্ক প্রোল্যাপ্সের কারণে সবসময় ব্যথা অনুভব করতাম। চিকিৎসার পরও ব্যথাটা যাচ্ছিল না। কোর্সের তৃতীয় দিন থেকে সম্পূর্ণ সুস্থ বোধ করছি। আলোচনাগুলো ধর্মীয় ও বৈজ্ঞানিক-উভয় দৃষ্টিকোণ থেকে অত্যন্ত চমৎকার। পরিবারের সবাইকে নিয়ে আমি কোর্সে অংশ নিয়েছি।

[ডা. সৈয়দ মো. আবু তালেব, অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান, সার্জারি বিভাগ : ভাইস প্রিন্সিপাল, রংপুর মেডিকেল কলেজ]

প্রো-একটিভ হতে শিখলাম

ডা. শীলা রাণী

যদি আমরা সমস্যাকে প্রো-একটিভ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে সমাধানের চেষ্টা করি, তাহলেই জীবনটা সুন্দর হয়-কোর্সে এসে এটাই উপলব্ধি করলাম। এখন মাথা ঠান্ডা রেখে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারছি, যা আমার জন্যে অনেক বড় প্রাপ্তি। পারিবারিক ও পারস্পরিক সম্পর্কগুলোকে আরো সুন্দর করার সহজ সূত্রগুলো শিখলাম এখানে এসে।

[ডা. শীলা রাণী, জেনারেল প্র্যাকটিশনার]



রংপুরে অনুষ্ঠিত ৩৯৫ ব্যাচে অংশ নেয়া চিকিৎসকদের একাংশ, সামনের সারিতে রংপুর মেডিকেল কলেজের ভাইস-প্রিন্সিপালসহ অন্যান্য সিনিয়র অধ্যাপকবৃন্দ

বিজ্ঞানসম্মতভাবে বাঁচার প্রক্রিয়া শিখলাম

ডা. শাহী ফারজানা তাসমিন

আমরা বিভিন্নভাবে বাঁচি। কিন্তু বিজ্ঞানসম্মত ও সুন্দরভাবে বাঁচার প্রক্রিয়া শিখলাম এ কোর্সে। সত্যিই কোয়ান্টাম মেথড হলো সায়েন্স অব লিভিং।

এখন আমি রাগকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারছি। পেশাগত দায়িত্বও আগের চেয়ে সুন্দরভাবে পালন করতে পারছি। নামাজে আমার মনোযোগ বেড়েছে।

[ডা. শাহী ফারজানা তাসমিন, সহযোগী অধ্যাপক, স্ত্রীরোগ ও প্রসূতিবিদ্যা বিভাগ, রংপুর মেডিকেল কলেজ]

এনার্জি লেভেল বেড়েছে

ডা. বিধু ভূষণ দাস

কোর্সে সৃষ্টিজ্ঞানভাবে মেডিটেশন চর্চার প্রক্রিয়া শিখলাম। কোর্সের পরও আমি নিয়মিত মেডিটেশন চর্চা করছি। আমার এনার্জি লেভেল আগের চেয়ে বেড়েছে এবং রাগ নিয়ন্ত্রণ করতে পারছি।

পেশাগত অভিজ্ঞতা থেকে দেখেছি, অনেক রোগী আছেন যারা সবসময় টেনশন করেন। কোনো ওষুধই তাদের রোগ নিরাময়ে কাজ করে

সঠিক দৃষ্টিভঙ্গির গুরুত্ব অনুভব করেছি

ডা. এম এ মোস্তাকিম

আমার দীর্ঘদিনের অভ্যাস ছিল খুব ভোরে ব্যায়াম করা ও হাঁটা। হঠাৎ কোমরের ডিস্ক প্রোল্যাপ্স হলো। বেশ ব্যথা হতো। তারপর থেকে থেমে থেমে হাঁটতাম। এখন বিরতি ছাড়াই হাঁটছি, কোনো অসুবিধা হচ্ছে না। আমার আত্মবিশ্বাস অনেক বেড়ে গেছে। উপলব্ধি করেছি সুন্দর জীবনের মূলে রয়েছে সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি।

[ডা. এম এ মোস্তাকিম, অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান, পেডিয়াট্রিকস বিভাগ, রংপুর মেডিকেল কলেজ]

না। এ ধরনের রোগীদের কোর্সের টেকনিকগুলো অনুসরণের পরামর্শ দিচ্ছি। তারা আগের চেয়ে ভালো আছেন।

[ডা. বিধু ভূষণ দাস, অধ্যাপক, মেডিসিন বিভাগ ও বিভাগীয় প্রধান, ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিট, রংপুর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল]

সুনির্দিষ্ট মনছবি সাফল্য আনে

ডা. পরিমল চন্দ্র সরকার

সুনির্দিষ্ট মনছবি নির্মাণই জীবনে সাফল্য আনে, তা পরিষ্কারভাবে বুঝলাম। পরবর্তী প্রজন্মের মাঝে এই শিক্ষা গণ্ডিতে দিতে হবে। আমরা যদি রোগ-ব্যাদির ব্যাপারে দৃষ্টিভঙ্গি পাল্টাই তাহলেই অনেক সুস্থ থাকতে পারব।

[ডা. পরিমল চন্দ্র সরকার, অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান, মাইক্রোবায়োলজি বিভাগ, রংপুর মেডিকেল কলেজ]

স্ট্রেস বোধ করছি না

ডা. ইসমত জাহান

মেডিটেশন করে আমার মাথাব্যথা দূর হয়েছে। জীবন সম্পর্কে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি লাভ করেছি। দীর্ঘসময় কাজ করেও স্ট্রেস বোধ করছি না। বিশ্বাস করি, এখন প্রশান্ত জীবনের দিকে এগিয়ে যেতে পারব।

[ডা. ইসমত জাহান, মেডিকেল অফিসার, সদর হাসপাতাল, গাইবান্ধা]

আনন্দ নিয়ে কাজ করছি

ডা. মো. হাবিবুর রহমান

আগে কর্মব্যস্ত দিনের শেষে ক্লান্তিবোধ করতাম। এখন আনন্দ নিয়ে কাজ করছি। পেশেন্ট ম্যানেজমেন্টেও ইতিবাচক পরিবর্তন এসেছে। কোর্সে এসে নতুন করে অনুভব করেছি, আমরা এক মহান জাতি।

[ডা. মো. হাবিবুর রহমান, সহকারী অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান, ফিজিক্যাল মেডিসিন বিভাগ, রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল]

নামাজে মনোযোগ বেড়েছে

ডা. আশী ইকবাল

কোর্সে এসে নামাজে মনোযোগ বেড়েছে। পেশাগত দায়িত্ব পালন, পড়াশোনা সহ অন্যান্য কাজেও এখন আমি আগের চেয়ে বেশি মনোযোগী। মনকে প্রশান্ত করতে পেরেছি। কোয়ান্টামে শেখা ইতিবাচক কথাগুলো এখন রোগীদেরকে বলছি।

[ডা. আশী ইকবাল, প্রভাষক, ফিজিওলজি বিভাগ, রংপুর কমিউনিটি মেডিকেল কলেজ]

বাংলাদেশের চিকিৎসাব্যবস্থায় ইতিবাচক পরিবর্তনের সূচনা করবে এ ঘটনা

ডা. মুহাম্মাদ হাসান মাহবুব-উর-রহমান



বছর ছয়েক আগের কথা। তখন আমি রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের কার্ডিওলজি বিভাগে কাজ করছি। আমাদের একজন স্যার একদিন আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, এত রকম স্ট্রেসের মধ্যে তুমি রোগীদের সাথে এত শান্ত স্বরে কথা বলো আর এমন হাসিখুশি থাকো কী করে? স্যারকে বললাম মেডিটেশনের বিভিন্ন উপকারিতার কথা।

এভাবেই শুরু। তখন থেকেই রংপুর মেডিকেল কলেজের চিকিৎসক এবং ছাত্রদের বিভিন্ন সময় এ কথাগুলো বলেছি। তারাও কেউ মেডিটেশনের ব্যাপারে জানতে চাইলে আমার সাথে যোগাযোগ করতেন। আমি সাধ্যমতো সবাইকে বিষয়গুলো বোঝানোর চেষ্টা করতাম।

এ বছরের শুরুর দিকে ব্যাপক আকারে এ সুযোগটি পাই। রংপুর মেডিকেল কলেজের বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টের সমবেত অংশগ্রহণে প্রতি মঙ্গলবার যে ক্লিনিক্যাল সেশনটি অনুষ্ঠিত হয়, তাতে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে স্ট্রেস নিয়ন্ত্রণে মেডিটেশনের ভূমিকা নিয়ে কথা বলার সুযোগ হলো। আমার প্রেজেন্টেশনটি সবাই মুগ্ধ হয়ে পিনপতন নীরবতায় শুনলেন। এরপর কলেজের সিনিয়র প্রফেসর এবং অন্যান্য চিকিৎসকদের আগ্রহের প্রেক্ষিতে এ ধরনের আরো কয়েকটি প্রেজেন্টেশন করি।

এরই ফলশ্রুতিতে ৩৪ জন চিকিৎসক কোর্সে অংশগ্রহণ করেছেন। আমি বিশ্বাস করি, বাংলাদেশের চিকিৎসাব্যবস্থায় ইতিবাচক পরিবর্তনের সূচনা করবে এ ঘটনা।

সেই ১৯৯৪ সালে কোর্সে অংশ নিয়েছিলাম। তখন বন্ধু সহপাঠীরা 'পাগল' বলত। ২১ বছর পরে মেডিটেশনের কথা এখন সর্বস্তরের মানুষ শোনে গভীর মনোযোগ ও কৌতূহল নিয়ে। সবাই আজ অনুভব করছেন, মেডিটেশন তার নিজের ভালো থাকার জন্যেই দরকার।

[ডা. মুহাম্মাদ হাসান মাহবুব-উর-রহমান, সহকারী রেজিস্ট্রার, মেডিসিন বিভাগ, রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল এবং কোয়ান্টাম মেথড ২৬ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]

প্রশ্নোত্তর : প্রশ্ন ? উত্তর দিচ্ছেন গুরুজী

প্রশ্ন : চাকরির অবস্থায় প্রভিডেন্ট ফান্ড প্রতিষ্ঠানের নিকট জমা থাকে। এক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানের নিকট থাকাকালীন অবস্থায় জমাকৃত টাকার যাকাত দিতে হবে কিনা।

উত্তর : যদি আমি আপনার জায়গায় থাকতাম তাহলে আমি দিতাম। কারণ আল্লাহ তায়ালা হচ্ছেন মহান দাতা এবং তিনি দাতাকে পছন্দ করেন। না দেয়ার অনেক কারণ এবং অজুহাত বের করা যেতে পারে। কারণ, নিয়মকানুন ও আইনের অনেক ফাঁকফোকর তো আছেই। কিন্তু যেহেতু বিষয়টা হচ্ছে আল্লাহর সাথে সরাসরি, তাই আইনের ফাঁকফোকর বের করার কোনো দরকার নেই। সত্যি কথাটা হলো, আপনি যত হিসাব করে যাকাত দেবেন, আপনার সম্পদে বরকত হবে এবং আপনার সম্পদ তত বাড়তেই থাকবে।

প্রশ্ন : আপনি বলেছেন সবাইকে ক্ষমা করে দিতে। ক্ষমা করে দেই কিন্তু মনের মধ্যে কষ্ট থেকেই যায়। অনেকের বিভিন্ন কাজে সেই কষ্ট আবার নতুন মাত্রা পায়। আমি আমার এই মানসিক যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেতে চাই।

উত্তর : খুব সহজ। যতবার যন্ত্রণা পাবেন ততবার ক্ষমা করবেন। এটা আপনার নিজের কল্যাণের জন্যে, তার নয়। নবীজী (স)-র হাদীস হলো, দাসকে প্রহার কোরো না, ক্ষমা করে দেবে। একবার এক সাহাবী জানতে চাইলেন, ইয়া রসুলুল্লাহ! দাসদের অর্থাৎ অধীনস্থদের কতবার ক্ষমা করব? রসুলুল্লাহ (স) বললেন, দিনে ৭০ বার।

অতএব, যারাই কষ্ট দেয় কী করবেন? দিনে অন্তত ৭০ বার ক্ষমা করবেন। আপনার মঙ্গলের জন্যে। কারণ সৃষ্টা ক্ষমাশীলকে পছন্দ করেন। আপনি যত ক্ষমা করবেন তত আল্লাহর রহমত আপনার ওপর বর্ষিত হতে থাকবে। তত আপনি ভালো থাকবেন। আসলে আপনি যখন দান করেন, আপনি মূলত নিজের কল্যাণ করেন। সেরকম ক্ষমা করে আপনি আসলে নিজেরই কল্যাণ করছেন।

প্রশ্ন : আমার কোনো কিছুই শান্তি লাগে না। একদিন ভালো থাকি, মনে হয় যেন স্বর্গে আছি। ঠিক অন্যদিন খারাপ থাকি। আমি কি আল্লাহর হয়ে গেলে ভালো থাকব? কীভাবে সেটা সম্ভব?

উত্তর : আপনি যত সহজে আল্লাহর হয়ে গেলাম বলছেন, বিষয়টা অত সহজ নয়। আর আমরা তো আল্লাহর আছি। আল্লাহর এখতিয়ারের বাইরে তো আমরা কেউ নেই। আল্লাহর হয়ে যাওয়া মানোটা কী? আল্লাহ যা পছন্দ করেন সেই কাজগুলো করা, আল্লাহ যা অপছন্দ করেন সেই কাজগুলো করা থেকে বিরত থাকা। এই দুটো কাজ খুব সহজ। এই দুটো কাজ করুন আপনার জীবনে কোনো অশান্তি থাকবে না। থাকতেই পারে না। এবং এটা একদিনে হবে না। শুরু করতে হবে ছোট ছোট কাজ দিয়ে। আপনি অবশ্যই ভালো থাকবেন।

প্রতিরাতে ঘুমানোর আগে আত্মপর্যালোচনা করতে থাকুন যে, আজ আল্লাহর পছন্দনীয় কী কী কাজ করলাম আর অপছন্দনীয় কী কী কাজ থেকে বিরত থাকতে পারলাম। এটা নিয়মিত করতে পারলে আপনি যে অর্থে বলেছেন ‘আল্লাহর হয়ে গেলে ভালো থাকব’ সে-পথে সুন্দরভাবে এগিয়ে যাবেন।

প্রশ্ন : গুরুজী, এবার বিজ্ঞান বিষয়ের সকল প্রশ্ন ফাঁস হচ্ছে কিন্তু ফেসবুক এবং হোয়াটসঅ্যাপ ব্যবহার না করার কারণে আমি কোনোটিই পাচ্ছি না। ফলে আমার চেয়ে অন্যদের পরীক্ষা অনেক ভালো হচ্ছে। গত পরীক্ষাগুলো আশানুরূপ হয় নি। ফলে একটু ভেঙে পড়ছি। ভালো রেজাল্টের জন্যে মনে জোর পাচ্ছি না। না পারার ভয়টা আমাকে দুর্বল করে দিচ্ছে। এমনকি মেডিকেল কলেজে চাপ পাওয়ার স্বপ্নটাও কেমন যেন স্তিমিত হয়ে যাচ্ছে। ঘুমের পরিমাণ অনেক বেড়ে গেছে। মনে হয় যেন ঘুমালে অন্তত অল্প সময়ের জন্যে হতাশা থেকে দূরে থাকা যাবে। মনে হচ্ছে, সারাবছর পড়েও তো ভালো করতে পারলাম না তাহলে আর কী হবে। গুরুজী, আমার জন্যে দোয়া করুন, মানুষের সেবার উদ্দেশ্যে যেন আমার ও আমার পরিবারের স্বপ্নপূরণ হয়।

উত্তর : এই সমস্যাটা কিন্তু আজ একজন-দুজনের নয়। মোটামুটি সবারই সমস্যা। প্রথমত আল্লাহর কাছে কামনা করছি, প্রশ্ন যারা ফাঁস করে আল্লাহ যেন তাদের উপযুক্ত শাস্তি দেন। কারণ এর চেয়ে বড় জুলুম শিক্ষার্থীদের ওপর আর কিছু হতে পারে না। এরা আসলে পুরো শিক্ষার মেরুদণ্ডটাকে ভেঙে দিচ্ছে। আমরা এই বয়সে এসে যে জিনিসটা বুঝতে পারি, একজন তরুণ/ তরুণী সেটা বুঝতে পারে না। আসলে ফাঁস করা প্রশ্নে পরীক্ষা দিয়ে গোল্ডেন জিপিএ পেয়ে কোনো লাভ নেই, ভালো কোনো বিশ্ববিদ্যালয়েও ভর্তি হওয়া যায় না।

আসলে রেজাল্ট কী হলো, গোল্ডেন জিপিএ পেলেন কী পেলেন না এটা যেমন গুরুত্বপূর্ণ, তার চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো গোল্ডেন জিপিএ পাওয়ার জন্যে যে শিক্ষা প্রয়োজন, যে প্রস্তুতি প্রয়োজন সে প্রস্তুতি ও যোগ্যতা আপনার আছে কিনা। অতএব যারা ফাঁস করা প্রশ্ন দিয়ে ভালো পরীক্ষা দিচ্ছে আর গোল্ডেন জিপিএ পাচ্ছে, তাদের দিকে তাকাবেন না।

দ্বিতীয়ত, ফাঁস করা প্রশ্ন পাওয়া ছাড়াও তো গোল্ডেন জিপিএ পাওয়া যায়। আমি যদি সারা বছর রুটিন করে ভালোমতো পড়াশুনা করি এবং যথাযথ প্রস্তুতি নিই, তাহলেও তো আমি গোল্ডেন জিপিএ পেতে পারি। অতএব আমাকে সেই প্রস্তুতিটা নিতে হবে। অর্থাৎ ব্যতিক্রম হবেন সবসময়। শ্রোতে যারাই গা ভাসাবেন তারা ভেসে যাবেন। কোনো অস্তিত্বই থাকবে না তাদের। যারা শ্রোতের বিপরীতে থাকতে পারেন তারাই অমরত্ব লাভ করেন।

রসুলুল্লাহ (স)-এর সময়টা কেমন ছিল? তিনি যদি শ্রোতে ভেসে যেতেন, তখনকার সংস্কারে ভেসে যেতেন, তাহলে আজকে কি তিনি প্রাতঃস্মরণীয় হয়ে থাকতেন? তিনি শ্রোতাকে পরিবর্তন করতে পেরেছিলেন বলেই, শ্রোতের বিপরীতে ছিলেন বলেই, সত্যের পক্ষে ছিলেন বলেই তিনি আজ প্রাতঃস্মরণীয়।

অতএব সবসময় মনে রাখবেন, শ্রোতের সাথে তাল মিলিয়ে যারা নকল করে পাশ করছেন, ফাঁস করা প্রশ্নপত্র দেখে পাশ করছেন তারা জীবনে কখনোই প্রথম হতে পারবেন না, কোনোদিন না। কারণ জীবনে প্রথম হওয়ার জন্যে জ্ঞানের প্রয়োজন। জীবনে প্রথম হওয়ার জন্যে যোগ্যতার প্রয়োজন। যে কারণে বিদেশে আমাদের দেশের ডিগ্রির কোনো দাম নেই। যখন এখান থেকে বিদেশে পড়াশোনা করতে

যেতে চান তখন আপনাকে টোফেল দিতে হচ্ছে, জিআরই দিতে হচ্ছে, নানান কিছু। এসব না দিয়ে আপনি বিদেশের কোনো ভালো বিশ্ববিদ্যালয়ে যেতে পারছেন না।

অতএব মেরুদণ্ড সোজা করে দাঁড়াতে হবে। হতাশার কোনো সুযোগ নেই। আপনিও গোল্ডেন জিপিএ পেতে পারেন, যদি আপনি পড়াশোনা করেন। আপনাকে পড়ে প্রথম হতে হবে। তাহলে জীবনযুদ্ধে আপনি এগিয়ে যাবেন। কারণ যারা নকল করে পরীক্ষা দেয় বা ফাঁস করা প্রশ্নপত্রে পরীক্ষা দেয়, জীবনে প্রথম হওয়ার যে প্রস্তুতি দরকার এই প্রস্তুতিটা তাদের হয় না।

প্রশ্ন : আপনি আমাদের বলেন প্রশান্ত থাকতে। কিন্তু পরিবারের বিভিন্ন সমস্যার কথা শুনতে শুনতে আর শান্ত থাকতে পারি না। অসুস্থ হয়ে যাই। কী করলে এর থেকে মুক্তি পাব?

উত্তর : নিয়মিত শিথিলায়ন করবেন। যত নিয়মিত মেডিটেশন করবেন তত আপনার ভেতরে প্রশান্তি আসবে এবং চারপাশের কোনো নেতিবাচকতা সমস্যা, অশান্তি আপনাকে প্রভাবিত করতে পারবে না। আপনার মধ্যে কোনো প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করবে না। কারণ, সেটা আর আপনার ভেতর পর্যন্ত যাবে না। বরং সমস্যার সমাধান এবং তাকে কীভাবে নতুন সম্ভাবনায় রূপান্তর করা যাবে, সেই আইডিয়া আপনার মধ্যে আসবে। এর পাশাপাশি সবসময় অটোসাজেশন দেবেন-সুস্থ দেহ প্রশান্ত মন কর্মব্যস্ত সুখী জীবন। আপনি প্রশান্ত থাকতে পারবেন।

প্রশ্ন : আমি খুব উৎসাহ নিয়ে শুরু করি। কিন্তু একটা সময় আত্মহারা হয়ে ফেলি, যার ফলে কোনো কাজ শেষ করতে পারি না।

উত্তর : আসলে অধিকাংশ মানুষের মূল সমস্যাটা এখানেই। আমরা খুব উৎসাহ নিয়ে শুরু করি, কিছুদিন পর হাল ছেড়ে দেই। লেগে থাকতে পারি না। কিন্তু লক্ষ্যে পৌঁছতে হলে, কোনো কাজে সফল হতে হলে লেগে থাকতে হবে। লেগে থাকাটা আপনার জন্যে তখনই সহজ হবে যখন আপনি সঙ্গে একাত্ম হবেন। তাই ফাউন্ডেশনের প্রোগ্রামগুলোতে নিয়মিত হোন। নিয়মিত সাদাকায়নে অংশ নিন। সুযোগ থাকলে আলোকায়নে অংশ নিন।

যদি কোনো কারণে আপনার মধ্যে নেতিবাচকতা আসতে চায়, উৎসাহে ভাটা পড়ে অন্যরা তখন আপনাকে উৎসাহ দেবে। সাহস যোগাবে। সংস্কার গুরুত্বটা তো এখানেই। সংস্কার মানুষকে লেগে থাকতে সাহায্য করে। পরিশ্রমী হতে সাহায্য করে। এগিয়ে যেতে সাহায্য করে। কেউ পেছনে পড়ে আছে, হতাশায় ডুবে আছে, এটা সংস্কারে কেউ কখনো দেখতে চায় না। সংস্কার সবসময়ই একজনকে সামনে এগিয়ে যেতে উৎসাহিত করে।

এ মাসের অটোসাজেশন

সৃষ্টির প্রতিনিধি হিসেবে
সৃষ্টিকে প্রতিপালনের
কিছু কাজ আজ আমি করব।

২য় আরচারি ক্লাব চ্যাম্পিয়নশিপ-২০১৫

কোয়ান্টাদের স্বর্ণ ও রৌপ্য পদক জয়



২য় আরচারি ক্লাব চ্যাম্পিয়নশিপের ব্যাঘো ডিভিশনে কোয়ান্টাম কসমো স্কুলের দুই কোয়ান্টা ভানরুম বম ও কামরুল ইসলাম যথাক্রমে স্বর্ণ ও রৌপ্য পদক জয় করেছে। এছাড়া দলীয় ক্যাটাগরিতে রৌপ্য পদক অর্জন করে কোয়ান্টাম স্পোর্টিয়ামের কোয়ান্টারা। ১২-১৪ জুন টঙ্গী স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত এই প্রতিযোগিতার ব্যাঘো ডিভিশনে কোয়ান্টাম স্পোর্টিয়ামের তিন জন কোয়ান্টা অংশ নেয়।

কোয়ান্টা ভানরুম বম ও কামরুল ইসলাম কোয়ার্টার ফাইনাল ও সেমিফাইনালে বাংলাদেশ

সেনাবাহিনী ও বাংলাদেশ আনসারের অভিজ্ঞ আরচারদের পরাজিত করে ফাইনালে উন্নীত হয়। ফাইনালে ভানরুম কামরুলকে পরাজিত করে প্রথমবারের মতো স্বর্ণপদক লাভ করে। দলীয় ক্যাটাগরিতে কোয়ান্টারা ফাইনালে বাংলাদেশ আনসারের কাছে ২-৪ সেটে পরাজিত হয়ে রৌপ্য পদক অর্জন করে।

বাংলাদেশ আরচারি ফেডারেশনের ক্লাব পর্যায়ের ২য় এ আসরে ১২ জুন অনুষ্ঠিত হয় প্রতিযোগিতার র‍্যাংকিং রাউন্ড। কোয়ান্টা ভানরুম বম ৪র্থ, কামরুল ইসলাম ১০ম ও আরিফুল ইসলাম ১১ তম স্থান অর্জন করে।

১৪ তারিখ ফাইনাল খেলা শেষে বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন প্রধান অতিথি ক্রীড়া উপমন্ত্রী আরিফ খান জয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ আরচারি ফেডারেশনের সভাপতি লে. জে. মইনুল ইসলাম সি.জি.এস। সাথে ছিলেন আরচারি ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক কাজী রাজীব উদ্দীন আহমেদ চপল।

শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে বৃক্ষরোপণ



২৩ জুন শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় সেলের উদ্যোগে প্রথমবারের মতো অনুষ্ঠিত হলো বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি। বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস ও এর চারপাশ সবুজে ভরিয়ে দিয়ে কোয়ান্টাররা ১০০টি নিমগাছ রোপণ করার উদ্যোগ নেয়। এর প্রথমধাপে ৪৬টি নিমগাছ ও ১০টি ফুলগাছ রোপণ করা হয় ক্যাম্পাসের গোলচত্বর, মেডিকেল সেন্টারের পাশে ও ছাত্রীহলের সামনে।

এ কার্যক্রমে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের সার্বিক সহযোগিতা ছাড়াও প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন শিক্ষক সমিতির সভাপতি ও পরিসংখ্যান বিভাগের অধ্যাপক ড. কবির হোসেন। প্রথম রমজানে বৃক্ষরোপণের মতো পুণ্যময় কাজে শরিক হতে পেরে উচ্ছ্বসিত ছিলেন শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয় সেলের ৩৬ জন কোয়ান্টার।

চট্টগ্রামে ব্রেইল পদ্ধতিতে আল কোরআন বাংলা মর্মবাণী



২৪ জুন চট্টগ্রামের ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউট মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয় কোয়ান্টায়নে খতমে কোরআনের আখেরি দোয়া ও বার্ষিক ইফতার মাহফিল। এতে দৃষ্টি প্রতিবন্ধীদের পড়ার উপযুক্ত ব্রেইল পদ্ধতি বাংলা মর্মবাণী আমপারা ও সপ্তসূরা প্রথমবারের মতো উদ্বোধন করা হয়। একজন দৃষ্টি প্রতিবন্ধী গ্রাজুয়েট ব্রেইল পদ্ধতিতে সূরা ফাতেহা পাঠ করে শোনান। বাংলাদেশে ব্রেইল পদ্ধতিতে প্রথম আল কোরআন বাংলা মর্মবাণীর প্রকাশক অধ্যাপক সামাদকে অভিনন্দন জানানো হয়।

কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন চট্টগ্রাম সেন্টারের অর্গানাইজার কো-অর্ডিনেশন এস. এম. সাজ্জাদ হোসেনের সঞ্চালনায় এ অনুষ্ঠানে রমজানের তাৎপর্য নিয়ে আলোচনা করেন এবং বিশেষ দোয়া পরিচালনা করেন কেন্দ্রীয় আর্ডিন্টার মওলানা ছায়ীদুল হক। এ আয়োজনে উপস্থিত ছিলেন সাত শতাধিক গ্রাজুয়েট, প্রো-মাস্টার ও এসেসিয়েট।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী সেমিনার

১১ জুন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় কোয়ান্টাম মেডিটেশন সোসাইটির উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয় শিক্ষার্থী সেমিনার। দুই ঘণ্টাব্যাপী এ সেমিনারে শিক্ষার্থী জীবনে মেডিটেশনের গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা করেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় কোয়ান্টাম মেডিটেশন সোসাইটির উপদেষ্টা ও নৃ-বিজ্ঞান বিভাগের সহকারী অধ্যাপক মোশরেকা আদিতি হক। ক্যারিয়ার নির্মাণে মনোবি ও অটোসাজেশন প্রসঙ্গে আলোচনা করেন অর্গানাইজার কামরুল হাসান সবুজ। শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন চট্টগ্রাম সেন্টারের অর্গানাইজার কো-অর্ডিনেশন এস. এম. সাজ্জাদ হোসেন। এতে ৬০ জন শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করেন।

ড্যাফোডিল ইউনিভার্সিটিতে শিক্ষার্থী সেমিনার

১০ জুন ঢাকার ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটিতে অনুষ্ঠিত হয় একটি শিক্ষার্থী সেমিনার। ক্লাসে ১ম ও জীবনে ১ম হওয়ার জন্যে মেডিটেশনের ভূমিকা এবং শিক্ষার্থী জীবনে সাফল্যের সহজ সূত্রগুলো নিয়ে আলোচনা করেন অর্গানাইজার ইঞ্জিনিয়ার প্রাণজিৎ লাল শীল। কোয়ান্টাম আইসিটি কার্যক্রমের আয়োজনে এই সেমিনারে অংশ নেন ড্যাফোডিল ইউনিভার্সিটির ২৫ জন শিক্ষার্থী।

কর্মসূচি জুলাই-আগস্ট ২০১৫

জীবনে সফল হওয়ার পথ প্রথমায়ন
৩১ জুলাই ও ১ আগস্ট। উত্তরা
হৃদরোগ প্রতিরোধ ও নিরাময় কার্যক্রম
৩১ জুলাই ও ১ আগস্ট। বনশ্রী
কোয়ান্টাম শিক্ষার্থী কার্যক্রম
৩১ জুলাই ও ১ আগস্ট। বনশ্রী
প্যারেন্টিং প্রোগ্রাম : স্টেপ-১
৭ ও ৮ আগস্ট। কাকরাইল
কোয়ান্টাম ব্যায়াম কার্যক্রম
৭ ও ৮ আগস্ট। বনশ্রী (পুরুষ)
৭ ও ৮ আগস্ট। প্রশান্তি হল (মহিলা)

আবশ্যিক

কোয়ান্টাম কসমো স্কুল ও কলেজের জন্যে শিক্ষক/শিক্ষিকা/আবাসিক শিক্ষক (ন্যূনতম অনার্স পাশ), বিজ্ঞান বিভাগের জন্যে (পদার্থ বিজ্ঞান, রসায়ন, জীব বিজ্ঞান, উচ্চতর গণিত) শিক্ষক/শিক্ষিকা আবশ্যিক। বিএড ও নিবন্ধনকৃত প্রার্থীরা অগ্রাধিকার পাবেন। শিশুকানন ও শিশুসদনের শিক্ষার্থীদের দেখাশোনার জন্যে ব্রাদার, সিস্টার (ন্যূনতম এসএসসি পাশ) ও সিকিউরিটি গার্ড আবশ্যিক। এছাড়াও কোয়ান্টাম-এর জন্যে কিছু সংখ্যক মালি, মাঠকর্মী প্রয়োজন। আত্মহীরা যোগাযোগ করুন:

কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন

৩১/ভি শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদীন সড়ক,
শান্তিনগর, ঢাকা-১২১৭
ফোন : ৯৩৪১৪৪১, ০১৭১৪-৯৭৪৩৩৩

মধুমাস কোয়ান্টাদের আনন্দের মাস কোয়ান্টামে ফল উৎসব

১৭ ও ১৮ জুন প্রথমবারের মতো কোয়ান্টামে উদযাপন করা হলো ফল উৎসব। এতে ছিল দেশীয় বাহারি ফলের প্রদর্শনী এবং ফলের স্বাদ নেয়ারও চমৎকার সুযোগ। মৌসুমি ফলের আকর্ষণীয় প্রদর্শনীতে ছিল মোট ২৯ ধরনের ফল-আম কাঁঠাল জাম কলা লেবু কমলা মাল্টা জাম্বুয়া সফেদা আনারস পানিয়াল লটকন গোলাপজাম আমলকি শরিফা চালতা পেয়ারা করমচা কামরাঙা ডেউয়া কাউফল জামরুল কাঠবাদাম কাজুবাদাম পেঁপে নারিকেল ও প্যাশন ফল, দেশি গাব, দেশি খেজুর। এ উৎসবে

অংশ নেন পহেলা রমজান উপলক্ষে লামায় আগত ২৫ শতাধিক অংশগ্রহণকারী।

প্লেটভর্তি নানা ধরনের ফল খাওয়ার সুযোগের পাশাপাশি ছিল সুশীতল শরবত। গ্রীষ্মের তাপদাহে তোকমা-লেবুর শরবত



মধুমাসে ফল হাতে উচ্ছ্বসিত ক্ষুদে কোয়ান্টারা



কোয়ান্টাদের জন্যে সরবরাহ করা হয়েছে পর্যাপ্ত পরিমাণে আম কাঁঠাল কলা ও আনারস

আর উলটকম্বলের শরবত নিয়ে আসে স্বস্তি।

এর পাশাপাশি মধুমাস জুড়েই উৎসবমুখর ছিল কোয়ান্টামম। আর এ উৎসবে আকর্ষণের কেন্দ্রে ছিল কোয়ান্টাম কসমো স্কুল ও কলেজের শিক্ষার্থী কোয়ান্টারা। এ বছর কোয়ান্টাদের জন্যে সরবরাহ করা সম্ভব হয়েছে পর্যাপ্ত পরিমাণে আম কাঁঠাল কলা ও আনারস। দেশীয় রসাল ফলের সুবাস আর কোয়ান্টাদের উচ্ছ্বাস মিলে পূর্ণতা পায় এবারের ফল উৎসব।



কোয়ান্টাম ফল উৎসবে ২৯ ধরনের ফলের প্রদর্শনী ঘুরে দেখছেন অংশগ্রহণকারীরা

১১২ ও ১১৩ তম শত আজীবন রক্তদাতা সম্মাননা অনুষ্ঠান এ সেবা আরো বিকশিত হোক



কাজী শামসুর রহমান

১৩ মে ও ২৪ মে অনুষ্ঠিত হলো শত আজীবন রক্তদাতা সম্মাননা অনুষ্ঠানের ১১২ ও ১১৩ তম আয়োজন। ন্যূনতম তিন বার রক্তদান করেছেন এমন দুই শতাধিক আজীবন রক্তদাতাকে এ দুটি অনুষ্ঠানে সম্মাননা জানানো হয়।

১১২ তম আয়োজনের প্রধান অতিথি ছিলেন বিজিএমইএ ইউনিভার্সিটি অব ফ্যাশন এন্ড



প্রফেসর ড. মো. আখতারুজ্জামান

টেকনোলজি-র অ্যাপারেল ম্যানুফ্যাকচার এন্ড টেকনোলজি বিভাগের প্রধান কাজী শামসুর রহমান। তিনি বলেন, 'স্বৈচ্ছা রক্তদাতারা যেভাবে মানুষের সেবায় কাজ করছে, তা অত্যন্ত প্রশংসনীয়। এই অতুলনীয় উদ্যোগের জন্যে কোয়ান্টাম স্বৈচ্ছা রক্তদান কার্যক্রমকে আমি অভিনন্দন জানাই এবং বিশ্বাস করি, তাদের কার্যক্রম আরো বিকশিত হবে।'

এ অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশনের পরিচালক সমন্বয় মিসেস সুরাইয়া রহমান।

১১৩ তম আয়োজনে প্রধান অতিথি ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা অনুষদের ডীন প্রফেসর ড. মো. আখতারুজ্জামান। রক্তদাতাদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, 'মানবসেবার মতো বড় কোনো কাজ মানুষের জীবনে নেই। রক্তদাতারা নিঃশর্ত ও নিঃস্বার্থভাবে দান করে যাচ্ছেন। কোয়ান্টাম স্বৈচ্ছা রক্তদান কার্যক্রমের সাথে আমাদের তরুণরা মানবসেবার যে কাজটি করছে তা আমাদের অভিভূত করেছে।

রক্তদান করলে রক্তদাতার কোনো ক্ষতি হয় না- এই বিষয়টি সবাইকে জানাতে হবে। তাহলেই বিশুদ্ধ রক্তের এ সেবাকে আরো বেশি ছড়িয়ে দেয়া সম্ভব। কোয়ান্টামে এসে যে সময়ানুবর্তিতা এবং শৃঙ্খলাবোধ দেখলাম তা মনে রাখার মতো। কোনো দেশি-বিদেশি অনুদান ছাড়াই নিজেদের অর্থায়নে কল্যাণকর কাজগুলো কোয়ান্টাম পরিচালনা করেছে। এর চেয়ে মহৎ উদ্যোগ আর কী হতে পারে!' এ অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশনের মহাপরিচালক মাদাম নাহার আল বোখারী।

প্রত্যেক রক্তদাতাকে একটি সার্টিফিকেট, আইডি কার্ড ও বিশেষ ক্রেস্ট প্রদান করা হয়। শত আজীবন রক্তদাতা সম্মাননা অনুষ্ঠানের এ দুটি আয়োজনে রক্তদাতারা ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন কোয়ান্টাম পরিবারের সদস্যরা।

কোয়ান্টাম বুলেটিন : জুলাই ২০১৫ ॥ সম্পাদক : অধ্যাপিকা খাদিজা মাহতাব ॥ নাহার আল বোখারী, মহাপরিচালক, কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন কর্তৃক
৩১/ভি শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদীন সড়ক, শান্তিনগর, ঢাকা-১১১৭ থেকে প্রকাশিত ও উইন্ডোজ প্রিন্টিং সেন্টার থেকে মুদ্রিত ॥ **গুডেচ্ছা মূল্য - ৫ টাকা**
Phone : 9341441, 8319377, 9355756 Mobile : 01714-974333, 01711-671858, 09613-002025 ■ E-mail : bulletin@quantummethod.org.bd

বন্যাদুর্গত এলাকায় ত্রাণ কার্যক্রম শুরু

সাম্প্রতিক সময়ে অতিবৃষ্টির কারণে দেশের উপকূলীয় ও দক্ষিণাঞ্চলের বিভিন্ন এলাকা বন্যা কবলিত হয়েছে। পানিবন্দি হয়ে মানবেতর জীবনযাপন করছে হাজার হাজার মানুষ। আক্রান্ত এলাকায় দুর্গত মানুষের সাহায্যে ইতোমধ্যেই কাজ শুরু করেছে কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন।

স্থানীয় প্রশাসন ও জনপ্রতিনিধিদের সহায়তায় কক্সবাজার জেলার পেকুয়া, রামু ও চকরিয়া উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়নে আক্রান্ত পরিবারগুলোর তালিকা প্রণয়ন করেছে ফাউন্ডেশনের চট্টগ্রাম সেন্টার।

এরপর সরেজমিনে পরিদর্শন এবং যাচাই করে ডেমশিয়া, পূর্ব বড় ভেওলা ও কানাখালী ইউনিয়নের সবচেয়ে দুর্গত ও অবহেলিত এক হাজার পরিবারের মাঝে ত্রাণ বিতরণ করা হয়েছে। সে-সব এলাকায় চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, চকরিয়া, ডুলাহাজরা ও বান্দরবান লামার প্রাজেক্ট, প্রো-মাস্টার ও শুভানুধ্যায়ীরা পূর্ণ উদ্যমে একযোগে কাজ করে চলেছেন।

বিতরণকৃত ত্রাণসামগ্রীর মধ্যে রয়েছে শুকনো খাবার যেমন : খেজুর, মিষ্টি টোস্ট বিস্কিট, খাবার স্যালাইন ইত্যাদি এবং জীবনধারণের জন্যে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র সংরক্ষণে বড় পলি ব্যাগসহ আরো কিছু উপকরণ।

এর পাশাপাশি প্রতিটি পরিবারের শিশুদের জন্যে দেয়া হয়েছে তিন সেট করে নতুন জামা। আর এ সমস্ত ত্রাণসামগ্রী চট্টর ব্যাগে ভরে মেশিনে সেলাই করে দুর্গতদের কাছে পৌঁছে দেয়া হয়। একটানা ২১ ঘণ্টা কাজ করে কোয়ান্টারার এসব ত্রাণসামগ্রী প্রস্তুত করেন।

দান করুন

বন্যা পরিস্থিতির উন্নতি হলে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষদের পুনর্বাসনেও সহযোগিতা করার প্রস্তুতি শুরু করেছে ফাউন্ডেশন। বরাবরের মতোই এবারও প্রাকৃতিক দুর্যোগে আক্রান্তদের জন্যে ত্রাণ তহবিল সংগ্রহের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

এ লক্ষ্যে গুরুজী ও মা-জী ফাউন্ডেশনের সকল স্তরের কর্মী ও সদস্য এবং শুভাকাঙ্ক্ষীদের সবাইকে তাদের একদিনের আয় (অথবা ব্যয়) এই পুনর্বাসন ও ত্রাণ তহবিলে জমা দেয়ার আহ্বান জানিয়েছেন।

আপনিও এতে অংশ নিন। আসুন, আমরা সজ্জবদ্ধভাবে দুর্গত মানুষের পাশে দাঁড়াই।



কোয়ান্টাম বুলেটিন

আগস্ট ২০১৫

অনন্য মানুষ আবদুল কালাম

নৈতিক শক্তির পুনর্জাগরণের লক্ষ্যেই তিনি কাজ করেছেন

এ পি জে আবদুল কালাম এক অনন্য মানুষ। আধুনিক মানুষের মধ্যে নৈতিক শক্তির জাগরণের লক্ষ্যেই তিনি নিজের জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। ২৯ জুলাই অর্গানায়ারদের একটি অনুষ্ঠানে প্রয়াত এ কর্মবীরের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করে একথা বলেন গুরুজী শহীদ আল বোখারী মহাজাতক।

তিনি বলেন,

ভারতের রাষ্ট্রপতি হিসেবে দায়িত্ব নেয়ার পর আবদুল কালাম একটি ব্যাপারে বিশ্বনেতৃবৃন্দ ও রাষ্ট্রপ্রধানদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। সবার প্রতি তার আস্থান ছিল, তরুণ প্রজন্মকে নৈতিক শিক্ষায় শিক্ষিত করে গড়ে তুলতে হবে। নৈতিক চেতনায় উজ্জীবিত করতে হবে। কারণ, সারা পৃথিবীতে আজকের এই সর্বশাসী দুর্নীতি ও অরাজকতার মূলে নৈতিক শিক্ষার অভাব।

গুরুজী বলেন, “কালাম” শব্দের অর্থ হলো বাণী। আমরা যদি দেখি তার পুরো জীবনটাই একটা বাণী। এ বাণী জ্ঞান, কর্ম ও নৈতিকতার। তার কথা ও কাজ দিয়ে উত্তর প্রজন্মের কোটি মানুষের হৃদয়ে তিনি বেঁচে থাকবেন এক অনন্ত অনুপ্রেরণার উৎস হয়ে। তার মতো সত্যিকারের কর্মপ্রেমী মানুষ এ উপমহাদেশে শুধু নয়, পুরো বিশ্বেই বিরল।

এ পি জে আবদুল কালাম ছুটিতে বিশ্বাসী ছিলেন না। সর্বতোভাবে তিনি ছিলেন একজন কর্মে বিশ্বাসী মানুষ। কাজই ছিল তার আনন্দ। যে কারণে তার অনুরোধ ছিল—“আমার মৃত্যুতে ছুটি ঘোষণা করো না। আমাকে যদি ভালবাসে, একদিন বরং অতিরিক্ত কাজ করো।”

গুরুজী বলেন, স্রষ্টার প্রতিনিধি হিসেবে এটিই হলো একজন মানুষের



সঠিক জীবনদৃষ্টি। কাজই জীবনকে সার্থক করে। বিকশিত ও আলোকিত করে। কাজের প্রতি এমন প্রেম অনুভব করতে পেরেছিলেন বলেই একটি সাধারণ পরিবারের সন্তান হয়েও তিনি বিশ্বব্যাপী বরণীয় হয়েছেন। কারণ, একজন মানুষের সবচেয়ে বড় পরিচয় তার কর্ম। একদিকে

তিনি যেমন ছিলেন বর্তমান বিশ্বের একজন প্রভাবশালী বিজ্ঞানী, তেমনি ছিলেন কল্যাণচিন্তা ও নৈতিকতায় অনুপ্রাণিত এক অনন্য ব্যক্তিত্ব। তিনি ছিলেন এক সত্যিকারের ধ্যানী, জ্ঞানী ও কর্মী।

জীবনের শুরুতেই পরিবার থেকে নৈতিক শক্তি ও চেতনায় উদ্ভূত হয়েছিলেন আবদুল কালাম। আর এ তিনি উপলব্ধি করেছিলেন—“একটি দেশকে যদি দুর্নীতিমুক্ত করতে এবং দেশের মানুষগুলোকে সুন্দর মনের করে গড়ে তুলতে হয়, তবে সে কাজটি করতে পারেন সমাজের তিন জন মানুষ—একজন বাবা, একজন মা এবং একজন শিক্ষক।” আমরা দেখি, জীবনের শেষ মুহূর্তটি তিনি শিক্ষকতার মধ্য দিয়েই ব্যয় করলেন। কিশোর-তরুণদের মাঝে নৈতিক শিক্ষার আলো ছড়িয়ে দিতে দিতেই যাত্রা করলেন মহাজাগতিক সফরে, যা ছিল তার একান্ত চাওয়া—“পৃথিবীকে বিদায় জানাতে চাই কাজ করতে করতে, দাঁড়িয়ে এবং খুব সংক্ষিপ্ত সময়ে”।

গুরুজী বলেন, এমন কর্মময় মৃত্যুই সৌভাগ্যের মৃত্যু, শহীদ মৃত্যু এবং একজন বিশ্বাসীর মৃত্যু। এটাই যেন আমাদের সবার চাওয়া হয়। পরম করুণাময় আমাদের কবুল করুন।

কোয়ান্টামে যাত্রা শুরু নতুন শিশুকাননের



বান্দরবান লামার কোয়ান্টামে ৫৪টি এতিম শিশুকে নিয়ে যাত্রা শুরু করল নতুন শিশুকানন। এ শিশুদেরকে আন্তরিক পরিচর্যায় আলোকিত মানুষ করে গড়ে তোলাই ফাউন্ডেশনের লক্ষ্য।

নতুন শিশুকাননে স্থান পাওয়া এ শিশুদের ১৩ জন বাঙালি এবং মারমা, মুরং, চাক, ত্রিপুরা, চাকমা, তঞ্চঙ্গ্যা জাতিগোষ্ঠীর ৪১ জন। এ শিশুদের কেউ মাতৃহীন, কেউ পিতৃহীন, কারো মা-বাবা কেউই নেই, কেউ মা-বাবার বিচ্ছেদের ফলে অভিভাবকহীন। এমন নানা কারণে অনিশ্চিত হয়ে পড়েছিল এদের ভবিষ্যৎ। তাই কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন নিয়েছে এই শিশুদের অভিভাবকত্ব।

ইতোমধ্যেই এ শিশুদের পাঠ কার্যক্রম শুরু হয়েছে কোয়ান্টামের বোধিছড়া পাবলিক স্কুলের শিশুশ্রেণী থেকে চতুর্থ শ্রেণী পর্যন্ত। তাদের সার্বক্ষণিক তদারকির জন্যে রয়েছে কোয়ান্টাম শিশুকানন আবাসিকের উদ্যমী ও অভিজ্ঞ কর্মীবৃন্দ।

অক্টোবরে ২০তম রিয়েলাইজেশন প্রোগ্রাম

আগ্রহীরা আবেদন করুন

অক্টোবরে ২টি ব্যাচে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে ২০তম কোয়ান্টাম মেথড রিয়েলাইজেশন প্রোগ্রাম। ঢাকার কাকরাইলস্থ আইডিইবি মিলনায়তনে ১ম ও ২য় ব্যাচ অনুষ্ঠিত হবে যথাক্রমে ৯-১২ ও ১৬-১৯ অক্টোবর। ধ্যানের স্তরে নিজেকে এগিয়ে নেয়ার এ অনন্য প্রোগ্রামে অংশগ্রহণের প্রাথমিক আবেদনপত্র আগামী ২১ আগস্টের মধ্যে ফাউন্ডেশনে অথবা নিকটবর্তী শাখা সেল সেন্টারে জমা দিন।



কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ও ভাইস-চেয়ারম্যান এবং কোয়ান্টাম বুলেটিনের সম্পাদক কাজী মাহতাব উদ্দিন আহমদ। পেশাজীবনে তিনি ছিলেন দেশের বিশিষ্ট শিল্পপতি এবং মৌসুমী ইন্ডাস্ট্রিজ-এর প্রতিষ্ঠাতা ও চেয়ারম্যান। গত ২৫ জুন তিনি (৬৯) ইন্তেকাল করেন। ইম্মা লিয়াহে ... রাজিউন। আমরা তার আত্মার অনন্ত প্রশান্তি কামনা করি এবং তার সামগ্রিক অবদান গভীর শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করি।

কাজী মাহতাব উদ্দিন আহমদ জীবনে ভরসাহুল মরণে প্রেরণার উৎস

হয়ে যায় না। একজন মানুষকে স্বাবলম্বী হওয়ার জন্যে অনুপ্রাণিত করে তোলাটাই সত্যিকারের সামাজিক দায়িত্ব পালন।

এছাড়াও চারপাশের সবার ছোটখাটো প্রয়োজনের দিকেও তার থাকত তীক্ষ্ণ মনোযোগ। প্রায়ই বলতেন, ‘একা বড় হওয়া যায় না, সবাইকে সাথে নিয়েই বড় হতে হয়।’ কোথাও বেড়াতে যেতেন যখন, বড় গাড়ি ভাড়া করতেন যাতে অনেকে যেতে পারে। আর খুব সহজেই মিশে যেতে পারতেন যে-কোনো পরিবেশে। প্রথম পরিচয়েই প্রাণখোলা আন্তরিক হাসি দিয়ে সবাইকে আপন করে নিতেন।

পরিবার, পেশা এবং সমাজ-এই তিনের মধ্যে এক অপূর্ব সমন্বয় সাধন করতে পেরেছিলেন তিনি। তার ছোট ছেলে কাজী ইমতিয়াজ (বর্তমানে মৌসুমী ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড-এ হেড অব বিজনেস ডেভেলপমেন্ট হিসেবে কর্মরত) বলছিলেন, আবু অফিসের ফাইল কখনো বাসায় নিয়ে আসতেন না। পুরো সপ্তাহজুড়ে ব্যবসার কাজে কঠোর পরিশ্রম করতেন। কিন্তু শুক্রবারটা রাখতেন শুধুই পরিবারের জন্যে। আর কিউট-এ যোগ দেয়ার পর তার সাংগঠনিক দক্ষতার পরিচয় পেলাম। কাজের ব্যাপারে তার নিষ্ঠা দেখে আমি কাজকে ভালবাসতে শিখেছি।

ছেলে হিসেবে আলাদা কোনো সুবিধা আমাকে দেন নি। উল্টো বলতেন, ‘অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে শেখো। নিজ যোগ্যতায় যতটুকু অর্জন করতে পারবে ততটুকুই তোমার।’ তার দেখানো পথ অনুসরণ করা পরিশ্রমের ও কষ্টের। কিন্তু গন্তব্যে পৌঁছতে পারলে দেখব সাফল্য দুহাত বাড়িয়ে অপেক্ষা করছে।

অসংখ্য মানুষকে বিভিন্ন প্রয়োজনে তার কাছে আসতে দেখেছি। একবার প্রশ্ন করেছি ফেললাম, ‘আবু, তোমার কি মনে হয় না, মানুষ তোমার সহানুভূতির সুযোগ নিয়ে সুবিধা আদায় করে নেয়?’ আবু হেসে বললেন, ‘দুনিয়ায় এরকম কিছু মানুষ থাকতে হয় যাদের কাছ থেকে অন্যেরা সুবিধা পেতে পারে। না হলে প্রকৃতিতে ভারসাম্য থাকবে কী করে?’

এভাবেই কাজী মাহতাব সারাজীবন মানুষের কল্যাণে তার মেধা, শ্রম, সময় ও সম্পদ ব্যয় করেছেন। কিন্তু সবসময়ই এড়িয়ে গেছেন প্রচারের আলো।

ফাউন্ডেশনের জন্মগত থেকেই কোয়ান্টাম চেতনার বিস্তার ও প্রসারে কাজী মাহতাব ছিলেন গুরুত্বপূর্ণ সহযোগী। কোয়ান্টাম মেথডের উদ্ভাবক গুরুজী শহীদ আল বোখারী মহাজাতকের সাথে তার পরিচয় সুদীর্ঘ ৫০ বছরের।

সদাকল্যাণকামী এ মানুষটি ফাউন্ডেশনের প্রতিটি কাজে ছিলেন অগ্রগামী। কোয়ান্টামের প্রতিটি অনুষ্ঠানে থাকত তার হাস্যোজ্জ্বল ও সরব উপস্থিতি। গুরুত্বপূর্ণ দিকে এ-দেশে অধিকাংশ মানুষেরই মেডিটেশনের ব্যাপারে স্পষ্ট ধারণা ছিল না। কাজী মাহতাব তখন থেকেই তার পরিবারের সদস্য, প্রতিষ্ঠানের কর্মী-পরিবেশক ও পরিচিত, বন্ধু, আত্মীয় সবাইকে কোর্সে অংশ নিতে উদ্বুদ্ধ করেছেন।

ফাউন্ডেশনের সব ধরনের সেবা-উদ্যোগে সবসময়ই ছিল তার প্রাণবন্ত ও সর্বাঙ্গিক অংশগ্রহণ। ২০০০ সালে যাত্রা শুরু করে কোয়ান্টাম ল্যাব। শত ব্যস্ততার মাঝেও তখন প্রায় প্রতিদিনই তিনি ল্যাবে এসেছেন। খোঁজখবর নিয়েছেন সবার, কাজে উৎসাহ দিয়েছেন। প্রাণখোলা হাসি-গল্পে উজ্জীবিত করেছেন সবাইকে। কোয়ান্টাম ল্যাবের কর্মীরা আজও সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতায় স্মরণ করে সে-সব দিনের কথা। দুঃসময়ের জন্য রক্ত সঞ্চয় করুন-সবাইকে রক্তদানে উদ্বুদ্ধ করতে কোয়ান্টাম স্বেচ্ছা রক্তদান কার্যক্রমের এ স্লোগানটি তারই উদ্ভাবিত।

এছাড়াও বান্দরবান লামার কোয়ান্টাম কসমো স্কুল এন্ড কলেজ প্রতিষ্ঠা এবং এর শিক্ষার্থী কোয়ান্টাদের খেলাধুলার ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন অন্যতম পৃষ্ঠপোষক। ক্রীড়াক্ষেত্রে বিভিন্ন জাতীয় প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে কোয়ান্টারা যখন ঢাকায় আসত, তাদের যাবতীয় দেখভালের সব ব্যবস্থা করতেন কাজী মাহতাব।

এ সবই তিনি করেছেন অক্লান্ত চিন্তে, সজ্ঞকে ভালবেসে। কাজী মাহতাব জীবনে যেমন ছিলেন সজ্ঞে লীন, তেমনি চাইতেন মৃত্যুর পরও থাকবেন সজ্ঞের সাথে। তাই তো হৃদয়মথিত দোয়া ও শুভকামনায় তাকে বিদায় জানিয়েছেন সংসজ্ঞের সাথি ও সহযাত্রীরা। আর কোয়ান্টামের বরকতময় স্থান আরোগ্যশালায় রচিত হয়েছে তার শেষ ঠিকানা। শান্তিতে তিনি ওখানে ঘুমিয়ে আছেন প্রিয় সজ্ঞের লাখে ভবিষ্যৎ কর্মীর অনন্ত প্রেরণার উৎস হয়ে।

পরম করুণাময় তাঁর সৎকর্মশীল লামা ও প্রিয়জনদের কাতারে কাজী মাহতাবকে স্থান দিন, এটিই আমাদের প্রার্থনা।

দেড় যুগ আগের কথা। প্রতিষ্ঠান-প্রধান হলেও কাজী মাহতাব নিজেই তখন বিভিন্ন বাজার পরিদর্শনে যেতেন। সেবার গেছেন যশোরে। ওখানে কিছুদিন আগে একটি দোকান আগুনে পুড়ে যায়। ঘটনা শুনে দোকানের মালিককে তিনি ডেকে পাঠালেন। বিস্তারিত শুনলেন সব। বুঝলেন, কিছুই আর অবশিষ্ট নেই সেই দোকানির। কিন্তু আছে তার উদ্যম এবং একটু সহযোগিতায় অনেকখানি এগিয়ে যাওয়ার শক্তি। সহযোগিতার দায়িত্বটা তখন নিজেই নিলেন। নতুন করে ব্যবসা শুরু করার জন্যে তাকে বিনামূল্যে দিলেন কিউট-এর বেশ কিছু পণ্য। আর দোকান মেরামতের জন্যে ধার দিলেন নগদ অর্থ।

না, ঘটনা এখানেই শেষ নয়। পরবর্তী এক বছর ধরে সেই ব্যবসায়ীর সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রাখলেন। ব্যবসা-সংক্রান্ত বিভিন্ন পরামর্শ দিয়ে সাহায্য করলেন। কয়েক বছরের মধ্যেই তিনি পরিণত হলেন তার এলাকার সবচেয়ে বড় ব্যবসায়ীতে। আজও তিনি কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করেন কাজী মাহতাবের কথা।

মফস্বলের ভাগ্যবিধিষ্ট একজন ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীকে পুনর্বাসনের জন্যে এক বছর ধরে নিয়মিত চেষ্টা করে যাচ্ছেন দেশের শীর্ষস্থানীয় একজন শিল্পপতি। আপাতদৃষ্টিতে অসম্ভব মনে হলেও কাজী মাহতাবকে যারা চেনেন, তারা এতে মোটেই অবাক হন নি। কারণ, সারাজীবন এই মানুষটির সান্নাই ছিল কীভাবে অন্যের উপকার করা যায়। যখনই জেনেছেন কেউ বিপদে পড়েছে, ছুটে গেছেন, সর্বতোভাবে পাশে দাঁড়ানোর চেষ্টা করেছেন। তার নিজের জীবনটাও যে একের পর এক প্রতিকূলতা জয় করে সাফল্যের চূড়ায় ওঠার গল্প।

১৯৪৬ সালে পুরনো ঢাকার চকবাজারে তার জন্ম। বাবা ছিলেন একজন কাপড় ব্যবসায়ী। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে পরে তার সাত বার তাদের দোকানটি আগুনে পুড়ে যায়। ভয়াবহ আর্থিক সংকট নেমে আসে পরিবারে। বড় ছেলে হিসেবে কাজী মাহতাবের ওপরই বর্তায় সংসারের দায়িত্ব। তখন তিনিই ছিলেন পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম সদস্য।

পড়াশোনা শেষ করার আগেই জীবিকার সন্ধানে নামতে হয় তাকে। বই ফেরি করা, ফ্রিল্যান্স সাংবাদিকতাসহ বিভিন্ন কাজ করেছেন। এর মাঝে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাংবাদিকতায় স্নাতক সম্পন্ন করেন। ১৯৭৩ সালে যোগ দেন তাবানি বেভারেজে। চাকরির পাশাপাশি একপর্যায়ে কসমেটিক্স ব্যবসা শুরু করেন ছোট ভাই কাজী আশরাফকে সাথে নিয়ে। ১৯৮২ সালে মৌসুমী ইন্ডাস্ট্রিজ প্রতিষ্ঠা করেন। দেশে যাত্রা শুরু করে প্রসাধন সামগ্রীর নতুন ব্র্যান্ড কিউট।

আশির দশকের গোড়ায় এ-দেশের বিপণন জগতে ব্র্যান্ডিংয়ের ব্যাপারে কোনো ধারণাই ছিল না। ব্যবসায়ী হিসেবে দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ও ক্ষুরধার চিন্তার অধিকারী কাজী মাহতাব তখনই বুঝতে পেরেছিলেন ব্যবসাক্ষেত্রে ব্র্যান্ডিং খুব গুরুত্বপূর্ণ। কিউট-কে জনপ্রিয় করে তোলার লক্ষ্যে তাই অভিনব সব কৌশল বেছে নেন তিনি।

জাতীয় পর্যায়ে বিভিন্ন ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় পৃষ্ঠপোষকতা ও সচেতনতামূলক বিলবোর্ড-বিজ্ঞাপন দিতে শুরু করলেন। এর পাশাপাশি তিনি মনোযোগ দেন সকল পর্যায়ের কর্মী ও পরিবেশকদের প্রতি। প্রত্যেকের সাথে সুসম্পর্ক গড়ে তোলেন। তিনি আন্তরিকভাবে চাইতেন তারাও সফল হোক স্ব স্ব ক্ষেত্রে। এজন্যে নিজেই হাতে-কলমে অনেক কিছু শেখাতেন ওদের। কেউ ভালো করলে পুরস্কৃত করতেন। তাদের পরিবারেরও খোঁজখবর রাখতেন নিয়মিত। এভাবেই কর্মচারীদের সাথে একটি পিতা-পুত্রের সম্পর্ক গড়ে ওঠে তার। তাদেরই একজন বলছিলেন, ‘স্যার ছিলেন বটবৃক্ষের মতো। বিপদে আগলে রাখতেন সবসময়’।

ব্র্যান্ডিং, রিলেশনশিপ মার্কেটিং-এর মতো আজকের আধুনিক বিপণননীতি ও ব্যবসায়িক ধারণাগুলো কাজী মাহতাব অত্যন্ত সফলভাবে প্রয়োগ করেছেন সেই তিন দশক আগেই।

তিনি বিশ্বাস করতেন, কাউকে কিছু টাকা দিয়ে দিলেই সামাজিক দায়িত্ব পালন

গুরুজীকে লেখা চিঠি

শ্রদ্ধেয় গুরুজী,
আমার সালাম নেবেন। আশা করি স্রষ্টার কৃপায় বেশ ভালো আছেন। আপনি জানেন, আমাদের পরিবারের চার জন সদস্যের সবাই কোয়ারান্টাম গ্রাজুয়েট। আমি, আমার স্ত্রী রত্না দত্ত এবং আমাদের দুই ছেলে সৌরভ দত্ত ও সুমিত দত্ত-সবাই ফাউন্ডেশনের সব কার্যক্রম সম্পন্ন করেছি।

এর মধ্যে সাইকি হিলিংয়ের অনুভূতি আপনাকে জানাচ্ছি। আমরা চার জন একসাথে সাইকি ও হিলিং কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করি। মডারেটরের পরামর্শ অনুসারে আমরা একটানা ৪০ সপ্তাহ হিলিংয়ে অংশগ্রহণ করি কোনো বিরতি ছাড়াই এবং যথাসময়ে সাইকি সনদ পাই। এরপরও আমরা নিয়মিত প্রতি মঙ্গলবারে চট্টগ্রাম সেন্টারে অনুষ্ঠিত হিলিং প্রোগ্রামে সপরিবারে অংশগ্রহণ করে আসছি।

মঙ্গলবারে আমাদের পারিবারিক বা সামাজিক অনুষ্ঠান থাকলেও আমরা যে-কোনো উপায়ে হিলিং প্রোগ্রামে অংশগ্রহণ করে থাকি। এমনকি ছেলেদের কলেজ বা ভার্চুয়ালি পরীক্ষা থাকলেও তারা সময় বের করে হিলিং প্রোগ্রামে অংশ নেয়। আসলে মঙ্গলবারে আমাদের জন্যে একটা খুব আনন্দের দিন। কারণ করণাময়ের কৃপায় মানুষের কল্যাণের জন্যে আমরা প্রভুর নিকট প্রার্থনা করার সুযোগ পাই।

হিলিং করতে গিয়ে জানতে পারি, মানুষের

শারীরিক সমস্যা ছাড়াও যে কত ধরনের সমস্যা আছে, যা সে কারো কাছে বলতে পারে না। অনেক সমস্যা আছে, যা কোনো ডাক্তার বা হেকিম সমাধান করতে পারবেন না। কিন্তু আমরা সৃষ্টিকর্তার কৃপায় তাদের জন্যে দোয়া বা হিলিং করতে পারি।

হিলিংপ্রার্থীদের মধ্যে অনেক চেনা-অচেনা ব্যক্তি থাকেন। পরিচিত ব্যক্তিদের আমরা হিলিংয়ের ব্যাপারে কিছু বলতে পারি না। কারণ হিলিংয়ের প্রতিটি তথ্য আমাদের নিকট আমানত। কিন্তু পরবর্তীতে যখন তাদের সমস্যা সমাধান বা রোগ থেকে মুক্তি লাভের কথা জানতে পারি, তখন খুব ভালো লাগে। আনন্দে মন ভরে যায়। সজ্ঞাবদ্ধভাবে সংকর্মে অংশগ্রহণ করে সৃষ্টির কল্যাণে কিছু কাজ করতে পারার জন্যে সৃষ্টিকর্তার নিকট কৃতজ্ঞতা জানাই।

এছাড়াও আমরা নিয়মিত নিজেদের জন্যে হিলিংয়ে নাম দেই। আমরা অনেক ভালো আছি। নিজেদের মনছবি অনুসারে আমরা নির্দিষ্ট লক্ষ্যের



দিকে এগিয়ে যাচ্ছি।

সৃষ্টিকর্তার নিকট প্রার্থনা করি, মৃত্যুর দিন পর্যন্ত যেন আমরা সবাই আপনার প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করে সৃষ্টির কল্যাণ ও সংস্কারের সাথে একাত্ম থেকে মানুষের জন্যে হিলিং বা দোয়া করতে পারি।

বিনীত

সুভাষ চন্দ্র দত্ত

৬৮ ব্যাচের গ্রাজুয়েট

পেইনকিলারে ব্যথা নয়, ক্ষয় হয় প্রাণ!

ব্যথানাশক আসক্তি। যুক্তরাষ্ট্রের একাধিক রাজ্যজুড়ে এ এখন দেখা দিয়েছে এক নতুন মহামারী হিসেবে। সে-দেশের সরকার, বিভিন্ন রাজ্যের গভর্নর এবং স্বাস্থ্যবিদরা উদ্ভূত এ পরিস্থিতিতে রীতিমতো উদ্বিগ্ন। যুক্তরাষ্ট্রের আসন্ন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের (২০১৬) প্রভাবশালী প্রার্থী হিলারি ক্লিনটনকে পর্যন্ত সে-দেশের সাধারণ মানুষের দাবির প্রেক্ষিতে এ বিষয়টি নিয়ে কথা বলতে হচ্ছে বিভিন্ন নির্বাচনী প্রচারণায়। দিতে হচ্ছে সুপরিপক্ক প্রতিশ্রুতি যে, কীভাবে তিনি এই নীরব মহামারী প্রতিহত করবেন।

মূলত ওপোয়েড গোত্রীয় ব্যথানাশকগুলোই (মরফিন, অক্সিকোডোন, হাইড্রোকোডোন ইত্যাদি) তীব্র আসক্তি সৃষ্টি করছে ভোক্তাদের মাঝে। কারণ এগুলোর আর হেরোইনের রাসায়নিক গঠন (কেমিকেল স্ট্রাকচার) একই রকম! এছাড়াও দেহে হেরোইনের মতো একই প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে এই মরফিন। তাই ক্রনিক ব্যথায় আক্রান্ত হয়ে মোটামুটি যারাই একবার এসব ওষুধ সেবন করছেন বা শিরাপথে ওপোয়েড জাতীয় ইঞ্জেকশন নিচ্ছেন তারা জড়িয়ে যাচ্ছেন ভয়াবহ নেশার জালে। এমনকি বেড়ে যাচ্ছে এইডস রোগীর সংখ্যা! কীভাবে?

যুক্তরাষ্ট্রের সেন্টার ফর ডিজিজ কন্ট্রোল এন্ড প্রিভেনশন-এর অনুসন্ধান দেখা গেছে, মরফিনের মতো ব্যথানাশকে আসক্তি হয়ে বাছবিচারহীনভাবে চলছে ইচ্ছেমতো ইঞ্জেকশন নেয়া। একই সূচ দিয়ে একাধিকবার এবং একাধিক জন ইঞ্জেকশন নিচ্ছেন। এমনও ঘটনা আছে যে, একই ব্যক্তি দিনে ২০ বার পর্যন্ত ইঞ্জেকশন নিচ্ছেন। কখনো আবার দেখা গেছে, একই পরিবারের তিন প্রজন্ম ব্যথানাশক ইঞ্জেকশন নিচ্ছেন একই সূচ ব্যবহার করে!

আর এদের অধিকাংশই এসব ওষুধে আসক্তি হয়ে পড়ছেন চিকিৎসকদের ব্যবস্থাপত্রের মাধ্যমে।

বলা হচ্ছে, গোটা আমেরিকা জুড়ে প্রায় ১০০ মিলিয়ন মানুষ আর্থাইটিস, মাইগ্রেন, ব্যাকপেইনসহ নানারকম ক্রনিক ব্যথায় আক্রান্ত। এ যেন এক ব্যথাভারাক্রান্ত জাতি! যা-হোক, এর ফলে প্রতিদিনই বিপুল সংখ্যক আমেরিকান ব্যথার প্রতিকার চেয়ে চিকিৎসকের শরণাপন্ন হচ্ছেন, আর চিকিৎসকরাও সমানে পরামর্শ দিচ্ছেন এসব ব্যথানাশকের। যারা আবার চিকিৎসকের ব্যবস্থাপত্র জোগাড় করতে পারছেন না, তারা ঠিকই এসব ওষুধ সংগ্রহ করে নিচ্ছেন কালোবাজার থেকে।

যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব হেলথ-এর মতে, ওপোয়েড সেবনকারী ৯৪ লক্ষ আমেরিকানের মধ্যে ২১ লক্ষই এতে আসক্ত হয়ে পড়েছেন এবং এরা এসব ওষুধের জন্যে কালোবাজারের খপ্পরে পড়ার ঝুঁকিতে আছেন।

আরো ভয়াবহ তথ্য হলো, প্রতি পাঁচ জনের মধ্যে চার জন হেরোইন সেবনকারী জানিয়েছেন, নেশার জগতে তাদের প্রবেশ ঘটেছে চিকিৎসকের ব্যবস্থাপত্রে উল্লিখিত ব্যথানাশক সেবনের পথ ধরে। আর যুক্তরাষ্ট্রে গড়ে ৪৬ জন মানুষ প্রতিদিন মৃত্যুবরণ করছেন মরফিন ওভারডোজের কারণে। এবং হেরোইন সেবনজনিত কারণে মৃত্যুর হার এর দ্বিগুণ! বিশেষজ্ঞরা জানিয়েছেন, এক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি ঝুঁকিতে আছেন মধ্যবয়সী আমেরিকানরা। বর্তমানে যে-কোনো দুর্ঘটনা ও সহিংসতাজনিত মৃত্যুর চেয়েও অতিরিক্ত ওপোয়েড সেবনজনিত কারণে মধ্যবয়সীদের মৃত্যুর হার সে-দেশে চের বেশি!

শুরুতে অবস্থা এমন ছিল না। বিশ শতকের প্রায় পুরোটা সময় জুড়ে ক্রনিক ব্যথার রোগীরা প্যারাসিটামল ও এসপিরিন জাতীয় ওষুধ সেবন করতেন। হেরোইনের জাতি ভাই মরফিন তখন ব্যবহৃত হতো হাড় ভাঙা এবং সার্জারি-পরবর্তী



ব্যথার ক্ষেত্রে, তা-ও খুব স্বল্পমেয়াদী ডোজে। আর দীর্ঘদিন মরফিন সেবনে এতে আসক্তির ঝুঁকি বাড়ে বলে দীর্ঘমেয়াদী ডোজে এটি ব্যবহৃত হতো কেবল অন্তিম পর্যায়ের ক্যান্সার রোগীদের ব্যথামুক্তির জন্যে।

কিন্তু আশির দশকের শেষদিকে এসে পরিস্থিতি হঠাৎ করেই বদলে যেতে শুরু করে। যে-কোনো ক্রনিক ব্যথার জন্যেও চিকিৎসকেরা মরফিন জাতীয় ওষুধ প্রেসক্রাইব করতে শুরু করেন হরদম। যদিও স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা বলছেন, ক্রনিক ব্যথার ক্ষেত্রে মরফিনের উপযোগিতা যে সমস্ত গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে সে-সব খুবই দুর্বল মানের গবেষণা!

এছাড়াও গুরুতর অভিযোগের তীর উঠেছে ওষুধ কোম্পানিগুলোর দিকে। যুক্তরাষ্ট্রে চিকিৎসকদের জন্যে সরকারি উদ্যোগে পরিচালিত বেশ কিছু প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে (মূলত ব্যথা নিরাময় বিষয়ক) বিপুল পরিমাণ অর্থ সহায়তা দিচ্ছে তারা। শুধু তা-ই নয়, ২০০৭ সালে সে-দেশের 'ফেডারেশন অব স্টেট মেডিকেল বোর্ডস'-কে ব্যথা নিরাময় বিষয়ক একটি গাইডলাইন বুক প্রকাশের জন্যে মরফিন জাতীয় ওষুধ নির্মাতা প্রতিষ্ঠানগুলো অনুদান দিয়েছে ৫ লক্ষ ৮৬ হাজার ডলারেরও বেশি অর্থ। ব্যথা নিয়ে ব্যবসা রীতিমতো জমজমাট!

তথ্যসূত্র : টাইম ম্যাগাজিন (১৫ জুন, ২০১৫)



১৯৯৪ সালে প্রথম কোয়ান্টাম উৎসবে জাতীয় অধ্যাপক ডা. নুরুল ইসলামের কাছ থেকে শুভেচ্ছা স্মারক গ্রহণ করছেন

“তার কাজের মধ্যেই তিনি বেঁচে থাকবেন”

খুব বিনয়ী মানুষ ছিলেন কাজী মাহ্‌তাব। বয়সের ব্যবধান বা উঁচু সামাজিক অবস্থান-কোনোটাই কাউকে বুঝতে দিতেন না। সবাই মন খুলে কথা বলতে পারত তার সাথে। দেখেছি সবার সাথে লামা যাওয়ার সময় একত্রে বাসে চড়ে গেছেন, ব্যক্তিগত গাড়িতে নয়।

তার উপস্থিতি যে-কোনো প্রোগ্রামকে প্রাণবন্ত করে তুলত। যারাই তার সাথে কাজ করার সুযোগ পেয়েছি, কেউ তাকে ভুলতে পারব না। ফাউন্ডেশনের জন্যে তিনি ছিলেন মহীরুহ। যে-কোনো সমস্যায় তাকে জানালে নিশ্চিন্ত থাকতাম একটা ব্যবস্থা হয়ে যাবে। হয়তো শুনেছেন ল্যাবে রক্ত রাখার জায়গা নেই, তিনি তৎক্ষণাৎ সমাধানের উদ্যোগ নিয়েছেন। জাতীয় পর্যায়ে যে-কোনো দুর্ঘটনা-বন্যা, সিডার কিংবা রানা প্লাজা ধ্বংস, সঙ্ক্ষে সবার আগে এগিয়ে এসেছেন। তিনি উপকার করে কাউকে বুঝতে দিতেন না যে, উপকার করলেন। তার মৃত্যু এক অপূরণীয় ক্ষতি। তবে আমরা তাকে বিদায় জানাই নি। যতদিন ফাউন্ডেশন থাকবে, তার কাজ ও অবদানের মধ্য দিয়ে তিনি বেঁচে থাকবেন সবার মাঝে।

সুরাইয়া রহমান, পরিচালক সমন্বয়, কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন



রাড ক্যাম্পে একজন শেখা রক্তদাতার সাথে

৪ কোয়ান্টাম বুলেটিন

“সঙ্ঘের নির্দেশ সানন্দে অনুসরণ করতেন”

কাজী মাহ্‌তাব পেশা-বাসার উর্ধ্বে সঙ্ঘকে অবস্থান দিয়েছিলেন। যত ব্যস্ততাই থাকুক, কোয়ান্টামের প্রোগ্রাম কখনো মিস করতেন না। কোয়ান্টাম যাকাত ফান্ড, মাটির ব্যাংক কার্যক্রমের বিস্তারের

জন্যে অভিনব সব উপায় বের করতেন।

গুরুজীর সাথে গভীরভাবে একাত্ম ছিলেন। গুরুজীর প্রতিটি নির্দেশ তিনি সানন্দে অনুসরণ করতেন। কাছের মানুষদের বলতেন, ‘গুরুজী ও সঙ্ঘের ছায়া না থাকলে আমি এত সফল হতে পারতাম না।’ তার জীবন থেকে আমরা এই শিক্ষা নিতে পারি যে, একজন মানুষ চেষ্টা করলে পরিবার পেশা ও সঙ্ঘের প্রত্যেকটিতেই প্রথম হতে পারে। তার জন্যে প্রার্থনা করি, স্রষ্টা যেন তার সৎকর্মগুলো কবুল করেন।

মওলানা ছায়ীদুল হক, বিশিষ্ট ইসলামি চিন্তাবিদ ও আর্ডেন্টিয়ার, কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন

“তাকে দেখে শিখেছি কীভাবে সঙ্ঘকে অগ্রাধিকার দিতে হয়”

ফাউন্ডেশনের গুরুত্ব দিনগুলোতে গুরুত্বপূর্ণ সাংগঠনিক ব্যাপারে কাজী মাহ্‌তাব চমৎকার সব আইডিয়া বের করতেন। তার মতো ধারাবাহিকভাবে সঙ্ঘের কাজে লেগে থাকতে কাউকে দেখি নি। তার কাছে আমরা শিখেছি কীভাবে সঙ্ঘকে অগ্রাধিকার দিতে হয়। ফাউন্ডেশন ছিল তার মন-প্রাণ। কোনো সমস্যায় পড়লে তিনি এমনভাবে উজ্জীবিত করতেন যে, নতুন করে শক্তি ফিরে পেতাম। বাসা পেশা ও সঙ্ঘের মাঝে চমৎকার এক ভারসাম্য বজায় রাখতে পারতেন। পারিবারিক জীবনে যেমন সফল ছিলেন, সঙ্ঘেও তেমনি ছিলেন সফল সংগঠক।

ফাউন্ডেশনে প্রচুর সময় দিলে ব্যক্তিই যে সফল হয়, তার জ্বলন্ত প্রমাণ কাজী মাহ্‌তাব। সঙ্ঘের কল্যাণে শ্রম মেধা ও অর্থ দান করলে এর বাই-প্রোডাক্ট হিসেবে সাফল্য আসবেই। তিনি স্বপ্ন দেখতেন, কোয়ান্টাম হাজার বছর ধরে মানুষকে আলোর পথ দেখাবে। তার এই স্বপ্নপূরণে কাজ করে চলাই হবে তার প্রতি প্রকৃত শ্রদ্ধা প্রকাশ।

শামছুন নাহার হুদা, মোমেন্টারি, উত্তরা শাখা, কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন



লামার কোয়ান্টামে দুস্থ মানুষের মাঝে কোরবানির গোশত বিতরণ করছেন কাজী মাহ্‌তাব

“নিয়ম অনুসরণে তিনি ছিলেন বিনয়ী ও শ্রদ্ধাশীল”

ধ্যান উৎসব ২০০৫-এর কথা। প্রোগ্রামের একপর্যায়ে নির্দেশনা এলো, পুরুষ ধ্যানযাত্রীরা ধ্যানঘরে এবং মহিলারা বাংলাতে অবস্থান করবেন। মাইক্রোফোন থেকে আমি ঘোষণা দিলাম, পুরুষ ধ্যানযাত্রীদের এখন ধ্যানঘরে যেতে হবে-আদেশক্রমে মা-জী। এটা শোনার সাথে সাথেই কাজী মাহ্‌তাব স্যার দুই হাত উঁচিয়ে সবাইকে ধ্যানঘরের দিকে ডাকতে থাকলেন। সেদিন শেষ বিকেলের আলোতে তার ওই সবাইকে ডাক দেয়ার দৃশ্যটা এত বছর পর যখন মনে পড়ছে, শুধু চোখ ভিজে যাচ্ছে। বিস্মিত হয়েছি, এত সম্মানিত একজন মানুষ, কিন্তু নিয়মের প্রতি কতটা অনুগত, শ্রদ্ধাশীল ও বিনয়ী হলে নির্দেশ শুনে মুহূর্তেই তা পালনে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন!

ফাতেমা জেরীন, ৪র্থ ব্যাচের প্রো-মাস্টার



কোয়ান্টামে ধ্যান উৎসবে, একটি আনন্দময় মুহূর্তে

স্মরণে স্মৃতিতে কাজী মাহ্‌তাব

“বাবা ও নেতা হিসেবে তিনি অনুসরণীয়”

যেদিন কিউট-এ যোগ দিলাম আকবু ডেকে বললেন, ‘ম্যানেজমেন্ট দেখা যায় না, ছোঁয়াও যায় না। তবে চাইলে নিজের ভেতরে অনুভব করতে পারবে।’ তিনি কর্মীদের সবসময় অনুপ্রাণিত করতেন তারা যেন আর্থিক সাফল্যের চেয়ে সেবাকে প্রাধান্য দেয়। পাশাপাশি তাদেরকে সময়-সচেতন পরিশ্রমী ও দক্ষ হওয়ার দিক-নির্দেশনা দিতেন।

তিনি বিশ্বাস করতেন, ক্যারিয়ারে সফল হতে হলে পরিবারে সুখী হতে হবে। সকল পর্যায়ের কর্মীদের পারিবারিক জীবন সুন্দর করার পরামর্শ দিতেন। তিনি একটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে পারিবারিক বন্ধন ও সমর্মিতার পরিবেশ সৃষ্টি করে গিয়েছেন। আমার দৃষ্টিতে তার সাফল্যের মূল চাবিকাঠি ছিল স্রষ্টার প্রতি প্রবল বিশ্বাস, ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি ও সবাইকে সাথে নিয়ে এগিয়ে যাবার মানসিকতা। আমার কর্মজীবনের প্রকৃত শিক্ষক আমার বাবা। তিনি শুধু বাবা হিসেবেই সফল নন, নেতা হিসেবেও অসাধারণ ও অনুসরণীয়।

কাজী নেওয়াজ ইবনে মাহ্‌তাব, কাজী মাহ্‌তাব উদ্দিন আহমেদের জ্যেষ্ঠ পুত্র। চিফ অব মার্কেটিং এন্ড সেলস, মৌসুমী ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড

“তিনি ছিলেন সবার প্রিয়”

২৯ বছর ধরে স্যারকে খুব কাছ থেকে দেখেছি। কখনো তার কাছে কিছু চেয়ে নিরাশ হই নি। তিনি অনেক বড় হৃদয়ের মানুষ ছিলেন। একবার দিনাজপুর যাওয়ার সময় রাস্তার পাশে একটি চায়ের দোকানে থামলাম। সেখানে বাচ্চা একটি ছেলে কাজ করছিল। স্যার তাকে ডেকে তার খোঁজখবর নিলেন। চলে আসার সময় বাচ্চাটির হাতে ৫০০ টাকা দিলেন।

এরপর আরেকদিন ওই রাস্তা দিয়ে গাড়ি নিয়ে যাছি। স্যার আমাকে খোঁজ নিতে পাঠালেন যে, সেই চায়ের দোকানটি এখনো আছে কিনা। বাচ্চা ছেলেটি কি এখনো সেখানে কাজ করে?

স্যার এভাবেই একদম অপরিচিত মানুষের প্রতিও গভীর মমতা অনুভব করতেন। যখন যেখানেই যেতেন, তিনি ছিলেন সবার প্রিয়। স্যারকে কোনোদিন ভুলতে পারব না।

আনোয়ার হোসেন, কাজী মাহ্‌তাব উদ্দিন আহমেদের ব্যক্তিগত গাড়িচালক



ঈদ মোলাকাত ২০১১-তে জাতীয় অধ্যাপক ডা. এম আর খান ও মা-জীর সাথে

“গীবত শুনলে খুব অসন্তুষ্ট হতেন”

আকবু শত ব্যস্ততার মাঝেও আমাদের তিন ভাই-বোন প্রত্যেককে আলাদা করে প্রতিদিন সময় দিতেন। সেই সময়টায় তার পূর্ণ মনোযোগ থাকত আমাদের দিকে। ব্যবসা পরিচালনা করতে গিয়ে অনেক জটিলতা তাকে সামলাতে হতো। পরিবারের খুব কাছের সদস্যদের সাথে সমস্যাগুলো শেয়ার করতেন। কিন্তু এসব বলার সময় কখনোই কারো প্রতি তাকে ক্ষোভ প্রকাশ করতে দেখি নি।

বরং গীবত শুনলে খুব অসন্তুষ্ট হতেন। ছোটবেলা থেকেই বিভিন্ন বিষয়ে আমাদের সাথে আলোচনা করতেন। নিজস্ব মতামত দেয়ার জন্যে উৎসাহ দিতেন। মনোযোগ দিয়ে কথাগুলো শুনতেন। তারপর তার দৃষ্টিভঙ্গিটা জানাতেন। বিশেষভাবে সময়ের ব্যাপারে আমাদের সচেতন হতে বলতেন। এখন বুঝতে পারি, এ সবকিছুই তিনি করতেন আমরা যেন বাস্তব জীবনে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারি।

সানিয়া বিনতে মাহ্‌তাব, কাজী মাহ্‌তাব উদ্দিন আহমেদের কন্যা এবং প্রভাষক, পানিসম্পদ প্রকৌশল বিভাগ, রুয়েট এবং ভাদাজ উষ্টরাল ফেলো, সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং ও অ্যাপ্রায়েড মেকানিক্স বিভাগ, ম্যাকগিল বিশ্ববিদ্যালয়, কানাডা



সহধর্মিণী অধ্যাপিকা খাদিজা মাহ্‌তাব ও পরিবারের সবার সাথে কোয়ান্টামে, রমজান ২০১৪

আগস্ট ২০১৫

কোয়ান্টাম বুলেটিন

গ্রাজুয়েটদের প্রশ্ন ? উত্তর দিচ্ছেন গুরুজী

প্রশ্ন : আমার স্বপ্নের ইন্তেকাল করেছেন। আমরা তার নামে দানের নিয়ত করেছি। কিন্তু মৃত ব্যক্তির নামে কি দান হয়? নাকি যে টাকা দেবে দানটা তার নামে হবে?

উত্তর : মৃত আত্মীর জন্যে দোয়া এবং দান দুটোই অত্যন্ত কার্যকর। আপনারা তার অনন্ত শান্তির জন্যে দান করতে পারেন। এর পাশাপাশি মৃত ব্যক্তির জন্যে আল কোরআন বাংলা মর্মবাণী বিতরণ করুন, যত বেশি সম্ভব।

সম্প্রতি একজন বললেন যে, তার মরহুম বাবার চল্লিশা করবেন। কিন্তু একে তো এতে অনেক খরচ; উপরন্তু খেয়ে অধিকাংশ অতিথিই তৃপ্ত হয় না। অনেকে আবার বদনাম করতে করতে যায়। তাকে বললাম, চল্লিশা আমন্ত্রিতদের খাওয়াদাওয়া আর ভুরিভোজের জন্যে প্রয়োজন হতে পারে, কিন্তু মৃত ব্যক্তির কী উপকার হবে আমি বুঝি না।

জানতে চাইলাম, কতজনকে খাওয়াতে চান? বললেন, দুশ জনকে খাওয়াতে হবে এবং জনপ্রতি খরচ ন্যূনতম দুশ টাকা তো লাগবেই। বললাম, আপনার খরচ আরো কদমিয়ে দিচ্ছি। দেড়শ টাকা। বললেন, কীভাবে? বললাম, আপনি এই দুশ জনের কাছে দুশ আল কোরআন বাংলা মর্মবাণী নিয়ে যান। প্রত্যেককে বলুন যে, ভাই, আমি তো বাবার নামে চল্লিশা করতাম, কিন্তু তাতে যে টাকাটা খরচ হতো তা দিয়ে আল কোরআনের মর্মবাণী আপনাকে দিলাম। আপনি এই মর্মবাণী পড়ে বাবার জন্যে দোয়া করবেন।

এই দুশ জনের মধ্যে ১০ জন মানুষও যদি মর্মবাণী পড়ে উপকৃত হয়, যদি আলোর পথ পায় হেদায়েতের পথ পায়, যদি সত্যের পথে আসে, এটা আপনার বাবার জন্যে সদকায় জারিয়া হয়ে থাকবে। আর এ মর্মবাণী ঘরে থাকলে কেউ না কেউ এটা পড়বেই এবং যারা পড়বে তাদের মধ্যে কেউ না কেউ এ থেকে উপকৃত হবেই। অতএব চল্লিশায় ভুরিভোজের আয়োজনের চেয়ে ৪০ কপি মর্মবাণী বিতরণ করা অনেক উত্তম সংকর্ম।

মৃত আত্মীর জন্যে চল্লিশা খাওয়ানো হচ্ছে একটা সংস্কার। অর্থহীন সংস্কার অনুসরণের সাথে মৃত ব্যক্তির কল্যাণের কোনো সম্পর্ক নেই। তার চেয়ে বরং একজন মানুষকেও যদি আপনি কোরআনের জ্ঞানের আলোয় আলোকিত করতে পারেন, তাতে মৃত ব্যক্তির পারলৌকিক মুক্তির পথ সুগম হতে পারে।

প্রশ্ন : তকদির অর্থ কী? যদি সাফল্য-ব্যর্থতা পূর্ব নির্ধারিত হয়, তাহলে মানুষকে তার কৃতকর্মের জন্যে দায়ী করা হয় কেন? বিষয়টি বুঝিয়ে বলবেন?

উত্তর : আসলে তকদির গভীর অর্থবহ একটি শব্দ। তকদির অর্থ ভাগ্য নয়, তকদির অর্থ হচ্ছে আল্লাহর তৈরি প্রাকৃতিক আইন, যা ঠিক করে দেয় প্রত্যেক সৃষ্টির সুনির্দিষ্ট গঠন কাঠামো প্রকৃতি কী হবে।

সূরা ফোরকানের ২ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে, 'তিনিই সবকিছু সৃষ্টি করেছেন এবং তিনিই (তাঁর নীল নকশা অনুসারে) সকল সৃষ্টির তকদির (অর্থাৎ স্বভাবপ্রকৃতি বা বিকাশধারা ও পরিণতির প্রাকৃতিক আইন) নির্ধারণ করেছেন।'

মানুষের ক্ষেত্রে তকদিরের দুটো অংশ। একটা

বায়োলজিক্যাল। ডিএনএ-র প্রোথাম অনুযায়ী সে জন্মগ্রহণ করবে, তার গায়ের রঙ নির্ধারিত হবে। এটা একটা সুনির্দিষ্ট প্রক্রিয়া, প্রাকৃতিক নিয়মে সে বড় হয়ে উঠবে।

তকদিরের আরেকটা অংশ হলো কর্মের এবং কর্মফলের। বোখারী শরীফের প্রথম হাদীস হচ্ছে, 'ইনুমালা আমালু বিন নিয়্যতে' অর্থাৎ নিয়ত সকল কর্মের অঙ্কুর। নিয়তের ওপরই আপনার কর্মফল নির্ভর করবে।

বুদ্ধবাণীতে বলা হয়েছে, চিন্তা বা অভিপ্রায়ের প্রতিফলন ঘটে স্বভাব বা প্রকৃতিতে। যদি কেউ মন্দ অভিপ্রায় নিয়ে কথা বলে বা কাজ করে, দুঃখ তাকে অনুগমন করে। আর কেউ যদি সুচিন্তা নিয়ে কথা বলে বা কাজ করে, সুখ তাকে ছায়ার মতো অনুসরণ করে। অর্থাৎ প্রাকৃতিক আইন অনুসারে মন্দ চিন্তা আপনার জন্যে দুঃখ নিয়ে আসবে এবং ভালো চিন্তা নেচারাল ল অনুসারে সুখ নিয়ে আসবে।

যেমন ধরুন, আপনাকে একটি পা তুলতে বলা হলো। আপনার অপশন কিন্তু দুটো। আপনি ডান পা-ও তুলতে পারেন, বাম পা-ও তুলতে পারেন। কিন্তু যেই ডান পা তুলে ফেললেন, আপনার তকদির কিন্তু ফাস্ট স্টেপের জন্যে ডান পা-ই হয়ে গেল। মানে আপনার তকদির কিন্তু এখানে সেট হয়ে গেল। এটা আপনিই ঠিক করলেন।

আল্লাহ তায়ালা মানুষকে ভালো ও মন্দ সমস্ত জ্ঞানে অভিষিক্ত করেছেন। তারপর তাকে সিদ্ধান্ত নেয়ার স্বাধীনতাও দিয়েছেন।

সূরা বালাদের ১০ নম্বর আয়াতে পরিষ্কারভাবে আল্লাহ বলেছেন, 'আমি কি দুটি পথ দেখাই নি?' এই পথ দুটো হলো ধর্ম ও অধর্মের, অর্থাৎ ভালো ও মন্দ পথ।

একজন মানুষ সফল হবে নাকি ব্যর্থ হবে তা নির্ভর করবে সে কোন পথ বেছে নিচ্ছে তার ওপর। সে যখন একটা পথ বেছে নিল, তখন ওটার যা পরিণতি তা তাকে ভোগ করতে হবে। অর্থাৎ নেতিবাচকতার পথ বেছে নিলে নেতিবাচকতার যে পরিণতি, এটা আপনাকে ভোগ করতে হবে। আবার ইতিবাচকতার পথ বেছে নিলে ইতিবাচকতার সুফল আপনি ভোগ করবেন।

সফল হওয়ার পদ্ধতি আছে। কেউ যদি সফল হওয়ার পদ্ধতি অনুসরণ করে, সে সফল হবে। আবার ব্যর্থ হওয়ারও পদ্ধতি আছে। কেউ যদি জেনে বা না জেনে সেটা অনুসরণ করে, তাহলে প্রাকৃতিক নিয়ম ও আইন অনুসারে সে ব্যর্থ হবে।

অর্থাৎ আপনি যা পছন্দ করলেন, কর্ম করলেন, এই কর্মের ফল আপনাকে ভোগ করতে হবে। এটাই তকদির।

প্রশ্ন : আজকাল তরুণদের যে নৈতিক অবক্ষয় শুরু হয়েছে-নেশায় জড়িয়ে যাচ্ছে, সারারাত জেগে ফেসবুক, বাবা-মার সাথে দুর্ব্যবহার, ছেলেমেয়ের অবাধ মেলামেশা-এ সম্পর্কে দয়া করে কিছু বলার জন্যে অনুরোধ করছি।

উত্তর : শুধু ছেলেমেয়েদের দোষ দিয়ে লাভ নেই। এখনকার ছেলেমেয়েদের মতো দুঃখী তো আর কেউ নেই। আমরা মা-বাবারা ছেলেমেয়েদের বন্ধু হতে পারছি না। আর এখনকার পরিবারগুলোতে ভাই থাকলে বোন নেই, বোন থাকলে ভাই নেই। তাদের

মেলামেশার কোনো জায়গা নেই। আপনি একটা ফ্ল্যাটের মধ্যে তাকে বন্দি করে রাখছেন। ঘরের বাইরে যেতে দিচ্ছেন না।

আগে তো আমাদের সময় ভাইবোন মিলিয়ে আমরা মোটামুটি একটা ফুটবল টিম ছিলাম। তার ওপর ছিল কাজিনরা। মা-বাবা আমাদের দেখল কিনা, কথা বলল কিনা তা নিয়ে আমাদের কোনো মাথাব্যথা ছিল না। অভিযোগও ছিল না। কিন্তু এখনকার ছেলেমেয়েরা তো এর কিছুই পাচ্ছে না।

আমাদের দেশে যারা ভরণপোষণ করতে পারে না অর্থাৎ দরিদ্র পরিবারগুলোতে সন্তানের সংখ্যা বেশি। অন্যদিকে অবস্থাপন্ন পরিবারগুলোতে সন্তান মোটে একজন, বড়জোর দুজন। সঙ্গী ছাড়া সে বড় হচ্ছে। তখন সে আর কী করবে? সে-তো ভিডিও গেম খেলবে। কম্পিউটার ইন্টারনেট ফেসবুক নিয়ে ভার্চুয়াল ওয়ার্ল্ডে মেতে থাকবে। বাবা-মায়ের মতো বাচ্চাও নিজের জগৎ নিয়ে ব্যস্ত।

কথাগুলো শুনতে খারাপ লাগতে পারে, কিন্তু আমি কষ্ট থেকে বলছি। এখনকার ছেলেমেয়েরা খুব কষ্টে আছে। আমি প্রচুর চিঠি পাই বলে তাদের কষ্টটা আমি বুঝি।

অতএব ছোটবেলা থেকেই সন্তানদের সময় দিন। তাদের বন্ধু হোন। সন্তান আপনার কথা শুনবে। বখে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকবে না।

আর কী করবেন? বিভবান বা উচ্চ মধ্যবিত্ত যারা আছেন, তারা সম্ভব হলে অন্তত চারটি সন্তান নেন। সুসন্তান হিসেবে তাদের গড়ে তোলার জন্যে সাধ্যমতো প্রয়োজনীয় সময় ও মনোযোগ দেবেন। একজন আলোকিত সন্তান শুধু একটি পরিবারকেই নয়, সমাজ এবং গোটা দেশকে অনন্য উচ্চতায় নিয়ে যেতে পারে।

কিন্তু আমরা শুধু চিন্তা করি যে, কী খাওয়াব? সেই '৭০ সালে বলা হতো, জনসংখ্যা বাড়লে দেশে খাদ্যাভাব দেখা দেবে। কিন্তু আজ জনসংখ্যা ১৬ কোটি ছাড়িয়ে যাওয়ার পরও কি খাদ্যের অভাব হচ্ছে? বরং উদ্ভূত খাদ্য রপ্তানি হচ্ছে। অতএব খাওয়াব কী, এ চিন্তা করে সন্তান না নেয়া-এটা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ধারণা।

প্রশ্ন : আমি ঋণগ্রস্ত। এ থেকে কীভাবে মুক্তি পেতে পারি? ঋণগ্রস্ত অবস্থায় আমার অপচয় রোধ হচ্ছে না। আমাকে সুপারামর্শ দেবেন।

উত্তর : আপনাকে সুপারামর্শ দিয়ে কোনো লাভ হবে না। একজন মানুষ যদি ঋণগ্রস্ত অবস্থায় অপচয় করতে পারে, কারো পরামর্শে তার কোনো কাজ হবে না। তাই এ থেকে বেরোনের একটাই পথ-শান্তি। নিজের শান্তির ব্যবস্থা করুন। দেখবেন অপচয় একসময় বন্ধ হয়ে যাবে।

এ মাসের অটোসাজেশন

জীবনের একটি সহজ সত্য হচ্ছে, গন্তব্যে পৌঁছতে হলে কাজ ফেলে না রেখে আমাকে ক্রমাগত এগিয়ে যেতে হবে। আমি লাগাতার কাজ করব।

ব্যতিক্রমী আয়োজনে কোয়ান্টাদের উৎসবমুখর ঈদ



কোয়ান্টামে ঈদমেলায় উচ্ছ্বসিত কোয়ান্টারা

ঈদুল ফিতর উপলক্ষে কোয়ান্টাম কসমো স্কুল ও কলেজের কোয়ান্টাদের নিয়ে আয়োজন করা হয় ব্যতিক্রমী ঈদ উৎসব। বিভিন্ন ধরনের মজার মজার খেলা ও ইভেন্টস নিয়ে সাজানো হয় উৎসবটি। জিমন্যাস্টিকস, আচারি, হ্যাণ্ডবল, খো খো, দৌড় প্রতিযোগিতা ছাড়াও ছিল মজার খেলা দড়ি লাফ, মোরগ লড়াই। মেধাসৃজনের বিষয়গুলো নিয়েও ছিল আয়োজন-আবৃত্তি, রচনা প্রতিযোগিতা, সুন্দর হাতের লেখা, বিজ্ঞান প্রজেক্ট তৈরি, মজার গণিত ও সাধারণ জ্ঞান প্রতিযোগিতা।

এছাড়াও কোয়ান্টাদের জন্যে ছিল সম্মিলিত কাজের সুযোগ-বৃক্ষরোপণ ও নিজেদের আবাসন নিজেরাই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করা। ঈদের সাত দিন আগে থেকেই শুরু হয় কোয়ান্টাদের নিয়ে এই

কর্মযজ্ঞ। প্রতিটি খেলা ও ইভেন্টে ১ম, ২য় ও ৩য় স্থান অর্জনকারীরা পুরস্কার হিসেবে পায় ভিন্ন ভিন্ন মূল্যমানের কুপন। এই কুপন দিয়ে তারা ঈদমেলার নানা স্টল থেকে সংগ্রহ করে নেয় তাদের পছন্দসই জিনিস।

ঈদমেলা ছিল এ আয়োজনের অন্যতম আকর্ষণ। বিভিন্ন স্টলে হরেক রকমের পসরা নিয়ে সাজানো হয়েছিল মেলাটি। কোয়ান্টাদেরকে বড় ও ছোট দলে ভাগ করা হয় এবং বড়দের জন্যে ভ্যালি হিকমানে ও ছোটদের জন্যে গিরি ফিকরানে ঈদমেলা আয়োজন করা হয়। এ মেলায় বালমুড়ি, পিঠা ও হাতে তৈরি অন্যান্য সুস্বাদু খাবারের আটটি স্টল ছিল। এছাড়াও ছিল মজার মজার সব খেলনা নিয়ে আরো ১০টি স্টল। মেলায় কোয়ান্টাদের জন্যে বইয়ের দুটি স্টল ছিল, যা মেলার আকর্ষণকে বাড়িয়ে তোলে বহুগুণ। বইয়ের স্টলে কোয়ান্টাদের উপচে পড়া ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো। ঈদের দিন সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত অনুষ্ঠিত এ মেলা ছিল কোয়ান্টাদের উচ্ছ্বাস আর কোলাহলে পরিপূর্ণ।

দিনভর প্রাণবন্ত ঈদ উদযাপনের পর সন্ধ্যায় বর্ণাঢ্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। কোয়ান্টাদের বর্ণিল পরিবেশনা আর উচ্ছ্বসিত করতালিতে মুখর হয়ে ওঠে ঈদের সন্ধ্যা।

কোয়ান্টাম জুড়ে বিশাল এ আনন্দ আয়োজনের নেপথ্যে ছিল কোয়ান্টামের সকল স্তরের কর্মীরা। তাদের সাথে ছোট-বড় নানান কাজে সমান আনন্দে অংশ নেয় কোয়ান্টারা। খেলাধুলা, মেধা বিকাশ ও সজ্জবদ্ধ কাজের মধ্যে দিয়ে ঈদের খুশিকে সবার সাথে ভাগ করে নেয় কোয়ান্টারা।

রাজশাহীতে শুরু হলো কোয়ান্টাম স্বাস্থ্যসেবা

১২ জুন শুক্রবার রাজশাহী সেন্টারের উদ্যোগে রাজশাহী শহরে শুরু হলো কোয়ান্টাম স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রম। এ কার্যক্রমের আওতায় প্রতিদিন স্বাস্থ্যসেবা ও চিকিৎসা-পরামর্শ দিচ্ছেন একদল বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক।

রাজশাহীর বারিস মেডিকেল কলেজের সার্জারি বিভাগের বিভাগীয় প্রধান ও বিশিষ্ট সার্জন ডা. মঞ্জুরুল হকের তত্ত্বাবধানে এ কার্যক্রমটি পরিচালিত হচ্ছে। পূর্বে নাম তালিকাভুক্ত সাপেক্ষে প্রতিদিন বিকেল ৪টা থেকে ৫টা পর্যন্ত কোয়ান্টাম স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রমে যেকোনো এ সেবা পেতে পারেন।

ঠিকানা : রাজশাহী সেন্টার, ৫৩৪ শেরশাহ রোড, লক্ষ্মীপুর, রাজশাহী। মোবাইল : ০১৯১৪-৯৯৯৪৪৬, ০১৭১১-৮১৫৮২৭।

জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউটে কোয়ান্টাম সভা

৭ জুলাই জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউটে অনুষ্ঠিত হয় কোয়ান্টাম সভা। চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন অনুষ্ঠান প্রযোজনা ডিপ্লোমা কোর্সের শিক্ষার্থীদের নিয়ে এ সভায় ‘সফল ও সুখী জীবন গড়তে মেডিটেশনের গুরুত্ব’ প্রসঙ্গে আলোচনা করেন অর্গানায়ার ইঞ্জিনিয়ার প্রাণজিৎ লাল শীল। এছাড়াও ছিল শিথিলায়ন মেডিটেশন এবং অংশগ্রহণকারীদের আগ্রহে সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর পর্ব।

এ সভায় চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন অনুষ্ঠান প্রযোজনা ডিপ্লোমা কোর্সের ২২ জন শিক্ষার্থী ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব এ কে এম শামীম, হাশিম রেজা ও মসিহউদ্দীন শাকের। সভাটি আয়োজন করেন কোয়ান্টাম থ্রাজুয়েট ও বরণ্য সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব ম. হামিদ এবং সার্বিক সহযোগিতায় ছিলেন আর্ডেস্টিয়ার ও বিশিষ্ট অভিনেত্রী মোমেনা চৌধুরী।

কোয়ান্টাম আইসিটি-র সাথে যুক্ত হতে আগ্রহীরা নাম, রেজিস্ট্রেশন নম্বর, শিক্ষাগত যোগ্যতা ও পেশা উল্লেখ করে ই-মেইল করুন : ict@quantummethord.org.bd

মিরপুর ও চট্টগ্রামে ঈদ পুনর্মিলনী

২৪ জুলাই শুক্রবার কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন মিরপুর সেন্টারে অনুষ্ঠিত হয় ঈদ পুনর্মিলনী অনুষ্ঠান। সাদাকায়ন কার্যক্রমের পর আয়োজন করা হয় এ পুনর্মিলনীর। এতে ছিল ঈদ মোলাকাতের অনুভূতি বর্ণনা, শুকরিয়া মেডিটেশন, দেশাত্মবোধক গান এবং আল কোরআন বাংলা মর্মবাণী পাঠের গুরুত্ব নিয়ে বিশেষ ন্যাটিকা। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন আর্ডেস্টিয়ার কামাল পারভেজ ও রকিবুল হাসান জুয়েল। এতে অংশ নেন ৩৩২ জন থ্রাজুয়েট, প্রো-মাস্টার ও এসোসিয়েট।

২৮ জুলাই কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন চট্টগ্রাম সেন্টার আয়োজন করে ঈদ পুনর্মিলনী আলোকায়ন কার্যক্রম। এতে বিষয়ভিত্তিক আলোচনা, মেডিটেশন, কাউন্সেলিং সেবাসহ নিয়মিত কার্যক্রমের পাশাপাশি ছিল কোয়ান্টিয়ারদের নিয়ে বিশেষ সেশন ও সাংস্কৃতিক আয়োজন। এছাড়াও ঈদের পরদিন প্রো-মাস্টারদের সঙ্গে আরো নিয়মিত করতে আয়োজন করা হয় বিশেষ প্রোগ্রাম।

উৎসবমুখর এ দুটি আয়োজনের মূল লক্ষ্য ছিল ঈদের ছুটি শেষে কোয়ান্টাম পরিবারের সবাইকে সঙ্গে একাত্ম এবং নতুন কর্মোদ্দীপনা সৃষ্টি করা।

শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিচ্ছন্নতা করসেবা

৩০ জুলাই শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয় সেল-এর কোয়ান্টিয়াররা অংশ নেয় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা করসেবায়। ‘নিজেদের ক্লাসরুম নিজেরাই করব পরিষ্কার, রাখব পরিচ্ছন্ন’ এ প্রত্যয়কে সামনে রেখে তারা উদ্যোগ নিয়েছে ক্যাম্পাস জুড়ে সচেতনতা সৃষ্টির। বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃ-বিজ্ঞান বিভাগের ক্লাসরুম পরিচ্ছন্নতার মধ্য দিয়ে শুরু হয় তাদের করসেবা।

এ করসেবার শুভ উদ্বোধন করেন নৃ-বিজ্ঞান বিভাগের ভারপ্রাপ্ত বিভাগীয় প্রধান ও সহকারী অধ্যাপক সুমন আখন্দ। করসেবা শেষে তিনি বলেন, ক্লাসরুম পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকলে পড়তে ভালো লাগে, পড়াতেও ভালো লাগে। এতে ১২ জন কোয়ান্টিয়ারের সাথে আরো অংশ নেন নৃ-বিজ্ঞান বিভাগের ২৫ জন শিক্ষার্থী।

কর্মসূচি আগস্ট ২০১৫

প্যারেন্টিং প্রোগ্রাম : স্টেপ-১

৭ ও ৮ আগস্ট। কাকরাইল

কোয়ান্টাম ব্যায়াম কার্যক্রম

৭ ও ৮ আগস্ট। বনশ্রী (পুরুষ)

৭ ও ৮ আগস্ট। প্রশান্তি হল (মহিলা)

হৃদরোগ প্রতিরোধ ও নিরাময় কার্যক্রম

২১ ও ২২ আগস্ট। বনশ্রী

কোয়ান্টাম হিলিং ও সাইকি কার্যক্রম

২১ ও ২২ আগস্ট। কাকরাইল

বাংলা বাচন পরিশীলন কর্মশালা

২৮ ও ২৯ আগস্ট। বনশ্রী

জীবনে সফল হওয়ার পথ প্রথমায়ন

২৮ ও ২৯ আগস্ট। কাকরাইল

আবশ্যিক

কোয়ান্টাম কসমো স্কুল ও কলেজের জন্যে শিক্ষক/শিক্ষিকা/আবাসিক শিক্ষক (ন্যূনতম অনার্স পাশ), বিজ্ঞান বিভাগের জন্যে (পদার্থ বিজ্ঞান, রসায়ন, জীব বিজ্ঞান, উচ্চতর গণিত) শিক্ষক/শিক্ষিকা আবশ্যিক। বিএড ও নিবন্ধনকৃত প্রার্থীরা অগ্রাধিকার পাবেন। শিশুকানন ও শিশুসদনের শিক্ষার্থীদের দেখাশোনার জন্যে ব্রাদার, সিস্টার (ন্যূনতম এসএসসি পাশ) ও সিকিউরিটি গার্ড আবশ্যিক।

এছাড়াও কোয়ান্টাম-এর জন্যে কিছু সংখ্যক মালি, মাঠকর্মী প্রয়োজন। আগ্রহীরা যোগাযোগ করুন :

কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন

৩১/ভি শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদীন সড়ক,

শান্তিনগর, ঢাকা-১২১৭

ফোন : ৯৩৪১৪৪১, ০১৭১৪-৯৭৪৩৩৩

ঈদ মোলাকাত ২০১৫

অনাবিল আনন্দে বর্ষণমুখর ঈদ



গুরুতে যা ছিল কেবল গুরুজী ও মা-জীর আতিথেয়তায় কোয়ান্টাম সদস্যদের নিয়ে ঘরোয়া একটি আয়োজন, সময়ের পরিক্রমায় তা-ই রূপ নিয়েছে সুপারিসর ঈদ উৎসবে। প্রতি বছর ঈদুল ফিতর-এর এ আয়োজনে গুরুজী ও মা-জী আগত অতিথিদের সাথে ঈদের শুভেচ্ছা বিনিময় করেন। কোয়ান্টাম পরিবারের জন্যে বছরের সবচেয়ে বড় আনন্দ আয়োজন ঈদ মোলাকাত। এবছর ১৮ জুলাই ঈদ মোলাকাতে ঢাকার কাকরাইলস্থ আইডিইবি মিলনায়তন মুখর ছিল একইরকম উচ্ছ্বাসে।

বর্ণিল মহাকাশে আলোকিত পৃথিবী

প্রতি বছর ঈদ মোলাকাতের আনন্দকে আরো বাড়িয়ে দেয় অনুষ্ঠানস্থলের অনবদ্য সাজসজ্জা আর শৈল্পিক দৃশ্যপট। এবারের রূপকল্প ছিল মহাকাশের বর্ণিল বিশালতা। গ্রহ-গ্রহান্তরের অচেনা-অজানা সৌন্দর্যের মাঝে নজর কেড়েছে নীল-সবুজের চিরচেনা গোলাকার পৃথিবী, অভ্যর্থনার গেইট পেরিয়ে সামনে এগোতেই যার দেখা মেলে। হলের ভেতরে মঞ্চও ছিল মহাশূন্যের দৃষ্টিনন্দন আবহ।

প্রাণের উৎসবে পরিবারের সবাই

ঈদুল ফিতর-এর দিনটি যেন পূর্ণতা পায় সবার আন্তরিক অংশগ্রহণে। ধর্ম-বর্ণ-শ্রেণির দূরত্ব আর বৈপরীত্য ম্লান হয়ে যায় কোয়ান্টাম গ্রাজুয়েট, প্রো-মাস্টার ও এসোসিয়েটদের সহৃদয় উপস্থিতি আর পারস্পরিক কুশল বিনিময়ের মধ্য দিয়ে। পারিবারিক এ উৎসবে বাদ পড়ে নি গৃহকর্মী, এমনকি ২১ ঘণ্টা বয়সী শিশুটিও। গ্রাজুয়েট প্রো-মাস্টাররা নিজেরাই উদ্যোগী হয়ে পরিচিত আত্মীয় বন্ধু ও প্রতিবেশীদের ঈদ মোলাকাতে শরিক হতে উদ্বুদ্ধ করেছেন স্বতঃস্ফূর্তভাবে।

সুদূর সিগেট যশোর পাবনা নওগাঁ খুলনা চট্টগ্রাম ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকেও ঈদ মোলাকাতে অংশ নেন কোয়ান্টাম পরিবারের বেশ কয়েকজন সদস্য। ঢাকায় গুরুজী ও মা-জীর সান্নিধ্যে ঈদ উদযাপন করার আনন্দ উঁকি দিয়ে যাচ্ছিল তাদের অভিব্যক্তিতে। এছাড়াও ঢাকার পার্শ্ববর্তী স্থান-যেমন টাঙ্গাইল গাজীপুর সাভার টঙ্গী নারায়ণগঞ্জ মুন্সিগঞ্জ এমনকি ময়মনসিংহ কুমিল্লা থেকেও সপরিবারে এসেছেন অনেকেই।

অতিথিদের অধিকাংশই জানালেন, তারা সারা বছর অপেক্ষা করে থাকেন ঈদ মোলাকাতে সপরিবারে অংশ নেয়ার জন্যে। শহুরে ব্যক্তিকেন্দ্রিক জীবনের ছক ভেঙে হাজার হাজার মানুষের সাথে ঈদের শুভেচ্ছা বিনিময় আর গুরুজী ও মা-জীর দোয়া সত্যি এক অতুলনীয় প্রাপ্তি।

আতিথেয়তা ও শৃঙ্খলার অপূর্ব সমন্বয়

এই আয়োজনের নেপথ্যে অন্যতম শক্তি হিসেবে কাজ করেছে ফাউন্ডেশনের কোয়ান্টিয়ার ও দায়িত্বশীলদের আন্তরিক প্রয়াস। আতিথেয়তা এবং শৃঙ্খলার সুন্দর সমন্বয় ছিল পুরো অনুষ্ঠান জুড়ে।

পণ্য আর প্রতিযোগিতার ভিড়ে আধুনিক মানুষ আর একাকী মানুষ যেন সমার্থক হয়ে পড়েছে। এই ভ্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গিকে বদলে দিতেই কোয়ান্টামের পথচলা। উৎসব-পার্বণ মানে তথাকথিত বিনোদন আর অবিদ্যার বিপরীতে এই পারিবারিক আয়োজন। সমমনা মানুষের সমাগম যে আয়োজনকে পরিণত করেছে সত্যিকারের আনন্দযজ্ঞে।

ধর্ম-বর্ণ-শ্রেণির দূরত্ব আর বৈপরীত্য ম্লান হয়ে গিয়েছিল ঈদ মোলাকাতে। শিশু-কিশোরসহ হরিজন সম্প্রদায়ের একাংশের মাঝে গুরুজী

এবার ঈদের দিনটি ছিল বাংলা শ্রাবণ মাসের সূচনালগ্ন। ঢাকায় টানা দুই দিনের বৃষ্টির রেশ ছিল ঈদের দিন সকালেও। এদিকে ঈদ মোলাকাতের সব প্রস্তুতি ছিল সম্পূর্ণ। প্রতিকূল আবহাওয়া আর শহরের অপ্রতুল যানবাহন কোনোকিছুই বাধা হতে পারে নি আগতদের জন্যে। সকাল ৯টা থেকেই অতিথিরা উপস্থিত হতে থাকেন ঈদ মোলাকাতে এবং সুশৃঙ্খলভাবে সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়েন তারা। সর্পিলাকৃতির এ লাইন আইডিইবি ভবনের চত্বর ছাড়িয়ে চলে যায় পার্শ্ববর্তী রাস্তা পর্যন্ত।

ঈদ মোলাকাতে সকাল ১০টা থেকে দুপুর ১টা পর্যন্ত পুরুষ ও মহিলা অতিথিরা পৃথক পৃথক লাইনে সারিবদ্ধভাবে হলের প্রবেশমুখে গুরুজীর সাথে এবং হলের ভেতরে মা-জীর সাথে ঈদের শুভেচ্ছা বিনিময় করেন। বয়োজ্যেষ্ঠদের সুবিধার্থে ছিল পৃথক লাইনের ব্যবস্থা। শুভেচ্ছা বিনিময়ের পর ছিল আপ্যায়নপর্ব।



অপেক্ষমাণ অতিথিদের সারি আইডিইবি ভবনের চত্বর ছাড়িয়ে চলে যায় পার্শ্ববর্তী রাস্তা পর্যন্ত

কোয়ান্টাম বুলেটিন : আগস্ট ২০১৫ ॥ সম্পাদক : অধ্যাপিকা খাদিজা মাহতাব ॥ নাহার আল বোখারী, মহাপরিচালক, কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন কর্তৃক
৩১/ভি শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদীন সড়ক, শান্তিনগর, ঢাকা-১২১৭ থেকে প্রকাশিত ও উইন্ডোজ প্রিন্টিং সেন্টার থেকে মুদ্রিত ॥ শুভেচ্ছা মূল্য - ৫ টাকা
Phone : 9341441, 8319377, 9355756 Mobile : 01714-974333, 01711-671858 E-mail : bulletin@quantummethord.org.bd

কোরবানির পশুর দাম প্রচার থেকে বিরত থাকুন

বছর ঘুরে আবার এসেছে পবিত্র ঈদুল আজহা। সামর্থ্যবান মুসলমানরা পশু কোরবানি দেয়ার মধ্য দিয়ে এটি পালন করে থাকেন। এর উদ্দেশ্য হলো, নিজের ভেতরে পাশবিক যা-কিছু আছে সেটিকেই মূলত কোরবানি দেয়া অর্থাৎ ভেতরকার রাগ ক্রোধ ঘৃণা ঈর্ষা হিংস্রতা এবং সমস্ত নেতিবাচকতা মুক্ত হয়ে পরিশুদ্ধ একজন মানুষ হয়ে ওঠার চেষ্টা করা।

এটা ই কোরবানির সত্যিকার দৃষ্টিভঙ্গি। যার লক্ষ্য মূলত আত্মিক পরিশুদ্ধি। কিন্তু গত শতাব্দীতে বিশ্বজুড়ে জেঁকে বসা পণ্যদ্রব্য ও সর্বক্ষেত্রে বাণিজ্যিকীকরণের প্রভাব আজ এসে পড়েছে ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানগুলোতে পর্যন্ত!

আমাদের ভুল জীবনদৃষ্টির কারণে সবকিছুই এখন রূপ নিয়েছে ব্যবসা, কেনাকাটা, লোক-দেখানো আড়ম্বর আর নিজের সামর্থ্য প্রচার করে বাহবা কুড়ানোর মাধ্যম হিসেবে। আমরা ধর্মচার পালন করি বটে, কিন্তু ভেতরে কোনো পরিবর্তন আসে না। অনৈতিকতা, দুর্নীতি, প্রতারণা, মিথ্যা, শোষণ চলতেই থাকে।

তাই, ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের সত্যিকার বরকত লাভ করতে হলে সব ধরনের বাহুল্য ও প্রদর্শনী থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। যা শুরু থেকেই বিভিন্ণভাবে চর্চা করে আসছেন কোয়ান্টাম পরিবারের সদস্যরা। বিয়ে, জন্মদিন ইত্যাদি সামাজিক অনুষ্ঠানে উপহার আদান-প্রদান বর্জন যার অন্যতম। এই ধারাবাহিকতায় এবার গুরুজীর আহ্বানে ফাউন্ডেশনের সদস্যরা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে, পবিত্র ঈদুল আজহা এখন থেকে সবাই পালন করবেন সত্যিকার ত্যাগের চেতনায়, যা মহান আল্লাহ তায়ালার নির্দেশ। প্রচার, প্রদর্শনীর কোনো ব্যাপার যাতে এখানে না ঘটে, সে ব্যাপারে সচেতন থাকবেন তারা।

প্রসঙ্গক্রমে গুরুজী বলেন, ‘কারো কাছে কোরবানির পশুর দাম জিজ্ঞেস করবেন না এবং কেউ জানতে চাইলে বলবেন, কোরবানির পশুর কোনো দাম হয় না। আল্লাহ যেটুকু সামর্থ্য দিয়েছেন তার মধ্যেই কেনার চেষ্টা করেছে। কারণ, কোরবানির পশু কোনো পণ্য নয়। এটি পরম করুণাময়ের নির্দেশ পালনের একটি অনুষ্ণ মাত্র।’

আসুন, সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টায় সমুন্নত হোক পবিত্র ঈদুল আজহার সত্যিকার চেতনা ও কোরবানির সত্যিকার দৃষ্টিভঙ্গি।

কোয়ান্টাম বুলেটিন



সেপ্টেম্বর ২০১৫

বিশেষ আলোচনায় গুরুজী

দিন শুরু হোক দানে

ভালো কাজ, কল্যাণকর কাজ নিয়মিত করাটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। যিনি নিয়মিত নামাজ পড়েন, তাকেই নামাজী বলা হয়। যিনি মাঝে মাঝে নামাজ পড়েন, তাকে নয়। তেমনি দাতার মর্যাদা তিনিই পান, যিনি নিয়মিত দান করেন। তাই দান করাকে আমাদের প্রাত্যহিক জীবনচাের পরিণত করতে হবে। আমরা আমাদের প্রতিটি দিন শুরু করব দানে।

১৯ আগস্ট প্রো-মাস্টারদের বিশেষ কার্যক্রমে একথা বলেন গুরুজী শহীদ আল বোখারী মহাজাতক।

তিনি বলেন, সদ্যপ্রয়াত বিজ্ঞানী ও ভারতের সাবেক রাষ্ট্রপতি এ পি জে আবদুল কালাম তার ইগনাইটেড মাইন্ডস বইয়ে এমন চারটি বইয়ের কথা উল্লেখ করেছেন, যা তার অনন্য জীবনবোধ গঠনে বিশেষ ভূমিকা রেখেছে। তার একটি ছিল পবিত্র কোরআন। আবদুল কালাম বলেছেন, কোরআন ছিল তার সার্বক্ষণিক সঙ্গী।

আসলে এভাবে কোনো কিছুকে জীবনের সার্বক্ষণিক সঙ্গী করে তুলতে পারলেই তা থেকে পরিপূর্ণ বরকত আসে, প্রত্যাশিত পরিবর্তনের সূচনা ঘটে। যেমনটা হয়েছিল এ পি জে কালামের জীবনে।

তাই আমাদের জীবনের সৎ ও কল্যাণকর কাজগুলোও আমরা নিয়মিত করব। প্রতিটি দিন শুরু করব মাটির ব্যাংকে দান করার মধ্য দিয়ে। দানকে জীবনের সঙ্গী করে নেব। পরিবারের সদস্য ও পরিচিতদের মাটির ব্যাংকে নিয়মিত দানে উৎসাহিত করব। দেড় যুগেরও বেশি সময় ধরে ফাউন্ডেশন এ দানের অর্থ ব্যয় করে আসছে বঞ্চিত, নিপীড়িত মানুষের সেবায়।

গুরুজী আরো বলেন, এবছর লামার কোয়ান্টামমে পূর্বপ্রতিষ্ঠিত শিশুকাননের প্রায় আট শতাধিক শিক্ষার্থীর পাশাপাশি আমরা নতুন শিশুকাননের কার্যক্রম শুরু করেছি। যেখানে এ পর্যন্ত ৫৪টি অনাথ ও এতিম শিশুকে আলোকিত মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার দায়িত্ব নিয়েছি আমরা। নিয়েছি স্বনির্ভর মানুষ হিসেবে তাদের প্রতিষ্ঠিত করার দায়িত্ব, যাতে নিজেদের জীবন তারা নিজেরাই গড়ে নিতে পারে। আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, আল্লাহই একমাত্র রিজিকদাতা। আমরা শুধু তাঁর পক্ষ থেকে এ কাজটা করছি, তাঁরই সম্ভষ্টির জন্যে।

তিনি বলেন, আমরা বলতে পারি, স্রষ্টা যেহেতু সবচেয়ে বড় দাতা, তিনি আমাদের সবাইকে বেহিসাব রিজিক বা জীবনোপকরণ দিয়ে লালনপালন করছেন, স্বাভাবিকভাবেই তিনিও দাতাকেই পছন্দ করেন। তাই স্রষ্টার পছন্দনীয় সংকর্মশীল বান্দায় পরিণত হওয়ার জন্যে আমাদের দাতা হওয়ার বিকল্প নেই। আর এই দাতা তিনিই, দান যার জীবনের অপরিহার্য অংশ অর্থাৎ যিনি নিয়মিত দান করেন।

এ কাজটিকে আরো সহজ এবং প্রতিদিনকার অভ্যাসে রূপান্তরিত করে তুলতে কোয়ান্টাম পরিবারের সদস্যরা একে অপরকে কুশল বিনিময়ের পরেই বলছেন—‘দিন শুরু হোক দানে’। এর পাশাপাশি তারা নিজেদের মোবাইল ফোনের হোম স্ক্রিনে রাখছেন এ আহ্বান সম্বলিত বিশেষ ওয়ালপেপার।

আমাদের সবার জীবন পরিপূর্ণ হয়ে উঠুক নিয়মিত দানের বরকত ও অফুরান কল্যাণে।



কোয়ান্টাম ওয়েবসাইট থেকে এ ওয়ালপেপারটি ডাউনলোড করা যাচ্ছে

প্রকাশিত হলো ফিরে দেখা কোয়ান্টামম



প্রায় দেড় যুগ ধরে বান্দরবান লামার কোয়ান্টামমে একটু একটু করে যে আলোকিত জনপদটি গড়ে উঠেছে, তারই সংক্ষিপ্ত ইতিহাস নিয়ে নির্মিত হয়েছে ২৮ মিনিটের একটি তথ্যচিত্র—ফিরে দেখা কোয়ান্টামম।

১৯৯৮ থেকে ২০১৪ পর্যন্ত কোয়ান্টামমের ক্রমবিকাশের নানা ছবি আর ভিডিও ছাড়াও এতে রয়েছে বেশকিছু দুর্লভ ফাইল ফুটেজ।

কোয়ান্টাম ওয়েবসাইট থেকে এ ডকুমেন্টারিটি যে-কেউ সহজেই ডাউনলোড করে নিতে পারেন।

রিয়েলাইজেশন প্রোগ্রাম

আবেদনপত্র জমা দিন ৫ সেপ্টেম্বরের মধ্যে

২০ তম কোয়ান্টাম মেথড রিয়েলাইজেশন প্রোগ্রাম দুটি ব্যাচে অনুষ্ঠিত হবে যথাক্রমে ৯-১২ অক্টোবর ও ১৬-১৯ অক্টোবর। স্থান : আইডিইবি মিলনায়তন, কাকরাইল, ঢাকা।

ফাউন্ডেশনের সব সেন্টার শাখা সেল-এ রিয়েলাইজেশন প্রোগ্রামের প্রাথমিক আবেদনপত্র জমা নেয়া হচ্ছে। প্রাথমিক আবেদনপত্র জমা দেয়ার শেষ তারিখ ৫ সেপ্টেম্বর। আগ্রহী প্রার্থীদের কোর্স রিজুভিনেশন, লামা কোয়ান্টায়ন, প্রথমায়ন, হিলিং ও সাইকি ওরিয়েন্টেশন এবং ব্যায়াম ওরিয়েন্টেশন সম্পন্ন করা সাপেক্ষে আবেদন করতে পারেন ধ্যানের স্তরে নিজেকে এগিয়ে নেয়ার এই প্রোগ্রামে।

কর্মসূচি : সেপ্টেম্বর

প্যারেন্টিং ওরিয়েন্টেশন : স্টেপ-১

১১ ও ১২ সেপ্টেম্বর। কাকরাইল

কোয়ান্টাম ব্যায়াম ওরিয়েন্টেশন

১১ ও ১২ সেপ্টেম্বর। বনগ্রী

(মহিলা ও পুরুষ পৃথক ব্যবস্থাপনায়)

কোয়ান্টাম শিক্ষার্থী ওরিয়েন্টেশন

১৮ ও ১৯ সেপ্টেম্বর। উত্তরা

হৃদরোগ প্রতিরোধ ও নিরাময় ওরিয়েন্টেশন

১৮ ও ১৯ সেপ্টেম্বর। বনগ্রী

হিলিং ও সাইকি ওরিয়েন্টেশন

১৮ ও ১৯ সেপ্টেম্বর। মিরপুর

প্রখ্যাত কথাসাহিত্যিক আনোয়ারা সৈয়দ হক। উপন্যাস, ছোটগল্প, আত্মজৈবনিক রচনা, শিশুতোষ গ্রন্থ-সব মিলিয়ে অত্যন্ত বৈচিত্র্যময় তার সাহিত্যকর্ম। একজন সমাজ সচেতন লেখকের পাশাপাশি তিনি দেশের একজন প্রথিতযশা মনোচিকিৎসক। জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউটের সাইকিয়াট্রির প্রাক্তন অধ্যাপক এবং বর্তমানে ইব্রাহিম মেডিকেল কলেজের (বারডেম) অধ্যাপক ডা. আনোয়ারা তার দীর্ঘ পেশাজীবনে নানাভাবে দেখেছেন মানুষের মন ও সমাজের নানা দিক। দেশে সাম্প্রতিককালে সংগঠিত বিভিন্ন সামাজিক অস্থিরতার উৎস অনুসন্ধান ও তা প্রতিকারের উপায় সম্পর্কে তিনি বলেছেন কোয়ান্টাম বুলেটিনের সাথে একান্ত সাক্ষাৎকারে। উল্লেখ্য, তিনি কোয়ান্টাম মেথড কোর্সের ৩৩৪ ব্যাচে অংশ নেন।

নৈতিক জাগরণই সামাজিক অনাচার প্রতিহত করবে

আনোয়ারা সৈয়দ হক

আমাদের জীবন এখন হয়ে পড়েছে প্রযুক্তিনির্ভর। সর্বক্ষেত্রে নিত্যনব প্রযুক্তির ছোঁয়া জীবনকে অনেক সহজ করে তুলেছে সত্যি, কিন্তু এর যথেষ্ট ব্যবহার আমাদের জীবন থেকে লুপ্ত করে দিয়েছে সব রহস্যময়তা আর রোমাঞ্চকর অনুভূতিগুলো। সবাই মিলে যেন ঢুকে পড়েছি একটা উৎকট হাস্যকর বাস্তবতার যুগে। কিন্তু জীবন তো রহস্যময়। সে রহস্যময়তা অনেক আনন্দেরও বটে।

এই কিছুদিন আগেও একটা সময় ছিল, যখন ছেলে পড়াশোনা বা চাকরিসূত্রে হয়তো দূরে থাকত—মা ছেলেকে চিঠি লিখতেন, ছেলে অপেক্ষা করে থাকত সেই চিঠির জন্যে। পোস্ট অফিসে গিয়ে খোঁজ নিত চিঠি এলো কিনা। চিঠি পেলে মা-র হাতের লেখাটা দেখত, চিঠিতে হাত বুলাত, চিঠির গন্ধ শুকত। মা-র চিঠি! পুরো ব্যাপারটার মধ্যে কী একটা রোমাঞ্চ!

সন্তান এ কালেও দূরে থাকে। কিন্তু চিঠি লেখার আর প্রয়োজন হয় না। সকালে স্মাইল, বিকেলে স্মাইল। সবকিছুই দৃশ্যমান। উধাও হয়ে গেছে জীবনের সকল রহস্য। সেইসাথে ক্ষীয়মাণ হয়ে গেছে পারস্পরিক স্নেহ-ভালবাসা-মমতার সম্পর্কের মধ্যকার সহিষ্ণুতা আর মানবিক আবেগ। এ সবই এখন আছে কেবল ফেসবুকে।

এ যুগে সামাজিক অস্থিরতা, অসহিষ্ণুতার একটি বড় কারণ এই ফেসবুক। ব্যক্তিগত সম্পর্কের জটিলতা ও টানাপোড়েনের জন্যেও এটি কম দায়ী নয়। বন্ধুতে বন্ধুতে মন-কষাকষি মান-অভিমান আগেও হতো। এ কষ্টটুকু সে কাছের কাউকে শেয়ার করত, না হলে চেপে রাখত। আবার কিছুদিন পর বন্ধুর কাছ থেকে কোনো ভালো আচরণ পেলে কষ্টটা সে ভুলেও যেত।

কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এখন কী হচ্ছে? যেই কারো সাথে কিছু হলো—কাছের কিংবা দূরের, পরিচিত বা সামাজিকভাবে চেনা-অমনি সে তার নামে একটা নেতিমন্তব্য করে দিল ফেসবুকে। মুহূর্তেই সেটি জেনে গেল আরো অনেক মানুষ। বহুদিনের সম্পর্ক, এক মন্তব্যেই শেষ!

আমার বন্ধু আমাকে ভালবাসে—এটা জেনে যদি আমি মরেও যেতাম, শান্তিতে মরতাম। কিন্তু ফেসবুক কী করল? ফেসবুক আমাকে জানিয়ে দিল—‘ওরে, তোর ২৫ বছরের বন্ধু তোকে ভালবাসে না। ঘৃণা করে।’ দিল শান্তিটা নষ্ট করে। এই বাস্তবতা জেনে আমার লাভ কী হলো?

আগে জীবনে ফেসবুক ছিল না। শান্তি ছিল। ফেসবুক না দেখে এখন আমরা দুদণ্ড শান্তিতে বসতে পারি না—কে কী লিখল, কে কার বদনাম করল, তার উত্তর না দিলে আমাদের রাতে ঘুম পর্যন্ত আসতে চায় না!

বুঝে না-বুঝে এভাবে আমরা প্রযুক্তির অপরিণামদর্শী ব্যবহার করছি দিনের

পর দিন। ক্রমাগত নিজেদের শান্তি নষ্ট করছি আমরা। সমাজে বৈরিতা বাড়ছে, প্রতারণা বাড়ছে ব্যক্তিগত ও পারিবারিক সম্পর্কগুলোর মধ্যে। ঘৃণা, অবিশ্বাস বাড়ছে। প্রতিহিংসাপরায়ণতা জন্ম দিচ্ছে অদ্ভুত সব হিংস্রতা ও বীভৎসতার। আমাদের স্বাধীনতা বেড়েছে, কিন্তু সচেতনতা বাড়ে নি। ফলে এক ধরনের অস্থিরতার মধ্য দিয়ে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে আমাদের মানবিক গুণগুলো।

সব মিলিয়ে আমরা তৈরি করে ফেলেছি অসহনীয় এক অনৈতিক পরিবেশ, যেখানে মানবীয় মূল্যবোধ, নীতিবোধ এমনকি চিরন্তন ধর্মাচারগুলো পর্যন্ত এসব থেকে আমাদের বিরত রাখতে পারছে না।

ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে আগে অস্বস্তি কিছু ধর্মীয় রীতিনীতি ও আচার-অনুষ্ঠানের চর্চা ছিল, আধুনিকতার নামে সেগুলোও আমরা জীবন থেকে বিদায় করে দিয়েছি। আমরা যে এত ধর্মের কথা বলি, সেই ধর্মও তো আমাদের জীবনে আজ অনুপস্থিত। যা আছে সেটুকু কেবল কথায়।

শিশু ও নারীনির্যাতনসহ কুৎসিত যে-সব ঘটনা আমরা সম্প্রতি দেখছি

একের পর এক, তা মূলত এই অনৈতিকতা আর ধর্মহীনতারই পরিণাম। মানুষ মানুষকে মারছে মৃত্যুযন্ত্রণাকে রীতিমতো উপভোগ করতে করতে! কেন? তার শাস্তির ভয় নেই, সামাজিক প্রতিরোধের ভয় নেই, ধর্মের ভয়ও নেই।

আজ জীবনের এ পর্যায়ে এসে একটা কথা আমার মনে হয়—এই যে এতদিন ধরে দেশ-বিদেশ ঘুরে এত বই, সুভেনির, শাড়ি, জামা এত জিনিসপত্র আমার জমা হলো—মানুষের জীবনে আসলে এসবের কিছুই দরকার নেই। মানুষের দরকার কেবল শান্তি, ভ্রাতৃত্ব আর ধর্ম।

এই শান্তি, ভ্রাতৃত্ব, ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষায় একজন মানুষকে সবচেয়ে বেশি অনুপ্রাণিত করে তার পরিবার। তাই দায়িত্বটা প্রথম নিতে হবে পরিবারকেই। শৈশব থেকেই তাকে নীতিজ্ঞান, সুস্থ মূল্যবোধ ও

ধর্মজ্ঞানে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। গুরুজনদের ভক্তি-শ্রদ্ধা ও ছোট-বড় সবাইকে সম্মান করতে শেখাতে হবে।

এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ কথাটি হলো, এসব আচরণ আগে নিজেদের চর্চা করতে হবে। বাবা-মা অভিভাবকরা কী করছেন, কীভাবে করছেন, সন্তানরা মূলত সেটাই দেখে। এবং তা-ই শেখে। আর সন্তানদের সময় দিতে হবে, সন্তাহে অন্তত একটি দিন হলেও।

দুঃখের বিষয়, সন্তানদের আমরা মানুষ করছি সাহিত্যহীন পরিবেশে। ছোটবেলায় আমরা কত ধরনের বই পড়তাম—রূপকথা, ঈশপের গল্পসহ আরো কত কী! এখন এসব কিছুই নেই। অথচ সাহিত্যপাঠ ও সাহিত্য-সচেতনতার মধ্য দিয়ে শৈশব থেকেই মানুষের ভেতরে উন্নত জীবনবোধ গড়ে ওঠে।

শিশুদেরকে প্রকৃতির কাছে নিয়ে যেতে হবে। ফুল কীভাবে ফোটে, পাখি কীভাবে বাসা বাঁধে ইত্যাদি বিষয়ের সাথে পরিচয় করিয়ে দিতে হবে। এর মধ্য দিয়ে ওদের চেতনাটা বড় হবে।

আর এটা পেতে হবে, গুটা করতে হবে, ওরা হলো তোমার হলো না কেন—সন্তানকে এসব প্রতিযোগিতার মধ্যে ঠেলে দেয়াতে কোনো সুস্থতা নেই। অসুস্থ প্রতিযোগিতার পথ ধরেই সমাজে অন্যায় মিথ্যা প্রতারণা ধোঁকাবাজি চরিত্রহীনতার প্রকোপ বাড়ে। সমাজ একদিনে তলিয়ে যায় না, দিনের পর দিন একটু একটু করে এটি কলুষিত হয়।

তাই নৈতিকতার গুরুত্ব এখানে অনেক বেশি। একজন মানুষকে পানিতে ফেলে দিলেও সে ভেসে থাকতে পারে, যদি সে সাঁতার জানে। নৈতিক শক্তিও ঠিক তেমনি, জীবনে যত কঠিন সময়ই আসুক মানুষ আবার উঠে দাঁড়াতে পারে যদি সে নৈতিক গুণাবলিতে দৃঢ় ও শক্তিমান হয়।

সাক্ষাৎকার গ্রহণ ও অনুলিখন : ডা. আতাউর রহমান

শ্রদ্ধেয় গুরুজী,
আসসালামু আলাইকুম। ২০১১ সালের ১১ এপ্রিল আমার হার্ট অ্যাটাক হয়। আল্লাহর রহমতে সে যাত্রা প্রাণে বেঁচে যাই। দেশের নামকরা একটি হাসপাতালে এনজিওগ্রাম করার পর ধরা পড়ল যে, আমার হার্টে তিনটি ব্লক আছে। ইকোকার্ডিওগ্রাম করে দেখা গেল, যেখানে হার্টের স্বাভাবিক ইজেকশন ফ্র্যাকশন (EF) ৫৫-৬০% বা তারও বেশি হয়ে থাকে সেখানে আমার হার্টের ক্ষেত্রে তা ৩৫%। বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের নির্দেশ মোতাবেক সাথে সাথেই একটি ব্লকে রিং লাগানো হয়। কিন্তু কিছুদিন পর আরো অসুস্থ হয়ে পড়লে সেই ডাক্তার ওষুধ পরিবর্তন করে দিলেন।

প্রায় একবছর পর আবার পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখা গেল ইজেকশন ফ্র্যাকশন বাড়ে নি। ডাক্তার সাহেব জানালেন, ‘আপনার ইজেকশন ফ্র্যাকশন বাড়বে না। আপনিও আর পুরোপুরি সুস্থ হবেন না। এই ধরনের রোগীরা ঘুমের ঘোরে মরে পড়ে থাকে।’ জানতে চাইলাম, ওষুধ খেয়ে বা অন্য কিছু করলেও কি EF বাড়বে না? উনি বললেন, কোনোভাবেই

বাড়বে না। আরেকজন নামকরা ডাক্তার পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে জানালেন আপনার EF আসলে ৩৫% নয়, বরং ৩২% এবং এটা বাড়বে। ডাক্তারদের এই পরস্পরবিরোধী কথায় আশ্বস্ত হতে পারছিলাম না।

এর মাঝে এক বছর উৎসাহে কোয়ান্টাম মেথড কোর্স করলাম। আমি আশাবাদী হলাম যে, আমি সুস্থ হবো। এরপর ২০১২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে কোয়ান্টাম হার্ট ক্লাবে হৃদরোগ প্রতিরোধ ও নিরাময় ওরিয়েন্টেশন সম্পন্ন করি। সেখানে ডাক্তাররা বললেন, কোয়ান্টামের নিয়ম অনুসরণ করলে আমি সুস্থ হয়ে উঠব।

নিয়মিত ওষুধ সেবনের পাশাপাশি ব্যায়াম, সঠিক খাদ্যাভ্যাস ও মেডিটেশন চর্চা করতে লাগলাম। মেডিটেশনে মনোবিজ্ঞান নির্মাণ করলাম যে, ব্লকটা ঠিক হয়ে গেছে এবং রিংয়ের আশেপাশে নতুন করে কোনো জটিলতা তৈরি হচ্ছে না।

এবছরের ২৫ জুলাই ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশনে ভর্তি হলাম ব্লকের কী অবস্থা দেখতে। এনজিওগ্রাম করে ডাক্তাররা জানালেন, যে আর্টারিতে আগেরবার এনজিওগ্রামে Significant Lesion পাওয়া

গিয়েছিল সেটা আর নেই। আর অন্য আর্টারিতে রিংয়ের আশেপাশেও নতুন করে কোনো ব্লক সৃষ্টি হয় নি। এবং ECHO করে দেখা গেল EF বেড়ে ৪২% হয়েছে। অর্থাৎ মেডিটেশনে যা ভেবেছি, তা-ই বাস্তবে পরিণত হলো। মন খুবই উৎফুল্ল হয়ে উঠল।

আমি এখন অনেক ভালো আছি। আগে পাঁচ মিনিটের বেশি হাঁটতে পারতাম না, এখন অনায়াসে একঘণ্টা হাঁটি। আমার বিশ্বাস হার্টে যেটুকু জটিলতা আছে সেটুকুও ঠিক হয়ে যাবে।

আমার জন্যে দোয়া করবেন। আপনার প্রতি অন্তরের অন্তস্তল থেকে শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

মো. মফিজুর রহমান

উপ সহকারী প্রকৌশলী, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড

৩৫০ ব্যাচের গ্রাজুয়েট



নতুন রোগ : পণ্যাসক্তি!

বিজ্ঞানের তাক-লাগানো অগ্রগতি পাল্টে দিয়েছে আধুনিক মানুষের জীবনযাপনের ধরন। স্যাটেলাইট টেলিভিশন, ই-মেইল, ফেসবুক-টুইটারসহ বহুরকম অ্যাপস ব্যবহারে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে আজকের মানুষ। প্রতিমুহূর্তে তাকে সামলাতে হচ্ছে অগণন তথ্যের অবিরাম স্রোত। এমন ঠাসঠাসের ভিড় এড়িয়ে সে ঘরে ফেরে নিরিবিলিতে একটু দম ফেলার আশায়। কিন্তু সে ঘর যদি হয় পণ্যবোঝাই, তা কি পারে জীবনকে আনন্দময় করে তুলতে? দিতে কি পারে একটু শান্তি? পাশ্চাত্যের সমাজবিজ্ঞানীরা নেমে পড়েছেন সে উত্তর খুঁজতে।

পৃথিবীতে ভোগ্যপণ্যের সবচেয়ে বড় বাজার যুক্তরাষ্ট্র। বিশ্বজুড়ে ব্যবসায়ীরা প্রতিনিয়ত আকর্ষণীয় আর নিত্যনতুন সব পণ্যের বিজ্ঞাপন নিয়ে মার্কিনদের দুর্যারে হাজির হচ্ছে। প্রয়োজন থাকুক বা না-ই থাকুক, তারাও দেন্দারসে কিনছে ওসব। ক্রমশ ভরিয়ে ফেলছে ঘরবাড়ি। খালি থাকছে না বাড়ির বেজমেন্ট গ্যারেজ বারান্দা উঠান কোনোকিছুই। মনোবিজ্ঞানীরা মার্কিনদের পণ্য কেনার এই অস্বাভাবিক বিকারগ্রস্ততার নাম দিয়েছেন ‘হাইপারঅ্যাকুইজিশন’।

হাইপারঅ্যাকুইজিশন-এর ওপর এক দশকের দীর্ঘ গবেষণার পর গবেষকরা তাদের মতামত জানিয়েছেন। ইউনিভার্সিটি অব ক্যালিফোর্নিয়া লস অ্যাঞ্জেলেস (ইউসিএলএ)-এর নৃবিজ্ঞানী ইলিনর ওকস-এর মতে, অতিরিক্ত পণ্য কেনা ও সংগ্রহের প্রবণতা মানুষকে শান্তি দেয় না, বরং তা একসময় হয়ে দাঁড়ায় দুশ্চিন্তা ও মানসিক অশান্তির কারণ।

কেনই-বা মার্কিনদের এই পণ্যপ্রীতি? নেপথ্যের ইতিহাসটা চমকপ্রদ। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে যুক্তরাষ্ট্রে প্রযুক্তিগত উৎকর্ষ ও অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির মেলবন্ধন ঘটে। আগের যে-কোনো সময়ের তুলনায় পণ্য হয়ে পড়ে সহজলভ্য এবং সস্তা। সেই থেকে গুরু মার্কিনদের পণ্যপ্রীতি। একপর্যায়ে যা প্রভাবিত করে তাদের সামাজিক মূল্যবোধকেও। শুধুমাত্র ক্রয়ক্ষমতাই একজন মানুষের সামাজিক অবস্থান

নির্ধারণ করতে পারে-এ ধারণা গাঁথে যায় মার্কিন সমাজের মর্মমূলে।

ব্যবসায়ীরা দেখল, এ-তো দারুণ সুযোগ! দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর সে-দেশের শীর্ষ মোটরগাড়ি নির্মাতা প্রতিষ্ঠান জেনারেল মোটরস প্রতি বছর নতুন নতুন মডেলের গাড়ি বাজারজাত করতে শুরু করল। নিয়মিত গাড়ির মডেল বদলানো তখন আর প্রয়োজনের তাগিদে নয়, বরং রূপ নিল স্ট্যাটাস সিঙ্কে। না পারলে ঋণ করে হলেও কেনো, তবু কেনো। এভাবেই ধীরে ধীরে মার্কিনদের মাঝে চালু হয়ে গেল ঋণ করে হলেও হালফ্যাশনের পণ্য কেনার অসুস্থ অভ্যাস ও প্রতিযোগিতা।

আর তারই পথ ধরে আশির দশকে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে ক্রেডিট কার্ড। বড় বড় সুপারস্টোরের আবির্ভাব ঘটে। বিক্রি বাড়তে ব্যবসায়ীরাও বেছে নেয় নানান রকম কৌশল। যেমন : বিভিন্ন উপলক্ষে আকর্ষণীয় মূল্যছাড়, অনলাইনে কেনার সুযোগ, ২৪ ঘণ্টায় হোম ডেলিভারি ইত্যাদি।

পৃথিবীর অন্যান্য দেশে বাড়ি বদলের সময় একটি পরিবারে ব্যবহার্য পণ্যসামগ্রীর গড় ওজন হয় সাধারণত ১১০০ থেকে ৩৪০০ কিলো। মার্কিনদের ক্ষেত্রে এর পরিমাণ নিদেনপক্ষে ৩৬০০ কিলো। সাম্প্রতিক একটি পরিসংখ্যান অনুসারে, যুক্তরাষ্ট্রের অধিকাংশ মধ্যবিত্ত পরিবার তাদের বার্ষিক আয়ের প্রায় অর্ধেকই ব্যয় করে অপ্রয়োজনীয় বিলাসদ্রব্য কেনার পেছনে। প্রতিটি পরিবার গড়ে ২৪৮টি পোশাক ও ২৯ জোড়া জুতার মালিক। উপরন্তু, প্রতি বছর প্রায় ৮৪ হাজার টাকা ব্যয় করে তারা গড়ে আরো ৬৪টি পোশাক ও সাত জোড়া জুতা কেনে।

সবচেয়ে চমকপ্রদ তথ্যটি হলো, পৃথিবীর মোট শিশুদের মাত্র ৩.১ শতাংশ যুক্তরাষ্ট্রে বাস করে। অথচ, বিশ্বজুড়ে শিশুদের জন্যে বিক্রি হওয়া খেলনার ৪০ শতাংশের মালিক মার্কিন শিশুরা!

পরিস্থিতি আগাম বুঝেই হয়তো অর্থনীতিবিদ ভিত্তির লেবো সেই ১৯৫৫ সালে বলেছিলেন, ‘মার্কিনদের জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য ভোগবাদিতা।

খাওয়াদাওয়া আর ফূর্তির মাঝেই তারা জাগতিক সুখ ও আত্মিক মুক্তির সন্ধান করে চলেছে।’

কেনাকাটার লাগামহীন এই হিড়িক মার্কিনদের আটকে ফেলেছে পণ্যদাসত্বের শেকলে। ফলে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ছে সে-দেশের পুরো সামাজিক কাঠামো। বিশেষজ্ঞদের এমনটাই মন্তব্য। মিশিগান বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক স্টেফানি প্রেস্টন তার দীর্ঘ পর্যবেক্ষণ থেকে বলছেন, যখন কেউ দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ও বিষণ্ণ থাকে তখন কেনাকাটার ব্যাপারে তার আগ্রহ আরো তীব্র হয়। বর্তমানে প্রতি ছয় জন মার্কিনের একজন দুশ্চিন্তাজনিত ব্যাধিতে আক্রান্ত।

গবেষণায় দেখা গেছে, কেনাকাটা করার সময় মস্তিষ্কে ডোপামিন হরমোন নিঃসরণ হয়ে থাকে। তাই দুশ্চিন্তা-উদ্বেগে আক্রান্ত অনেক মার্কিন যখন পণ্য কেনার মহোৎসবে মেতে ওঠে, তখন হয়তো তারা সাময়িকভাবে উৎফুল্ল হয়। কিন্তু মজার ব্যাপার হলো, এই অভ্যাস দীর্ঘমেয়াদে মানসিক প্রশান্তি তো দেয়ই না, বরং ঘট্টে উল্টোটা।

কারণ, আমরা যেসব জিনিস কিনে ঘর সাজাই, সেগুলো প্রাণহীন হলেও এসব বস্তুও আসলে আমাদের জীবনকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। অহেতুক কেনা পণ্যে ঠাসা ঘর মস্তিষ্কে বহুগুণে বাড়িয়ে দেয় স্ট্রেস সৃষ্টিকারী হরমোন কর্টিসলের নিঃসরণ। ফলে শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য দুটোই মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

যুক্তরাষ্ট্রে (এবং প্রায় গোটা বিশ্বজুড়েই) এই পণ্যপ্রীতি ও তার ফলশ্রুতিতে ব্যক্তিগত-পারিবারিক-সামাজিক অস্তিরতা ও হাইপারঅ্যাকুইজিশন সংক্রান্ত গবেষণার ফলাফল মূলত এটাই প্রমাণ করে যে, এ যুগে পণ্যের পরিমাণ যেমন বেড়েছে তেমনি বেড়েছে মানুষের অভাববোধ। অনেক কিছু কিনেও মানুষ পারছে না তৃপ্ত হতে। মিটছে না তার অভাব।

কারণ, শান্তির খোঁজে আত্মনিমগ্নতা ও আত্মশক্তি জাগরণের পথ ছেড়ে সে যতই বেছে নিক পণ্যের সমাহার আর আসুক হাজারো তথ্যের প্লাবন-কোনোটাই শেষপর্যন্ত তাকে দিতে পারে না সত্যিকারের প্রশান্ত জীবন।

টাইম সাময়িকীতে (২৩ মার্চ ২০১৫) প্রকাশিত বিশেষ নিবন্ধ The Joy of Less অবলম্বনে

রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে আছে

মো. আবুল কালাম আজাদ



হাইপারটেনশন ও হার্টে একটা ব্লক ধরা পড়ার পর কোয়ান্টাম মেথড কোর্সে অংশ নিই। আল্লাহর রহমতে রক্তচাপ এখন নিয়ন্ত্রণে আছে। হার্টেও কোনো ধরনের অসুবিধা বোধ করছি না। নিয়মিত মেডিটেশন চর্চা ও

কোয়ান্টামের দিক-নির্দেশনা মেনে চলায় কর্মক্ষেত্রেও আমার অগ্রগতি হয়েছে।

[মো. আবুল কালাম আজাদ, ডিজিএম, জনতা ব্যাংক, ৩৭৫ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]

ভর্তি পরীক্ষায় সাফল্য পেয়েছি

এ টি এম মাসরুর আখতার

এইচএসসি টেস্ট পরীক্ষায় ফেল করার পর সবাই আমাকে নিয়ে হতাশ হয়ে পড়ে। এমন সময় কোয়ান্টাম মেথড কোর্সে অংশ নিই। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞান বিভাগে ভর্তি হবো-এই মনছবি



নির্মাণ করি। শুরু করি অক্লান্ত পরিশ্রম। ভর্তি পরীক্ষায় দেশের শীর্ষস্থানীয় সাতটি ইঞ্জিনিয়ারিং ও পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ছয়টিতেই মেধা তালিকায় উত্তীর্ণ হই। পদার্থবিজ্ঞানে ভালবাসার কারণে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এ বিভাগে ভর্তি হয়েছি।

[এ টি এম মাসরুর আখতার, শিক্ষার্থী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ৩৫০ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]

টিভি সিরিয়াল আসক্তি দূর হয়েছে

লাবনী ইয়াসমিন



আমার বাম হাতে ও ঘাড়ের প্রচণ্ড ব্যথা ছিল। কোয়ান্টাম মেথড কোর্সে এসে সুস্থতার ব্যাপারে আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠি। এখন আমি ব্যথামুক্ত। টিভি সিরিয়াল দেখার প্রচণ্ড নেশা ছিল আমার।

কোয়ান্টামে এসে জেনেছি এর ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে। সিরিয়ালের আসক্তিও কাটিয়ে উঠেছি।

দুধ-চায়ে আসক্তি ছিল। এখন আমি নিজে দুধ-চা পান করি না, অন্যকেও পরিবেশন করি না।

[লাবনী ইয়াসমিন, গৃহিণী, ৩৯৩ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]

ক্লান্তি বোধ আর নেই

শেখ আতিকুর রহমান



কোর্সে অংশ নেয়ার আগে নিয়মিত উচ্চ রক্তচাপ, এসিডিটি ও থাইরয়েডের ওষুধ খেতে হতো। শারীরিকভাবেও বেশ দুর্বল ও ক্লান্ত বোধ করতাম। কোর্স করার পর থেকে কোনো প্রকার ওষুধ গ্রহণ

ছাড়াই খুব ভালো আছি। এখন সারাদিন অফিস শেষেও একদম ক্লান্ত লাগে না।

[শেখ আতিকুর রহমান, চাকরিজীবী, ৩৯৩ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]

হয়েছি পরিবারের ভরসাহল

সোনিয়া ইসলাম



কোয়ান্টাম মেথড কোর্সে এসে উপলব্ধি করেছি প্রকৃতি ও মানুষকে ভালবাসলে, প্রকৃতিও আমাদের অনুকূলে চলে আসে। এই বাক্যটি যত অনুসরণ করছি তত অনুভব করছি এর গভীর সত্যতা। কোর্স করার পর থেকে আমার আশেপাশের মানুষগুলো আমাকে তাদের আস্থার কেন্দ্রস্থল মনে করছে। কারো কোনো প্রয়োজন থাকলে জানায়। তাদের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে আমার সাথে আলোচনা করতে আসে। তাদেরকে ইতিবাচকতার পরামর্শ দিতে গিয়ে দেখছি আমার মাঝেও আত্মপ্রত্যয় সৃষ্টি হয়েছে। আগে যা কিছু 'পারব না, হবে না' বলে ভাবতাম, এখন সেগুলো খুব সহজসাধ্য মনে হয়। আমি বিশ্বাস করি-আমি পারি, আমি করব।

[সোনিয়া ইসলাম, ৩৯৬ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]

গণিত ভীতি দূর হলো

শাহ তানভীর আলম



গণিত ছিল আমার কাছে আতঙ্কের প্রতিশব্দ। মাধ্যমিক পরীক্ষায় গণিতে ফেল করলাম। উচ্চ মাধ্যমিক ও ডিগ্রি পরীক্ষাতেও হিসাববিজ্ঞানে আশানুরূপ নম্বর তুলতে পারি নি।

কোয়ান্টাম মেথড কোর্স করার পর ভয়টা কেটে গেল। এমবিএ ভর্তি পরীক্ষায় হাজারো শিক্ষার্থীর সাথে প্রতিযোগিতা করে কয়েকটি নামকরা বিশ্ববিদ্যালয়ে সুযোগ পেলাম।

[শাহ তানভীর আলম, শিক্ষার্থী, ইস্টওয়েস্ট বিশ্ববিদ্যালয়, ৩৭১ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]

মনছবি পূরণ হলো

নাছিমা আক্তার



জামালপুর জিলা স্কুলকে ৬৬ শতাংশ খাস জমি বরাদ্দ দেয়া হয়। কিন্তু, প্রায় ১০ বছর ধরে জমি রেজিস্ট্রি করা হয় নি। আমি প্রধান শিক্ষক হিসেবে যোগ দেয়ার পর রেজিস্ট্রি করার প্রক্রিয়া শুরু করি।

কিছু আইনি জটিলতা দেখা দেয়। আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতে থাকলাম, জিলা স্কুল জমিটি পাবে। সদকা হিলিং ও মাটির ব্যাংকে দানের পাশাপাশি মনছবি দেখতে থাকলাম, ওই জমিতে স্কুলের অনুষ্ঠান আয়োজন করা হচ্ছে, ছাত্ররা খেলছে। আল্লাহর অশেষ রহমতে স্কুল সেই জমিটির মালিকানা পেয়ে গেছে। স্কুলের খরচেই সীমানাপ্রাচীরও দেয়া হয়েছে।

[নাছিমা আক্তার, প্রধান শিক্ষক, জামালপুর জিলা স্কুল, ৩৪৮ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]

আগের চেয়ে ভালো আছি

সুমা ইয়া বিনতে মতিউর



বাতজ্বরে আক্রান্ত হওয়ায় ২১ দিন পর পর পেনিসিলিন ইনজেকশন নিতে হতো। সুস্থ হওয়ার নিয়তে কোর্সে অংশ নিই। কোর্স করার পর প্রায় দেড় বছর কেটে গেছে। আমার আর কোনো ইনজেকশন নিতে হয় নি এবং আল্লাহর রহমতে এখন আগের চেয়ে অনেক ভালো আছি।

[সুমা ইয়া বিনতে মতিউর, শিক্ষার্থী, বিইউবিটি, ৩৭৫ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]

ডীন অ্যাওয়ার্ড পেলাম

আনিকা তাসনীম প্রতীতি



পারিপার্শ্বিকতার নানা চাপে যখন ভেঙে পড়েছিলাম সেই মুহূর্তে কোয়ান্টাম মেথডের খোঁজ পাই এবং আমার জীবনের মোড় ঘুরে যায়। মাইক্রোবায়োলজি বিভাগ থেকে ৩.৯২ সিজিপিএ নিয়ে অনার্স সম্পন্ন করলাম। ডীন অ্যাওয়ার্ড পেলাম। আগে কারো সামনে কথাই বলতে পারতাম না। এখন ক্লাসে যে-কোনো প্রেজেন্টেশন-এ আমি আত্মবিশ্বাসী। ছা্যানটে গান শেখার কোর্সেও ফাস্ট ক্লাস মার্কস পেয়েছি। কোয়ান্টাম এভাবেই আমার ভেতরের আমিকে বিকশিত করেছে।

[আনিকা তাসনীম প্রতীতি, শিক্ষার্থী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ৩৭৬ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]

ওষুধ ছাড়াই ঘুমতে পারছি মো. মাহফুজুর রহমান



আমি ১০ বছর ধরে অনিদ্রা ও উচ্চ রক্তচাপজনিত জটিলতায় আক্রান্ত ছিলাম। নিয়মিত ঘুমের ওষুধ না খেলে ঘুম আসত না। কখনো দুই বেলাই ওষুধ খেতে হতো। কোয়ান্টাম মেথড কোর্সে অংশ

নেয়ার পর আমার দীর্ঘদিনের ঘুমের সমস্যা দূর হয়ে গেছে। সেইসাথে কর্মক্ষেত্রেও আর স্ট্রেসবোধ করছি না। পারিবারিক জীবনেও সুস্থতা ও প্রশান্তির অনুরণন অনুভব করছি।

[মো. মাহফুজুর রহমান, ব্যাংকার, ৩৭৫ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]

প্রো-একটিভ হতে শিখেছি মাহিরা তাসনীম



আমি অল্পতেই রেগে যেতাম, ফলে কিছু সহপাঠী আমাকে আরো রাগিয়ে দিত। কোয়ান্টাম মেথড কোর্সে এসে শিখলাম প্রো-একটিভ হওয়ার গুরুত্ব। কোর্স করার কিছুদিন পর যথারীতি সেই সহপাঠীরা

আমাকে রাগাতে এলো। অনেকক্ষণ চেষ্টা করল। আমি চুপচাপ সব শুনে বললাম, 'তোমাদের অনেক ধন্যবাদ এত সুন্দর সুন্দর কথা উপহার দেয়ার জন্যে। কিন্তু এগুলো রাখার কোনো জায়গা আমার নেই। তাই তোমাদের কথা তোমাদের কাছেই থাক।' এটা শুনে তারা নির্বাক হয়ে গেল এবং আমার কাছে দুঃখ প্রকাশ করল। কোয়ান্টাম আমাকে এভাবেই প্রো-একটিভ হতে শিখিয়েছে।

[মাহিরা তাসনীম, শিক্ষার্থী, ৩৭৫ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]

পেয়েছি দায়িত্ব নেয়ার আত্মবিশ্বাস

মো. আবু বাকের রানা

আগে কোনো বিষয়ে দায়িত্ব নিতে আমার ভেতরে ভয় কাজ করত। কোর্স করার পর ফাউন্ডেশনের সৃষ্টির সেবামূলক বিভিন্ন কাজে যুক্ত হলাম। ধীরে ধীরে আমার ভেতরে আত্মবিশ্বাস বাড়তে



লাগল। কোর্সের আগে কিছু নেতিবাচকতার বৃত্তে বন্দি হয়ে পড়েছিলাম। আল্লাহর রহমতে সেই বৃত্তগুলো ভাঙতে পেরেছি। এখন বিশ্বাস করি, আমি যে-কোনো বিষয়ে দায়িত্ব নিতে পারি।

[মো. আবু বাকের রানা, ব্যবসায়ী, ৩৭৫ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]

রুকু-সেজদা দিয়ে নামাজ পড়তে পারছি

ডা. সাবরিনা আহমেদ শান্তা



কোর্সে অংশ নেয়ার পর আমার ভেতরে ইতিবাচকতা অনেক বেড়েছে। আমি আরো পরিশ্রমী হয়েছি। মেরদণ্ডের ডিস্ক প্রোল্যাক্স হওয়ায় দুই বছরেরও বেশি সময় ধরে রুকু-সেজদা দিয়ে নামাজ পড়তে

পারি নি। কোর্স করার পর থেকে রুকু-সেজদা দিয়ে নামাজ পড়তে পারছি।

[ডা. সাবরিনা আহমেদ শান্তা, ডেন্টাল সার্জন, ৩৭২ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]

সবার সাথে এখন সহজে মিশতে পারি

শেফা সুলতানা



কোর্স করার পরে যে-কোনো বিষয় ইতিবাচকভাবে দেখতে পারি। আগে সামান্য বিষয়েও রেগে যেতাম। মেডিটেশন শেখার পরে রাগ করার মতো কোনো ঘটনা ঘটলেও শান্ত থাকতে পারছি। এটা

আমার জীবনের বড় পাওয়া।

আগে মানুষের সাথে মেশার ব্যাপারে একধরনের জড়তা কাজ করত। এখন সবার সাথে হাসিমুখে কথা বলি, সহজে মিশতে পারি। পরিচিতদের কোয়ান্টামের কথা বলছি। সর্বোপরি, কোয়ান্টামে নিয়মিত যুক্ত থাকার মধ্য দিয়ে নিজেকে নতুন করে আবিষ্কার করছি।

[শেফা সুলতানা, শিক্ষার্থী, ইডেন কলেজ, ৩৬২ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]

নিজেকে চিনতে শিখেছি

ছোটন চৌধুরী

এমন একটি মনছবি নির্মাণ করতে পেরেছি যা আমাকে প্রেরণা যোগায়। জীবন যে অনেক বড় রহস্য তা এখন উপলব্ধি করছি। কোয়ান্টামে এসে শিখলাম একজন মানুষের ধর্ম-বর্ণ তার প্রথম পরিচয় নয়।

তার সবচেয়ে বড় পরিচয় হলো, সে মানুষ, স্রষ্টার প্রতিনিধি। তাই তার একমাত্র লক্ষ্য হওয়া উচিত স্রষ্টার সন্তুষ্টি অর্জন।

[ছোটন চৌধুরী, শিক্ষার্থী, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, ৩৭৫ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]



পরিবারের প্রতি দায়িত্বশীল হতে পেরেছি

সুমিত সরকার



কোর্স করার পর পরিবারের সবাইকে নিজের উপার্জিত অর্থে কোয়ান্টাম মেথড কোর্স করিয়েছি। মা-বাবার প্রতি ভালবাসা, শ্রদ্ধা ও দায়িত্ববোধ অনেক বেড়েছে।

দানের গুরুত্ব উপলব্ধি করার পর

থেকে নিয়মিত মাটির ব্যাংকে দান করছি। ফলে আমার শারীরিক সুস্থতা ও আর্থিক সচ্ছলতা আগের চেয়ে বৃদ্ধি পেয়েছে। এখানে এসে সঠিক জীবনদৃষ্টি সম্পর্কে জানতে পেরেছি। একসময় দুধ-চায়ে আসক্ত ছিলাম। কোর্স করার পর প্রায় সাড়ে চার বছর হলো দুধ-চা থেকে নিজেকে দূরে রাখতে পেরেছি।

[সুমিত সরকার, শিক্ষার্থী, রাজশাহী কলেজ, ৩০০ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]

এখন আমি পুরোপুরি সুস্থ

মোহাম্মদ আবদুল মান্নান



আমি একসময় নেতিবাচকতায় আচ্ছন্ন ছিলাম। যার ফলে চরম অসুস্থ হয়ে পড়ি এবং কোনো চিকিৎসাতেই কাজ হচ্ছিল না। তখন জানতাম না যে এটা মনোদৈহিক রোগ। এক বন্ধুর উৎসাহে

কোয়ান্টাম মেথড কোর্সে অংশগ্রহণ করি। কোর্সের প্রথম দিন থেকেই ধীরে ধীরে সুস্থ বোধ করতে থাকি। এখন আমি পুরোপুরি সুস্থ।

[মোহাম্মদ আবদুল মান্নান, প্রভাষক, রামপুরা একরামুল্লাহ ডিগ্রী কলেজ, ঢাকা, ৩০০ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]

মাইগ্রেন ও পায়ের ব্যথা ভালো হয়ে গেল

সেলিনা আক্তার

মাইগ্রেন ও দুই পায়ের ব্যথায় দীর্ঘদিন ধরে আক্রান্ত ছিলাম। বছরের পর বছর প্রতিটি মুহূর্তে অসহনীয় কষ্ট ভোগ করেছি। সেই সাথে উচ্চ রক্তচাপ, পারিপার্শ্বিক সমস্যা মিলিয়ে দিশেহারা হয়ে

পড়েছিলাম। কোর্স করার পর মাইগ্রেন, পায়ের ব্যথা, উচ্চ রক্তচাপ কিছুই আর নেই। নিয়মিত মেডিটেশন চর্চার ফলে পারিবারিক জীবনও এখন অনেক প্রশান্তিময়।

[সেলিনা আক্তার, গৃহিণী, ৩৯৩ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]



প্রশ্নোত্তর : আজুয়েটদের প্রশ্ন ? উত্তর দিচ্ছেন গুরুজী

প্রশ্ন : আমার জন্মের পূর্বেই আমার বাবা মারা যান। মা খুব কষ্ট করে আমাকে পড়াশোনা করিয়েছেন। বর্তমানে আমি পরিবারসহ ঢাকায় থাকি। মা গ্রামের বাড়িতে থাকেন। সন্তান হিসেবে মায়ের সেবা করা আমার দায়িত্ব। কিন্তু স্ত্রী মাকে একটুও সহ্য করতে পারেন না। মাকে আমাদের সাথে রাখার সাপোর্ট তো দেন-ই না, অন্যদিকে আমি মায়ের কাছে যেন না যাই সেজন্যে আমার নামে বাড়িতে থাকা ভাবীদের সম্পর্কে অপবাদ দেন। মায়ের সেবা করতে গেলে সংসারের অশান্তি, সেবা করতে না পারলে দেখাশোনা করতে না পারলে নিজেকে পাপী মনে হয়। আমি এখন কী করব?

উত্তর : আসলে আপনি যদি আপনার মায়ের সেবা করতে চান, তাহলে আপনার স্ত্রী আপনাকে কতক্ষণ আটকে রাখবে? অর্থাৎ মায়ের সেবা না করার জন্যে স্ত্রীর দোষ দেবেন না। প্রয়োজনে আপনাকে দৃঢ় হতে হবে। স্ত্রীকে বলুন, তোমার অধিকার তোমার, মায়ের অধিকার মায়ের।

ফোনে মায়ের খবর নিন। যখনই সুযোগ পান মাকে দেখতে যান। আর মায়ের সাথে আপনার যোগাযোগ যদি স্ত্রী পছন্দ না করে, তবে এই বিবরণ স্ত্রীকে দেবার কোনো প্রয়োজন নেই। অর্থাৎ এ নিয়ে বাগড়া সৃষ্টি করার কোনো প্রয়োজন নেই।

কারণ মায়ের পায়ের নিচে সন্তানের বেহেশত। স্ত্রীর পায়ের নিচে নয়। অতএব, কোনো নারী মা-বাবার সেবা করা থেকে স্বামীকে কখনো বঞ্চিত করবেন না। কোনো স্বামীও কখনো স্ত্রীকে তার মা-বাবার সেবা করা থেকে বঞ্চিত করবেন না। এটা মহাপাপ।

আজ আপনি বঞ্চিত করবেন, যখন আপনার সেবার প্রয়োজন হবে, আপনার যদি ছেলে থাকে সেই ছেলের স্ত্রীও একদিন আপনার ছেলেকে আপনার সেবা করা থেকে বঞ্চিত করবে। যে স্বামী তার স্ত্রীকে মা-বাবার সেবা থেকে বঞ্চিত করবে তিনিও তার মেয়ের সেবা থেকে বঞ্চিত হবেন। সাধারণভাবে এটাই ঘটে থাকে। এটা হচ্ছে প্রকৃতির শাস্তি। তাই প্রতিজ্ঞা করুন যে, আমি আমার স্বামী/স্ত্রীকে তার মায়ের সেবা করা থেকে কখনো বঞ্চিত করব না।

প্রশ্ন : আমি ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং কোর্স সম্পন্ন করেছি তিন বছর আগে। মনে করেছি টাকা হলে ব্যবসা করব। বাড়ি থেকে টাকা এনেছি কিন্তু ব্যবসায় লস।

উত্তর : বাড়ি থেকে টাকা এনে ব্যবসা করেছে, এমন সফল ব্যবসায়ী আমি দেখি নি। যারা ব্যবসা করে সফল হয়েছে কেউ বাড়ি থেকে টাকা আনে নি। ৯০% সফল ব্যবসায়ীর দিকে তাকান। তাদের বাড়ি থেকে টাকা দেয়ার কোনো লোক ছিল না। সামর্থ্যও ছিল না। তারা স্ব-উদ্যোগে স্ব-পরিকল্পনায় স্ব-অর্থায়নে ব্যবসা করেছে, তারপর টাকা এসেছে।

আসলে প্রত্যেকটা ব্যবসার একটা রহস্য আছে। এই রহস্যটা বুঝতে হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই যারা টাকা নিয়ে ব্যবসা করতে যায়, তারা ব্যবসার রহস্য না বুঝে বিনিয়োগ করে এবং টাকাটা একসময় হারিয়ে যায়। কারণ, ব্যবসার রহস্য না বুঝে ব্যবসায় নামলে যে যা বলে সেটাই সত্যি মনে হয় এবং সে তা-ই করে। এভাবে ব্যবসা হয় না।

ব্যবসা করার জন্যে কাজ বুঝতে হয়। যে ব্যবসা করবেন, সেই ব্যবসাটা আপনাকে বুঝতে হবে। আপনি যখন একটা পুঁজি দিয়ে শুরু করবেন আপনার পুঁজি তো নষ্ট করতে পারবেন না। পুঁজি নষ্ট হয়ে গেলে তো সব শেষ। সেজন্যে পুঁজি কিছু রেখে ব্যবসায় নামবেন। যাতে প্রথম ধাক্কাটা গেলেও আপনি দ্বিতীয় বার সামলে নিতে পারেন।

অর্থাৎ ব্যবসার রহস্যটা বুঝতে পারলে ব্যবসায় আপনি লাভ করতে পারবেন। অতএব, আপনি নিজে উদ্যোগী হোন। ব্যবসা করতে চাইলে শূন্য থেকে এবং ছোটখাটো কিছু দিয়ে শুরু করুন। যে কাজটা আপনি ভালো বোঝেন সেরকম কিছু দিয়ে শুরু করুন। কারণ, শুধু টাকা দিয়ে কখনো ব্যবসায় সাফল্য আসে না।

প্রশ্ন : আমি ডিপ্লোমা করেছি অটোমোবাইল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে। তারপর মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে বিএসসিতে ভর্তি হয়েছি। এখন চাই পড়াশোনা শেষ করে চাকরি করতে। পরবর্তীতে অটোমোবাইল ক্ষেত্রে বাংলাদেশকে সামনের দিকে এগিয়ে নেয়ার ইচ্ছা আছে। কিন্তু আমি এসএসসি এবং ডিপ্লোমা অনেক টেনেটুনে পাশ করেছি। বলা যায় নকল করে পাশ করেছি। কেউ কেউ বলে, তোমার আর পড়াশোনার দরকার নেই। চাকরি করো, ব্যবসা করো বা বিদেশে যাও। আমার ভয় হয়। পেছনে তো নিজেকে অনেক ঠিকিয়েছি, সামনে আর ঠিকানো যাবে না। গুরুজী, আমি পড়াশোনা করতে চাই, তবে বিএসসিতে অনেক বড় বড় অঙ্ক আছে এবং ইংরেজি ভাষানে পড়াশোনা। এখন আমার কী করা প্রয়োজন, দয়া করে বলবেন।

উত্তর : অটোমোবাইল ক্ষেত্রে বাংলাদেশকে সামনের দিকে এগিয়ে নেয়ার ইচ্ছা আছে আপনার। কিন্তু একটা কথা হলো, আপনি যদি নিজেকে এগিয়ে নিতে না পারেন, তাহলে বাংলাদেশকে কখনো এগিয়ে নিতে পারবেন না। আমরা আসলে এখানেই ভুলটা করি। আমরা দেশ নিয়ে চিন্তা করি-দেশের কী হবে? কিন্তু নিজের কাজের দিকে মনোযোগ কম।

আমাকে অনেকে বলে যে, আপনি দেশ নিয়ে চিন্তা করেন না? আমি বলি, করি। দেশ নিয়ে খুব চিন্তা করি। এজন্যে আমি আমার কাজটা ঠিকমতো করতে চাই। কারণ আমি মনে করি, আমরা প্রত্যেকে যদি আমাদের কাজ ঠিকভাবে করি সেটাই হচ্ছে সর্বোচ্চ দেশপ্রেম।

অতএব, আপনার কাজটা আপনাকে ঠিকভাবে করতে হবে। কারণ আপনার কাজের এবং আমাদের সবার কাজের সমন্বয় হচ্ছে দেশের কাজ।

আর আপনি বলছেন, বিএসসিতে অনেক বড় বড় অঙ্ক আর ইংরেজি ভাষানে পড়াশোনা। আসলে এর প্রতি আপনার একটা আতঙ্ক কাজ করছে, আপনি ভয় পাচ্ছেন। কারণ মনোযোগের অভাব। আগেও পড়াশোনায় আপনার যে খুব মনোযোগ ছিল তা নয়। আর আপনার আগে কি কেউ ইংরেজি ভাষানে পড়ে নি? আপনার আগে কি কেউ বিএসসি ইঞ্জিনিয়ার হয় নি? তারা হতে পেরেছে, কারণ তারা মনোযোগ দিয়েছে।

আপনি আসলে আপনার ক্যারিয়ারের ব্যাপারে সুপরিকল্পিতভাবে কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারছেন না। যে যা বলছে তা-ই দিয়ে প্রভাবিত হচ্ছেন। কেউ

বলছে, পড়াশোনা করো। কেউ বলছে, তুমি পারবে না। আপনি আছেন দ্বিধাগ্রস্ত অবস্থায়। তাই আপনাকে বুঝতে হবে যে, আমি বিএসসি কেন পড়ব। পড়ে কী করব।

আর অটোমোবাইলের কাজে দক্ষ হতে বিএসসি পড়লে অবশ্যই ভালো, কিন্তু না পড়লেও চলে কিনা ভেবে দেখুন। অটোমোবাইল যদি আপনি ঠিক করে দিতে পারেন, আপনার সার্টিফিকেট কেউ দেখবে না। আবার আপনি অটোমোবাইল ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে বিএসসি কিংবা পিএইচডি সার্টিফিকেট নিয়ে আসুন, কিন্তু গাড়ি যদি ঠিক করতে না পারেন আপনার সার্টিফিকেট কোনো কাজে আসবে না। টেকনিক্যাল কাজগুলোর ক্ষেত্রে এটা হচ্ছে একটা সুবিধা।

একটা উদাহরণ দেই। ১৯৭২-৭৩ সালের কথা। ঢাকায় জিপিও-র উল্টো দিকে একজন মুচি বসত। সে হাফ-সোল করত, এখনকার ছেলেমেয়েরা তো হাফ-সোল বুঝবে না। তারা জুতা একজোড়া কিনে বাড়ির কোনখানে যে এটা রাখছে, তা-ও নিজেরা বলতে পারে না। তারপর হারিয়ে গেলে বা একটু নষ্ট হলে আবার আরেকটা কিনে নেয় কিংবা বাবা-মা কিনে দেন। কিন্তু তখনকার দিনে এমন ছিল না। জুতা সহজে কেউ ছাড়তে চাইত না, কারণ জুতার দাম ছিল, পয়সার অভাব ছিল। তখন দেশ গরিব, দেশের মানুষের কাছে পয়সাও কম ছিল। জুতা/স্যান্ডলের সোল ক্ষয় হলে ওখানে আবার আলগা চামড়া লাগিয়ে সেলাই করে দেয়া হতো। এটাই হাফ-সোল।

তো, সেই মুচির দোকানে লাইন লেগে থাকত সারাটা বছর। কারণ সে ছিল ঐ কাজে দক্ষ। সে একবার হাফ-সোল করে দিলে মোটামুটি নিশ্চিত থাকা যে, আগামী ছয় মাসে জুতার কিছু হবে না। তার পাশেই আরেক মুচি ছিল, সে বসে আছে তো আছেই, কাস্টমার নেই।

অর্থাৎ টেকনিক্যাল কাজের ক্ষেত্রে দক্ষতাটা খুব গুরুত্বপূর্ণ, আপনার কী ডিগ্রি আছে তার চেয়েও। আপনি অটোমোবাইলের মাস্টার হয়ে যান। যদি বাস্তবজ্ঞান লাভ করেন, যা চান সেটা আপনি পাবেন।

আপনি যদি গাড়ির ইঞ্জিন সারাতে পারেন, ইঞ্জিনের আওয়াজ শুনে যদি বলে দিতে পারেন যে, কোথায় সমস্যা এবং যদি সেটা মেরামত করে দিতে পারেন, তাহলে আপনি যেখানেই থাকুন না কেন, গাড়ির মালিকেরা ওখানে গিয়ে আপনাকে খুঁজে বের করবে। কারণ তার গাড়ি ঠিক হওয়া দরকার। আপনার খ্যাতি ছড়াতে খুব বেশি সময় লাগবে না। কিছুদিনের মধ্যেই আপনি একজন দক্ষ অটোমোবাইল ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে পরিচিতি পেয়ে যাবেন। কিন্তু এজন্যে আপনাকে কঠোর পরিশ্রম করতে হবে। ভালবাসা নিয়ে কাজটা বুঝতে হবে। শিখতে হবে। অন্যের কল্যাণ ও সেবার মানসিকতা থাকলে আপনি সেটা পারবেন।

এ মাসের অটোসাজেশন

নিঃস্বার্থ সেবা করতে শিখলেই

আমি সুখী হবো।

আমি সেবা করতে শিখছি।

ফাউন্ডেশন সংবাদ

বংশালে কোয়ান্টাম সভা



৬ আগস্ট বংশাল উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয় কোয়ান্টাম সভা। শিক্ষার্থীদের নিয়ে এ আয়োজনে আলোচনা করেন অর্গানিয়ার মারুফ ইবনে মাহবুব। ক্লাসে ১ম ও জীবনে ১ম হতে মেডিটেশনের ভূমিকা এবং শিক্ষার্থী জীবনে সাফল্যের সহজ সূত্রগুলো তিনি শিক্ষার্থীদের সামনে তুলে ধরেন। এতে অংশ নেন প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থী ও শিক্ষকবৃন্দ মিলিয়ে ১৫০ জন।

এছাড়াও মিল্লাত উচ্চ বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয় আরেকটি কোয়ান্টাম সভা। এতে শিক্ষার্থী জীবনে সাফল্যের জন্যে মেডিটেশনের গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা করেন ফাউন্ডেশনের আর্ডেন্টিয়ার ফয়সাল রহমান। এ সভায় উপস্থিত ছিলেন বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী ও শিক্ষকবৃন্দ মিলিয়ে ৩২৮ জন।

যাত্রাবাড়ীতে শিক্ষার্থী ওয়ার্কশপ

১ আগস্ট কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন যাত্রাবাড়ী শাখায় অনুষ্ঠিত হয় শিক্ষার্থীদের বিশেষ ওয়ার্কশপ। এবারের বিষয় ছিল 'ট্রাবল শুটিং'। এতে অংশ নেন ২৪ জন শিক্ষার্থী ও সাত জন অভিভাবক।

এ ওয়ার্কশপে 'সামাজিক যোগাযোগের ভার্চুয়াল জগত' বিষয়ে আলোচনা করেন কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন মিডিয়া সেল-এর আহ্বায়ক মোহাম্মদ মাহমুদজ্জামান।

এ আলোচনায় শিক্ষার্থী জীবনে পারিপার্শ্বিক বাধাগুলোর ব্যাপারে সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি ও করণীয় উপস্থাপন করা হয়। এ কার্যক্রমটি পরিচালনা করেন অর্গানিয়ার ইঞ্জিনিয়ার নিজাম হাসান সাদী।

আবশ্যিক

কোয়ান্টাম কসমো স্কুল ও কলেজের জন্যে শিক্ষক/ শিক্ষিকা/ আবাসিক শিক্ষক (ন্যূনতম অনার্স পাশ), বিজ্ঞান বিভাগের জন্যে (পদার্থ বিজ্ঞান, রসায়ন, জীব বিজ্ঞান, উচ্চতর গণিত) শিক্ষক/ শিক্ষিকা আবশ্যিক। বিএড ও নিবন্ধনকৃত প্রার্থীরা অগ্রাধিকার পাবেন। শিশুকানন ও শিশুসদনের শিক্ষার্থীদের দেখাশোনার জন্যে ব্রাদার, সিস্টার (ন্যূনতম এসএসসি পাশ) ও সিকিউরিটি গার্ড আবশ্যিক।

এছাড়াও কোয়ান্টাম-এর জন্যে কিছু সংখ্যক মালি, মাঠকর্মী প্রয়োজন। আত্মহীরা যোগাযোগ করুন:

কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন

৩১/ভি শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদীন সড়ক,
শান্তিনগর, ঢাকা-১২১৭
ফোন : ৯৩৪১৪৪১, ০১৭১৪-৯৭৪৩৩৩



বিশিষ্ট সমাজবিজ্ঞানী ড. অনুপম সেন

১৮ আগস্ট কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন চট্টগ্রাম সেন্টারে আলোকায়ন কার্যক্রমের বিশেষ সেশন অনুষ্ঠিত হয়। এতে 'সমাজ, দর্শন ও নৈতিকতা' বিষয়ে আলোচনা করেন সমাজবিজ্ঞানী ও প্রিমিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ের

উপাচার্য প্রফেসর ড. অনুপম সেন।

তিনি বলেন, আমাদের দেশে গ্রাম ব্যবস্থা হাজার বছর ধরে টিকে ছিল। এ ব্যবস্থায় প্রথম আঘাত আসে ইংরেজদের আগমনে। এর মূল কারণ ছিল ইউরোপের সমাজ দর্শন আমাদের সমাজ দর্শন থেকে আলাদা। মূল্যবোধেও ছিল পার্থক্য। আমাদের দেশের দর্শন ছিল যোগ বা ধ্যান। যে দর্শন চিন্তাবৃত্তির কথা বলে। মনকে সুন্দর করার কথা বলে। সমাজ পরিক্রমায় কোয়ান্টাম আবার আমাদের সেই পুরনো ঐতিহ্য যোগ-ধ্যান, ইতিহাস ও সংস্কৃতির কথা বলছে। মানুষের কাছে পৌঁছে দিচ্ছে সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি ও মানবতার বাণী।

চট্টগ্রাম সেন্টারের অর্গানিয়ার কো-অর্ডিনেশন এস. এম. সাজ্জাদ হোসেনের সভাপতিত্বে এ অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন কোয়ান্টাম কসমো স্কুলের সভাপতি বাবু তিন কড়ি চক্রবর্তী।

কোয়ান্টাম মেডিটেশন সোসাইটি লন্ডন-এর উদ্যোগে রক্তদাতা সম্মাননা অনুষ্ঠান



২ আগস্ট লন্ডনের আইকন কলেজ অব টেকনোলজি এন্ড ম্যানেজমেন্ট-এ আয়োজিত হয় কোয়ান্টাম মেডিটেশন সোসাইটি লন্ডন-এর উদ্যোগে ২য় আজীবন রক্তদাতা সম্মাননা অনুষ্ঠান। তিন বা তার চেয়ে বেশি বার রক্তদান করেছেন, ব্রিটেনে বসবাসরত বাংলাদেশি কমিউনিটির এমন ৩০ জন রক্তদাতাকে এ অনুষ্ঠানে বিশেষ সম্মাননা স্মারক ও সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়। এ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন যুক্তরাজ্যের ন্যাশনাল হেলথ সার্ভিস (এনএইচএস)-এর তিন জন কর্মকর্তা-দোমিনিক সাদারল্যান্ড, মিশেল লাসারনা ও নিকোলা বাকলে।

রক্তদানে বিশেষ অবদানের জন্যে এনএইচএস ব্লাড এন্ড ট্রান্সপ্লান্টের পক্ষ থেকে কোয়ান্টাম

মেডিটেশন সোসাইটি লন্ডন-কে বিশেষ ধন্যবাদ স্মারক প্রদান করেন দোমিনিক সাদারল্যান্ড। উল্লেখ্য, ২০১৪ সালে ব্রিটেনে বাংলাদেশি বংশোদ্ভূতদের দানকৃত স্বেচ্ছা রক্তের ৬০ ভাগই সংগৃহীত হয়েছে কোয়ান্টাম সদস্যদের উদ্যোগে।

২০০৮ সাল থেকে কোয়ান্টাম মেডিটেশন সোসাইটি লন্ডন-এ স্বেচ্ছা রক্তদান কার্যক্রমের যাত্রা শুরু হয়। ৩ এপ্রিল, ২০১১ প্রথমবারের মতো আয়োজিত হয় স্বেচ্ছা রক্তদাতা সম্মাননা অনুষ্ঠান। এ অনুষ্ঠানে কমপক্ষে তিন বার রক্ত দিয়েছেন, এমন ৪০ জন রক্তদাতাকে বিশেষ স্মারক ও সার্টিফিকেট ছাড়াও একবার রক্তদাতা ১৪০ জনকে ধন্যবাদপত্র প্রদান করা হয়।

মাস্টার, গ্রাজুয়েট ও এসোসিয়েট মিলিয়ে উপস্থিত ছিলেন মোট ৫৪ জন।

২২ আগস্ট ফাউন্ডেশনের বনশ্রী কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয় দাতা সভা। কোয়ান্টাম মাটির ব্যাংকে দাতাদের নিয়ে আয়োজন করা হয় এই সভাটি। এতে নিয়মিত দানের গুরুত্ব প্রসঙ্গে আলোচনা করেন কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন মিরপুর সেন্টারের মোমেন্টিয়ার আবদুল্লাহ জুবাইর। দেড় ঘণ্টাব্যাপী এ সভায় অংশ নেন ১১৫ জন দাতা। সম্ভাষণা করেন ফাউন্ডেশনের আর্ডেন্টিয়ার কুলসুমা বেগম শিলন।

ধানমণ্ডি ও বনশ্রীতে দাতা সভা

কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন ধানমণ্ডি শাখার উদ্যোগে ১৪ আগস্ট অনুষ্ঠিত হয় দাতা সভা। মাটির ব্যাংকে দাতাদের নিয়মিত দানে উদ্বুদ্ধ করতে আয়োজন করা হয় ব্যতিক্রমী এই সভার।

এতে আলোচনা করেন ফাউন্ডেশনের আর্ডেন্টিয়ার ও নিকেতন সেলের আহ্বায়ক শাহনাজ বেগম। এছাড়াও প্রদর্শন করা হয় নিয়মিত দানের উপকারিতা নিয়ে বিশেষ ডকুমেন্টারি। এ সভায় প্রো-

কোয়ান্টাম স্বেচ্ছা রক্তদান কার্যক্রম জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে মাসব্যাপী ব্লাড ক্যাম্প



শেখ জামাল ধানমন্ডি ক্লাব লি.-এ আয়োজিত ব্লাড ক্যাম্প উদ্বোধন করেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল

বাংলাদেশ সচিবালয়ে অনুষ্ঠিত দিনব্যাপী ব্লাড ক্যাম্প উদ্বোধন করেন জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় সচিব ড. কামাল আব্দুল নাসের চৌধুরী

১৫ আগস্ট জাতীয় শোক দিবস। এই দিনে জাতীয় জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান শাহাদাত বরণ করেন। দিনটিকে যথাযথ মর্যাদায় স্মরণীয় করে

সর্বস্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ রক্তদান করেন।

দিনব্যাপী এ ক্যাম্প থেকে সংগৃহীত হয় ৯৭ ইউনিট রক্ত। ক্যাম্পটি উদ্বোধন করেন জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় সচিব ড. কামাল আব্দুল নাসের চৌধুরী। জাতীয় শোক দিবসে কোয়ান্টাম স্বেচ্ছা রক্তদান কার্যক্রমের সুশৃঙ্খল আয়োজন এবং সার্বিক সহযোগিতার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন তিনি।

এছাড়াও শেখ জামাল ধানমন্ডি ক্লাব লি.-এ আয়োজিত ব্লাড ক্যাম্পটি উদ্বোধন করেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল।

বাংলাদেশ ব্যাংকের উদ্যোগে দিনব্যাপী ব্লাড ক্যাম্পের উদ্বোধন করেন বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ড. আতিউর রহমান। এখান থেকে সংগৃহীত হয় ৩২ ইউনিট রক্ত।

গাজীপুরে আয়োজিত দিনব্যাপী ব্লাড ক্যাম্পের উদ্বোধন করেন স্থানীয় সাংসদ জাহিদ আহসান

রাসেল এমপি। এখানে আরো উপস্থিত ছিলেন কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন উত্তরা শাখার মোমেন্টিয়ার বেগম শামছুন নাহার হুদা। এ ক্যাম্পে বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ রক্তদান করেন। মোট ১১৩ ইউনিট রক্ত সংগৃহীত হয় এ ক্যাম্প থেকে।

জনতা ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ে আয়োজিত ব্লাড ক্যাম্প উদ্বোধন করেন ব্যাংকের মাননীয় চেয়ারম্যান শেখ মো. ওয়াহিদ-উজ-জামান। এতে জনতা ব্যাংকের ৪৯ জন কর্মকর্তা ও কর্মচারী রক্তদান করেন।

এছাড়াও কোয়ান্টাম স্বেচ্ছা রক্তদান কার্যক্রমের সহযোগিতায় সারা মাসজুড়ে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে ব্লাড ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয়। জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে এ ব্লাডক্যাম্পগুলো আয়োজিত হয় ইডেন মহিলা কলেজ, অতীথ দীপঙ্কর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, মেরিনার্স ক্লাব, সাউথ ইস্ট ইউনিভার্সিটিসহ আরো প্রতিষ্ঠানে।



বাংলাদেশ ব্যাংকে দিনব্যাপী ব্লাডক্যাম্প উদ্বোধন করেন গভর্নর ড. আতিউর রহমান

রাখতে আগস্ট মাসব্যাপী বিভিন্ন স্থানে ব্লাড ক্যাম্পের আয়োজন করে একাধিক সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, সংস্থা ও বিশ্ববিদ্যালয়। যার মধ্যে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ ব্যাংক, জনতা ব্যাংক, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, সমাজসেবা অধিদপ্তর, শেখ জামাল ধানমন্ডি ক্লাব লি. উল্লেখযোগ্য। উল্লেখ্য, কোয়ান্টাম স্বেচ্ছা রক্তদান কার্যক্রমের সার্বিক সহযোগিতায় এ ক্যাম্পগুলো অনুষ্ঠিত হয়।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কর্তৃক আয়োজিত ব্লাড ক্যাম্পটি অনুষ্ঠিত হয় সচিবালয় প্রাঙ্গণে। এ ক্যাম্পে উক্ত মন্ত্রণালয়ের



জনতা ব্যাংকে প্রধান কার্যালয়ে ব্লাডক্যাম্প উদ্বোধন করেন ব্যাংকের চেয়ারম্যান শেখ মো. ওয়াহিদ-উজ-জামান



গাজীপুরে আয়োজিত ব্লাডক্যাম্প উদ্বোধন করে জাহিদ আহসান রাসেল এমপি

বিশিষ্ট সাংবাদিক
সৈয়দ আবুল মকসুদ

রক্তদাতারা প্রকৃত
নিঃস্বার্থ দাতা



কোয়ান্টাম বুলেটিন



অক্টোবর ২০১৫

বিশেষ আলোচনায় গুরুজী

কাজ করতে হবে ১৮ ঘণ্টা

প্রতিদিনের দান
পরিণত হোক অভ্যাসে



বেশ কয়েক বছর আগে আমার একজন নিকটাত্মীয়কে রক্তের অভাবে মারা যেতে দেখেছি। সেই থেকে বুঝি যে, নিরাপদ রক্ত পরিসংখ্যানের গুরুত্ব অপরিণীম। আমি জেনেছি, কোয়ান্টাম সাত লক্ষ মানুষকে বিশুদ্ধ রক্ত দিয়ে জীবন বাঁচাতে সাহায্য করেছে। আর এ কাজটি সম্ভব হয়েছে রক্তদাতাদের দানের ফলে। রক্তদাতারা আজকের সমাজে প্রকৃত নিঃস্বার্থ দাতা।

আজ তারা এখানে যা পাচ্ছেন তা একটি স্বীকৃতিমাত্র, এর চেয়েও বড় সম্মান তাদের জন্যে অপেক্ষা করছে। কারণ, এ দানের মূল্য অনেক বেশি। এ কাজে মানুষের দোয়া এবং একটি আত্মিক বিষয়ও জড়িত।

ভবিষ্যতেও মানুষের কল্যাণে তারা এগিয়ে আসবেন, সে শক্তি আমি এই রক্তদাতাদের মাঝে দেখতে পাই। এবং বিশ্বাস করি, তাদের মধ্য থেকেই জেগে উঠবে আগামী দিনের মহৎ মানুষ। আর উন্নত জীবনবোধ থেকে এমন একটি কাজের উদ্যোগ নেয়ার জন্যে আমি কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশনকে ধন্যবাদ জানাই।

শৈশব থেকেই আমার একটা আত্মহের বিষয় হলো, বিভিন্ন জায়গায় মহৎ কাজ করা করছেন, কী করছেন তা দেখা এবং সে-সম্পর্কে জানা। গত ৪০ বছরেরও বেশি সময় ধরে সাংবাদিকতা ও কাজের সূত্রে আমি দেশের প্রত্যন্ত এলাকায় গিয়েছি। এছাড়াও গবেষণার প্রয়োজনে এ অঞ্চলের গত দশ বছরের ইতিহাস নিয়ে আমি পড়াশোনা করেছি, এর ওপর কাজ করেছি। তাতে দেখেছি, নীরব কাজই শেষপর্যন্ত দীর্ঘস্থায়ী হয়। মানবকল্যাণে কোয়ান্টামের কর্মপ্রয়াস দেখে আমি অভিভূত! নীরব কাজই কোয়ান্টামের সবচেয়ে বড় শক্তি।

[বিশিষ্ট সাংবাদিক কলামিস্ট লেখক গবেষক সৈয়দ আবুল মকসুদ গত ১৬ সেপ্টেম্বর কোয়ান্টাম স্বেচ্ছা রক্তদান কার্যক্রম আয়োজিত ১১৮ তম শত আজীবন রক্তদাতা সম্মাননা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে আমন্ত্রিত হন। রক্তদাতাদের উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠানে তিনি একথা বলেন]

প্রতিদিন কাজ করুন ১৮ ঘণ্টা। কাজ করুন নিজের কল্যাণে, সৃষ্টির কল্যাণে। দিন শুরু করুন দান দিয়ে। আপনার জীবনে বিষণ্ণতা হতাশা বলে কিছু থাকবে না। মুক্তি পাবেন সকল আসক্তি থেকে। আর আসক্তি থেকে মুক্ত হলে দুঃখ দারিদ্র্য অভাব পালিয়ে যাবে আপনার জীবন থেকে। তাই আপনার সকল মেধা, শক্তি ও সামর্থ্য ব্যয় করুন কাজের পেছনে।

অর্গানিয়ারদের এক বিশেষ কার্যক্রমে একথা বলেন গুরুজী শহীদ আল বোখারী মহাজাতক।

গুরুজী বলেন, অলস সময়ই হচ্ছে আসক্তির আঁতুড় ঘর। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অলস সময় যাদের রয়েছে, তারাই আসক্তির বৃত্তে আটকে যায়। আমরা যদি চারপাশে তাকাই, দেখব সমাজের অধিকাংশ মানুষই আজ নানা রকম আসক্তির বৃত্তে আটকে পড়েছে। ফলে জীবন হয়ে উঠেছে ক্রমশ জটিল ও অস্থিরতাপূর্ণ।

এ আসক্তি হতে পারে বহু রকমের। কেনাকাটা ও পণ্যাসক্তি, ফেসবুক-ইন্টারনেট-স্মার্টফোন আসক্তি, টিভি/সিরিয়াল আসক্তি থেকে শুরু করে খাদ্যাসক্তি, মাদকাসক্তি (কোমল পানীয়, এনার্জি ড্রিংকস ইত্যাদি) পর্যন্ত বিস্তৃত এর পরিধি।

এ সর্বশাসী আসক্তির ক্ষতিকর প্রতিক্রিয়া আজ আমরা দেখতে পাই পাশ্চাত্যের জীবন ও সমাজব্যবস্থায়। সে-দেশের সমাজবিজ্ঞানী ও মনোবিজ্ঞানীদের অসংখ্য গবেষণা প্রতিবেদনে ফুটে উঠেছে তাদের বর্তমান সামাজিক অন্তঃসারশূন্যতা।

দৈনন্দিন জীবনে হরদম ক্র্যাসসিটি নিয়ে রিডার্স ডাইজেস্টে (ডিসেম্বর ২০১১) প্রকাশিত একটি নিবন্ধের সূত্র ধরে তিনি বলেন, খোদ পাশ্চাত্যের গবেষকরাই বলছেন, কেনাকাটাই আজ পাশ্চাত্যের নতুন ধর্ম এবং বড় বড় শপিং-মলগুলো হলো যেন একেকটা ক্যাথেড্রাল বা বড় বড় উপাসনা কেন্দ্র।

তিনি বলেন, পাশ্চাত্যের অনুকরণে এই পণ্যাসক্তি গত কয়েক দশক ধরে ছড়িয়ে পড়েছে আমাদের দেশেও। নিজেরা সচেতন হওয়ার পাশাপাশি কোয়ান্টাম মেথডের শুরু থেকেই এ ব্যাপারে আমরা সবাইকে সচেতন করে তোলার চেষ্টা করেছি।

তখনই আমরা বলেছি, সামাজিক সম্মান এখন সততার ওপর নয়, নির্ভর করছে ক্রয় ক্ষমতার ওপর। আমরা এখন মানুষ নই। আমাদের পরিচয় হচ্ছে আমরা ভোক্তা বা ক্রেতা। আর এ কথাগুলোই এখন বলছেন পাশ্চাত্যের প্রথম সারির গবেষক ও বিশ্লেষকরা।

২০০৮ সালে যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্র থেকে একযোগে প্রকাশিত একটি বেস্টসেলার গ্রন্থ buyology-তে এর লেখক মার্টিন লিভস্ট্রম বলেন, 'আজ আমাদের স্বীকার করে নিতে হবে যে, আমরা সবাই ক্রেতা। মোবাইল ফোন, প্রসাধনী কিংবা কোমল পানীয় যা-ই আমরা কিনি না কেন, আমাদের দৈনন্দিন জীবনের একটা বড় অংশ জুড়েই আছে কেনাকাটা।'

এছাড়াও আছে ইন্টারনেট আসক্তিসহ বহু রকম মিডিয়া আসক্তি। অথচ বিশ্বজুড়ে স্বাস্থ্য-গবেষকরা বলছেন, মানবদেহের সার্বিক সুস্থতার পথে এটি অন্তরায়। দিনের একটি বড় সময় জুড়ে মোবাইল, ইন্টারনেট সময় কাটানোর দরুন সৃষ্টি হয় স্ট্রেস। ফলশ্রুতিতে শরীরের প্রতিরক্ষাব্যবস্থা ক্রমশ দুর্বল হয়ে যাওয়ার পাশাপাশি দেখা দিতে পারে নানারকম মনোদৈহিক জটিলতা।

গুরুজী বলেন, জীবন একটাই। সার্বিক সুস্থতা ও কর্মোদ্যমের মধ্য দিয়ে সৃষ্টির প্রতিনিধিত্বের দায়িত্ব পালনের এটাই সুযোগ। তাই আসক্তির বৃত্ত ভেঙে আমাদের বিচরণ করতে হবে কাজের আনন্দলোকে। তাহলেই আমরা প্রশান্তি ও প্রাচুর্যের সন্ধান পাব।

দাতা হোন। দাতার কখনো অভাব হয় না। দাতার জীবনেই আসে প্রাচুর্য, আসে স্থায়ী সুখ। দাতা হতে হলে দান করতে হবে নিয়মিত। পরিমাণটা হবে আপনার সাধ্যমতো। তা হতে পারে ৫, ১০, ২০, ৫০০ বা হাজার টাকা। যা-ই দিন, দিতে হবে প্রতিদিন। তাই সকালে নাশতার আগেই দানের টাকা জমা দিন মাটির ব্যাংকে। আল্লাহর দরবারে দাতার তালিকায় লিপিবদ্ধ হোক আপনার নাম। সমস্ত অকল্যাণ দূর হোক আপনার জীবন থেকে।

আর সকালে আপনি তৃপ্তি নিয়ে নাশতা করতে পারবেন এই ভেবে যে, আপনার ক্ষুদ্র দান হয়তো জোগাবে কোনো নিরন্তর অনু, আলোকিত করবে কোনো এতিম-অনাথের জীবন।

গুরুজীর এই আহ্বানে সাড়া দিয়ে ইতোমধ্যেই কোয়ান্টাম পরিবারের সদস্যরা এই চর্চা শুরু করেছেন। গ্রাজুয়েট প্রো-মাস্টার আর্ডেন্সিয়ারদের পাশাপাশি এসোসিয়েটরাও এটি অনুসরণ করছেন। দিনের শুরুতে দান পরিণত হচ্ছে কোয়ান্টাম পরিবারের সদস্যদের নিয়মিত অভ্যাসে।

প্রতিদিন সকালে নাশতার আগেই তারা দান করছেন মাটির ব্যাংকে। উপকৃতও হচ্ছেন জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে। কারো প্রশান্তি বেড়েছে, কেউ মুক্ত হয়েছেন অহেতুক দৃষ্টিভ্রান্তি থেকে, কেউ সারাদিনের কাজগুলো করতে পারছেন সময়মতো, আগের চেয়ে বেড়েছে সুস্থতা ও প্রাণবন্ততা। অপচয় কমেছে, আয়ে বরকত এসেছে। পরিবারে এসেছে সুখ ও সমৃদ্ধি।

কর্মসূচি : অক্টোবর

প্রথমায়ন ওরিয়েন্টেশন

২৩ ও ২৪ অক্টোবর। কাকরাইল

কোয়ান্টাম শিক্ষার্থী ওরিয়েন্টেশন

৩০ ও ৩১ অক্টোবর। যাত্রাবাড়ী

হৃদরোগ প্রতিরোধ ও নিরাময় ওরিয়েন্টেশন

২৩ ও ২৪ অক্টোবর। বনশ্রী

ড. নূরুর রহমান খান। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রাক্তন অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান। কথাসাহিত্যিক সৈয়দ মুজতবা আলীর জীবন ও কর্মের ওপর তার রয়েছে গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা ও সাহিত্যকর্ম। 'সৈয়দ মুজতবা আলী : জীবনকথা' এবং 'মুজতবা-সাহিত্যের রূপবৈচিত্র্য ও রচনামণ্ডলী' তার রচিত দুটি উল্লেখযোগ্য গবেষণাগ্রন্থ। বর্তমানে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ ও সংস্কৃত বিভাগের খণ্ডকালীন শিক্ষক এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশনা সংস্থার পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। অধ্যাপক নূরুর রহমান কোয়ান্টাম মেথডের ২২৩ ব্যাচে অংশ নেন। তার সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে আমাদের এবারের প্রতিবেদন।

চিন্তের বিকাশ ও সমাজের কল্যাণে কাজ করছে কোয়ান্টাম

অধ্যাপক ড. নূরুর রহমান খান

১৯৯৬ সালের কথা। আমার স্ত্রী হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লেন, তার চিকিৎসার জন্যে রক্তের প্রয়োজন হলো। রক্ত দিলেন কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশনের নিবেদিতপ্রাণ সুরাইয়া রহমান এবং আরেকজন সদস্য। তখন কোয়ান্টামের নিজস্ব কোনো ল্যাব ছিল না, কারো রক্তের প্রয়োজন হলে কোয়ান্টাম পরিবারের সেবাব্রতী সদস্যরা বিভিন্ন ক্লিনিক-হাসপাতালে গিয়ে রক্তদান করে আসতেন।

ইতঃপূর্বে আমার স্ত্রী পুত্র কন্যা এবং নিকটাত্মীয়রা কোয়ান্টাম মেথড কোর্সে অংশ নিয়েছিলেন। মূলত তাদেরই অনুপ্রেরণায় পরে আমিও কোর্সটি করি। এবং বেশ চমৎকৃত হই।

হাজার বছর আগে আমাদের এ অঞ্চলে ব্যাপকভাবে চর্চিত একটি বিষয় ছিল এই ধ্যান। সাধনার প্রাচীন এ পদ্ধতিটি আমাদের জীবন থেকে অবলম্বন হয়ে গিয়েছিল প্রায়। একে আবার নতুন করে প্রাণদান করল কোয়ান্টাম। আধুনিক মানুষের মনোদৈহিক ও সার্বিক কল্যাণার্থে একে সঞ্জীবিত করেছেন আমাদের গুরুজী। একটি বড় লক্ষ্যকে সামনে রেখে ধ্যান বা মেডিটেশনকে তিনি করে তুলতে চাইছেন আমাদের একটি নিত্য অভ্যাস।

প্রায় দু-দশক ধরে আমি দেখেছি, কোয়ান্টাম যে শুধু ব্যক্তিমানুষের কল্যাণ ও জাগরণের প্রতিই মনোযোগী, তা নয়; এর পরিধি বাড়ার সাথে সাথে সমাজের নানা প্রয়োজনে সজ্ঞবদ্ধভাবে এগিয়ে এসেছেন কোয়ান্টাম পরিবারের সর্বস্তরের সদস্যরা।

নিরাপদ রক্ত পরিসঞ্চালনের জন্যে সবার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দানে অত্যাধুনিক ল্যাব প্রতিষ্ঠা, প্রসূতি মায়াদের জন্যে প্রয়োজনীয় চিকিৎসা, পুষ্টি ও স্বাস্থ্যসেবা এবং বান্দরবানের লামায় স্কুল প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে বিত্তহীন পরিবারের শিশুদেরকে বুদ্ধিমত্তা, খেলাধুলা ও উন্নত জীবনের আলোয় আলোকিত করার চেষ্টা ইত্যাদি কার্যক্রমগুলো সত্যিকার অর্থেই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

বছর কয়েক আগে লামার কোয়ান্টাম কসমো স্কুল এন্ড কলেজে আমি গিয়েছিলাম। সে-বছরের ভর্তি পরীক্ষাটা দেখার সুযোগ হয়েছিল আমার। সুযোগ ঘটেছিল ওখানে ভর্তিচ্ছু পাহাড়ি বাঙালি শিশুদের দেখার এবং ওদের বাবা-মা-অভিভাবকদের সাথে আলাপ করে অনেক কিছু জানার।

সে-বার দেখেছিলাম, অধিকাংশ দরিদ্র দুস্থ বঞ্চিত পরিবারের শিশুদের

পাশাপাশি ওখানে ভর্তি হতে এসেছে সচ্ছল পরিবারের শিশুরাও। তেমনি এক শিশুর অভিভাবক আমাকে এসে বললেন, স্যার, আমার ছেলেটাকে আপনাদের স্কুলে ভর্তি করে নিন। জানতে চাইলাম, তিনি কেন এত দূর থেকে এখানে এসেছেন। চাইলে তো পয়সা খরচ করে শহরের স্কুলে ভর্তি করাতে পারেন সন্তানকে।

তিনি বললেন, 'আমাদের এলাকায় একটি হতদরিদ্র পরিবার আছে, নোংরা অপরিচ্ছন্ন পরিবেশে ওদের বসবাস। তাদের একটি সন্তান গত বছর এ স্কুলে ভর্তি হওয়ার সুযোগ পেয়েছে। তিন/ চার মাস পর যখন সে প্রথম বাড়ি গেল, দেখি, বেশ পরিপাটি পরিচ্ছন্ন সুন্দর একটি শিশু। তার আচার-আচরণ চলাফেরা সবকিছুর মধ্যেই অনেক পরিবর্তন! আমার বাচ্চাটা এ স্কুলে ভর্তি হতে পারলে ওর জীবনটাও বদলে যাবে, স্যার।'

তার আকৃতি দেখে খুব অবাক হলাম। আমার মনে হলো, সন্তানদের পড়াশোনা ও সুন্দর বিকাশের জন্যে সব অভিভাবকই চায় এমন একটা পরিপূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাসের জায়গা। কোয়ান্টাম সেটাই দিতে পেরেছে।

এর কিছুদিন পর আবার যাওয়ার সুযোগ হলো ওখানে। ইচ্ছে ছিল,

আগের বার যে শিশুদের ভর্তি করেছিলাম তাদের দেখব-ওরা কেমন আছে, কী করছে।

একদিন সকালে স্কুলের মাঠে বসে আছি। বাচ্চাদের খেলাধুলা দেখছি। এমন সময় এক ক্ষুদ্র শিক্ষার্থী আমার কাছাকাছি এসে দাঁড়াল। একটু একটু করে এগিয়ে এসে বসল প্রায় আমার কোল ঘেষে। বলল, 'স্যার, আপনি কোথেকে এসেছেন?' বেশ সপ্রতিভ আর সাহসী সেই ছেলেটি। তার সাথে অনেক কথা হলো। ক্লাস টু-তে পড়ে সে। বাবা রিকশা চালায়, মা অন্যের বাড়িতে কাজ করে। বললাম, কেমন লাগে এখানে? সে বলল, খুব ভালো।

একপর্যায়ে আমাকে বেশ অবাক করে দিয়ে ছেলেটি বলল, 'স্যার, আপনার ছেলে আছে?' বললাম, 'আছে, কেন?' সে বলল, 'ওকে এখানে ভর্তি করে দেন স্যার। আমাদের স্কুলে অনেক আনন্দ। সবকিছুই খুব সুন্দর। ও এই স্কুলে ভর্তি হলে আমাদের সাথে অনেক আনন্দে থাকবে।'

তার কথা শুনে হেসে ফেললাম। বললাম, ভর্তি তো করতেই চাই, কিন্তু এখন তো আর ভর্তি করা যাবে না। সে যে এখন অনেক বড় হয়ে গেছে!

ছেলেটির স্বতঃস্ফূর্ত উচ্ছ্বাস দেখে একটা আশাবাদ অনুভব করেছিলাম নিজের ভেতরে। শৈশব থেকেই কল্যাণ চেতনায় উদ্ভুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত এই ছেলেটিই যখন একদিন বড় হবে; সমাজ

ও দেশের জন্যে কাজ করবে তখন এই দেশ তো আর আজকের দেশ থাকবে না। পরিবর্তন আসবেই।

উন্নত বিশ্বে এ কাজগুলো করে রাষ্ট্র কিংবা সমাজের বিত্তবান মানুষেরা। আমাদের সমাজেও বিত্তবান অনেকেই আছেন বটে, কিন্তু চিন্তবান সকলেই নন। কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন তার সব ধরনের কাজ ও উদ্যোগের মধ্য দিয়ে মানুষকে চিন্তবান করে তুলছে। চিন্তের গুণ্ণমা করছে। ধ্যান ও সেবার পথ ধরে মানুষকে জাগিয়ে তুলছে। সব মিলিয়ে বলতে পারি, চিন্তের বিকাশ ও সমাজের কল্যাণে কাজ করে যাচ্ছে কোয়ান্টাম।

সাক্ষাৎকার গ্রহণ ও অনুলিখন : ডা. আতাউর রহমান



সেন্ট্রাল উইমেন'স ইউনিভার্সিটির প্রাক্তন অধ্যাপক সহধর্মিণী ফিক্রিয়া বেগম (৩০ ব্যাচের গ্রাজুয়েট), জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী অধ্যাপক ও বর্তমানে স্কটল্যান্ডের এবার্ডিন ইউনিভার্সিটিতে পি-এইচ.ডি গবেষণারত কন্যা সুমাইয়া ফারাহ খান এবং যুক্তরাষ্ট্রের মেরিল্যান্ডে অবস্থিত নাসা-য় (NASA) পোস্ট ডক্টরাল গবেষণাকর্মে নিয়োজিত পুত্র রুবায মো. ইমরোজ খান সৌরভের (উভয়েই ৪২ ব্যাচের গ্রাজুয়েট) সাথে অধ্যাপক নূরুর রহমান খান

মেডিটেশন ও সুস্থ জীবনাচার বিষণ্নতা প্রতিরোধ ও নিরাময় করে

আপনার প্রতিবেশী যখন চাকরি হারায় সেটা মন্দা (Recession), আপনি হারালে যা ঘটে সেটাই বিষণ্ণতা (Depression)। সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট রোনাল্ড রিগ্যান কথাটা হয়তো বলেছিলেন কিছুটা কৌতুকচ্ছলেই। কিন্তু বিষণ্ণতার কবলে পড়েন যিনি, তিনিই কেবল বোঝেন এর প্রতিদিনকার যন্ত্রণা আর মর্মবেদনা। অগণিত ভোগ্যপণ্য আর নিত্যনতুন প্রযুক্তির ভিড়ে মানুষ যখন ক্রমাগত হারিয়ে ফেলেছে নিজেকেই, তখন বিশ্বজুড়ে বিষণ্ণতার প্রকোপ বাড়ছে, এ আর অস্বাভাবিক কী!

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে, বর্তমানে পৃথিবীজুড়ে ৩৫ কোটিরও বেশি মানুষ নানা মাত্রায় বিষণ্ণতার শিকার। এ এখন আর নির্দিষ্ট কোনো বয়সের সীমায় আটকে নেই। '৬০-এর দশকে বিষণ্ণতা-আক্রান্ত হওয়ার গড় বয়স ছিল ২৯ বছর, এখন তা নেমে এসেছে ১৪-তে!

যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল কলেজ হেলথ সার্ভে-র অধীনে সে-দেশের কলেজ-ছাত্রদের ওপর বিষণ্ণতার প্রকোপ নিয়ে একটি অনুসন্ধান চালানো হয়। কয়েক বছর ধরে পরিচালিত ব্যাপক আকারের এ গবেষণা থেকে বেরিয়ে আসে রীতিমতো ভয়াবহ তথ্য। যুক্তরাষ্ট্রের কলেজ-ছাত্রদের শতকরা ৪৫ ভাগ মোটামুটিভাবে বিষণ্ণতা-আক্রান্ত। আর শতকরা ৮০ জনই রয়েছে বিষণ্ণতা-ঝুঁকিতে।

বিষণ্ণতার কারণ, প্রতিকার ও এটি প্রতিরোধের কার্যকর উপায় নিয়ে প্রকাশিত গবেষণা প্রতিবেদনের ভিত্তিতে বিষণ্ণতা প্রতিরোধ ও নিরাময়ের কয়েকটি উপায় বাতলে দিয়েছেন বিজ্ঞানীরা।

চাই গভীর ঘুম

অনিদ্রা বা গভীর ঘুমের অভাব বিষণ্ণতার একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ। ঘুম আর বিষণ্ণতার মধ্যকার পারস্পরিক সম্পর্কটি বিপরীতমুখী। বিষণ্ণতা ঘুমের ব্যাঘাত ঘটায়, আবার অগভীর ঘুম ঠেলে দেয় বিষণ্ণতার দিকে। অর্থাৎ ঘুম ভালো না হলে বিষণ্ণতার মাত্রা বাড়ে, আর এর মাত্রা যত বাড়ে ঘুম ক্ষতিগ্রস্ত হয় ততটাই। এ এক দুষ্টচক্র, কিছুদিন টানা চলতে থাকলে যা পরিস্থিতিতে নিয়ে যেতে পারে আরো খারাপের দিকে।

তাই প্রতিদিন পর্যাপ্ত ঘুমান। আপনার ঘুমের সঠিক পরিমাণ নির্ভর করে আপনার জীবনযাত্রা ও বয়সের ওপর। গবেষকরা বলেন, স্বাভাবিকভাবে দিনে প্রয়োজন গড়ে ছয় ঘণ্টা ঘুম।



ব্যায়াম : ওষুধের চেয়েও কার্যকর

ব্যায়ামের সাথে মনোদৈহিক সুস্থতার সুসম্পর্ক নিয়ে গবেষণা হয়েছে বিস্তার। বলা হচ্ছে, এ-সংক্রান্ত গবেষণায় বিপ্লব ঘটে গেছে। আর তার ফলে মনের সুস্থতার জন্যে শারীরিক পরিশ্রমের গুরুত্ব নতুনভাবে উপলব্ধি করছেন মনোবিদরা।

যুক্তরাষ্ট্রের ডিউক মেডিকেল স্কুলের গবেষক মিশেল ব্যাবিয়াক ও তার সহযোগীরা এ-সম্পর্কিত একটি গবেষণা পরিচালনা করেছেন, যেখানে তীব্র বিষণ্ণতা-আক্রান্ত ১৫৬ জন রোগীকে নির্বাচন করা হয়—যারা অনিদ্রা ও ক্ষুধামান্দ্যায় ভুগছিলেন, এমনকি আত্মহত্যার চিন্তাও তাদের পেয়ে বসেছিল।

১৫৬ জনকে তিনটি গ্রুপে ভাগ করেন গবেষকরা। প্রথম গ্রুপকে সপ্তাহে তিন দিন আধঘণ্টা করে হালকা ব্যায়ামের পরামর্শ দেয়া হয়। দ্বিতীয় গ্রুপকে দেয়া হয় বিষণ্ণতার চিকিৎসায় ব্যবহৃত প্রচলিত ওষুধ। তৃতীয় গ্রুপকে ব্যায়াম এবং ওষুধ দুয়েরই পরামর্শ দেয়া হয়।

চার মাস পর পাওয়া গেল অভূতপূর্ব ফলাফল। তিনটি গ্রুপের মধ্যে শতকরা ৬০ জনেরই অবস্থার উন্নতি ঘটেছে। অর্থাৎ বিষণ্ণতা প্রতিকারে ব্যায়াম ওষুধের মতোই কার্যকর।

না, এখানেই শেষ নয়। সুস্থ হওয়া রোগীদের ছয় মাস পর ফলো-আপ করলেন ব্যাবিয়াক। রিপোর্টে দেখা গেল, যারা ওষুধ সেবন করেছিলেন তাদের শতকরা ৩৮ জন এবং যারা ব্যায়াম ও ওষুধ দুয়েরই সাহায্য নিয়েছেন তাদের শতকরা ৩১ জন পুনরায় বিষণ্ণতা-আক্রান্ত হয়েছেন। আর যারা শুধু ব্যায়াম করেছেন তাদের পুনরায় আক্রান্ত হওয়ার হার মাত্র শতকরা ৯ ভাগ।

উপসংহারে বলা হয়, বিষণ্ণতা রোধে ওষুধের চেয়েও ব্যায়াম দীর্ঘমেয়াদে অধিকতর কার্যকরী। গবেষকরা বলছেন, হাজারো গবেষণায় এটি এখন প্রমাণিত যে, আমাদের মনোদৈহিক সুস্থতার জন্যে ব্যায়াম দারুণভাবে উপকারী এবং বিষণ্ণতা রোধে এটি সর্বোত্তম পন্থা।

মেডিটেশন আপনাকে সুখী করে

আমাদের সার্বিক সুস্থতার জন্যে মেডিটেশন আজ পরীক্ষিত পদ্ধতি। দীর্ঘ পর্যবেক্ষণের পর বিজ্ঞানীরা রায় দিচ্ছেন, দৃষ্টিশক্তি ও বিষণ্ণতার মতো পরিস্থিতি থেকে রেহাই পেতে মেডিটেশন অন্যতম শক্তিশালী হাতিয়ার। আধুনিক চিকিৎসা সরঞ্জাম সহযোগে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে তারা বুঝতে সমর্থ হয়েছেন নিয়মিত মেডিটেশন চর্চাকারীদের মস্তিষ্কের গঠন ও গতিপ্রকৃতি।

মানব মস্তিষ্কের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ প্রি-ফ্রন্টাল কর্টেক্স। এর বাম দিকটি যাদের বেশি সক্রিয় তারা সুখী। ডান দিকটি বেশি সক্রিয় যাদের তারা কিছুটা মনমরা, বিষণ্ণ। ইইজি ও এমআরআই-এর সাহায্যে নিয়মিত মেডিটেশন চর্চাকারী সন্ন্যাসীদের মস্তিষ্ক পর্যবেক্ষণ করে বিজ্ঞানীরা বলছেন,

তাদের প্রি-ফ্রন্টাল কর্টেক্সের বাম দিকটি তুলনামূলক বেশি সক্রিয়। তারা ইতিবাচকতায় উদ্দীপ্ত এবং নেতিবাচক আবেগের মুখে ততটাই দৃঢ়, অটল।

গবেষকরা জানাচ্ছেন, মেডিটেশনের সুফল পেতে গৃহত্যাগী সন্ন্যাসীদের মতো এটি সারাদিন চর্চা করতে হবে তা নয়, দিনে ১৫ মিনিট ধ্যানচর্চাও এনে দিতে পারে কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন।

রক্তে শর্করা-মান থাকুক নিয়ন্ত্রণে

বিষণ্ণতা রোধে রক্তের শর্করা-মান নিয়ন্ত্রণ একটি কার্যকরী পদক্ষেপ। রক্তের শর্করা-মান কমে গেলে বিষণ্ণতা এসে ভিড়তে পারে। স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা জানাচ্ছেন, শরীর আর মন পরস্পর গভীরভাবে সংযুক্ত। একটি বিকল হলে পিছু নেয় অন্যটিও।

সাধারণত রক্তে শর্করা-ধস (Low Blood Sugar) নামে শর্করা-তুঙ্গতার (High Blood Sugar) পথ ধরেই। তাই রক্তে শর্করার পরিমাণ অতিরিক্ত বাড়তে না দেয়াটাই হবে শর্করা-ধস ঠেকানোর মোক্ষম উপায়। আর এজন্যে একবারেই বেশি নয়, বরং একই পরিমাণ শর্করা সারাদিনে খাওয়া চাই ভাগ ভাগ করে। সাথে পরিমাণ মতো প্রোটিন ও ফ্যাটের পাশাপাশি চাই প্রচুর আঁশ-জাতীয় খাবার (ন্যূনতম ১২ গ্রাম/ হাজার ক্যালরি)।

খুঁজে নিন আপনার আনন্দের কাজটি

আপনার পছন্দের কিংবা ভালোলাগার কাজ কোনটি, সবচেয়ে ভালো জানেন তা আপনিই। সে কাজে ডুবে গেলে দৃষ্টিশক্তি ক্রমে কষ্টের কোনো অনুভূতিই স্পর্শ করে না আপনাকে। আত্মমগ্ন হয়ে পড়েন আপনি। সে-কাজে সময় দিন। তা নিয়ে আনন্দময় সময় কাটান। আপনি ভালো থাকবেন। বিষণ্ণতার স্মৃতি থাকবে অনেক দূরে।

তাই আপনার পছন্দের কাজটি খুঁজে বের করা জরুরি, যে কাজের আনন্দ কখনো ফুরিয়ে যায় না। হতে পারে তা ছবি আঁকা, লেখা, খেলাধুলা কিংবা আত্ম উন্নয়নমূলক কাজে সময় ব্যয় এবং মানুষের জন্যে কাজ করা।

একা নয়, থাকুন একসাথে

মহীয়সী মাদার তেরেসার কথা হলো, 'একাকিত্ব আর মমতাহীনতার অনুভূতিই সবচেয়ে ভয়াবহ দারিদ্র্য।' বলা যায়, সেই দারিদ্র্যই ভুগছে আধুনিক মানুষ। এত পণ্যের অবিরাম প্রাচুর্য, কিন্তু বাড়ছে স্বজনহীন মমতাহীন নিঃসঙ্গ দিনযাপনের ঘটনা।

আজকের পৃথিবীতে বিষণ্ণতার হার বৃদ্ধির অন্যতম প্রধান কারণ এটিই, বলছেন গবেষকরা। সামাজিক সম্পর্কগুলোতে তো বটেই, চিড় ধরেছে পারিবারিক সম্পর্কের উষ্ণতায়ও। অতিরিক্ত চাপ, টিভি আর হরেক রকম প্রযুক্তি ভীষণভাবে প্রভাবিত করছে আমাদের প্রিয় সম্পর্কগুলোকে।

অথচ, বন্ধু স্বজন প্রতিবেশীদের সাথে হাসি-আনন্দে সময় কাটানোকে স্বাস্থ্যকর সামাজিক পন্থা (Healthy Social Medicine) হিসেবে অভিহিত করেছেন বিশেষজ্ঞরা। তারা বলেন, নিঃসঙ্গ মানুষের ওপরই বিষণ্ণতার আক্রমণ বেশি। আবার বিষণ্ণতা পেয়ে বসে যাদের, তারাও একাকীই থাকতে চান। এতে বিষণ্ণতা বাড়বে বৈ সারে না।

তাই পরিবারের সাথে সময় কাটান, বন্ধু আত্মীয় পরিজনদের সুখ-দুঃখের সাথি হোন। মমতা দিন। একা নয়, থাকুন একসাথে। পরিবারের সাথে। সবচেয়ে বড় কথা, মানুষের সাথে। সবার সাথে। সবার পাশে। বিষণ্ণতা ধারেকাছে আসার সুযোগই পাবে না!

মেডিটেশন চর্চায় শিক্ষা-সাফল্য

আমিও পারি-এই বিশ্বাসই আমাকে দিল কোয়ান্টাম

জয়নাব বিনতে হোসেন

অনার্সে প্রথম সেমিস্টারে রেজাল্টের পর দেখা গেল ১০০ জনের পরে আমার স্থান। কারণ বিশ্ববিদ্যালয়ে আমাকে সঠিক দিক-নির্দেশনা দেয়ার কেউ ছিল না। পেরিয়ে আসা শিক্ষার্থী জীবনে কখনো ক্লাসে ১ম হই নি। তাই আমার পক্ষেও যে কখনো ১ম হওয়া সম্ভব, এই বিশ্বাসও আমার ভেতরে ছিল না।

এরপর হঠাৎ করেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত কোয়ান্টামের শিক্ষার্থী সেমিনারের খোঁজ পেলাম। অংশ নিতে শুরু করলাম নিয়মিত। ধীরে ধীরে আমার আত্মবিশ্বাস বাড়তে লাগল। সিদ্ধান্ত নিলাম কোর্স করার। কোর্সে মনোবি নিৰ্মাণ করলাম, ক্লাসে ১ম হবো। শুরু করলাম প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি, পরিশ্রম আর মেডিটেশন। এরপর ধারাবাহিকভাবেই ক্লাসে ১ম হতে লাগলাম। পাশাপাশি নিয়মিত অংশ নিয়েছি কোয়ান্টামের প্রোগ্রামগুলোতে। আর যখনই সুযোগ পেয়েছি কোয়ান্টামের হিসেবে কাজ করেছি।

বিশ্বাস করি, এরই ফলস্বরূপ অনার্সে আমি প্রথম শ্রেণিতে প্রথম হয়েছি। সম্প্রতি ভালো ফলাফলের জন্যে পেয়েছি ড. শহীদুল্লাহ জ্ঞানপীঠ পুরস্কার। প্রতি প্রতি কৃতজ্ঞতা যে, তিনি আমাকে কোয়ান্টামের সংস্পর্শে আসার সুযোগ দিয়েছেন।

[জয়নাব বিনতে হোসেন, মাস্টার্সের শিক্ষার্থী, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। ৩৭০ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]

মনোবি পূরণ হলো

জ্যাকি মার্মা

কোয়ান্টাম কসমো স্কুলে ভর্তি হওয়ার পরে প্রথমদিকে আমার রেজাল্ট খুব একটা ভালো ছিল না। এমনকি চতুর্থ শ্রেণিতে থাকতে পরীক্ষায় ফেলও করলাম। ফলে আরো একবছর একই ক্লাসে পড়তে হলো।

ষষ্ঠ শ্রেণিতে পড়ার সময় কোয়ান্টাম মেথড কোর্সে অংশ নিলাম। কোর্সে এসে আমার আত্মবিশ্বাস অনেক বেড়ে গেল। এরপর লেখাপড়ার প্রতি মনোযোগ ও আগ্রহ ফিরে পেলাম নতুন করে। রেজাল্টও বেশ ভালো হতে শুরু করল।

কিন্তু জেএসসি পরীক্ষায় জিপিএ এলো ৪.৮৬। ইংরেজিতে এ প্লাস পেলাম না। হতাশ না হয়ে সিদ্ধান্ত নিলাম, নিজের ভুলগুলো খুঁজি বের করব এবং পরবর্তী পরীক্ষার জন্যে পূর্ণ প্রস্তুতি গ্রহণ করব। প্রতিদিন মনোবিদ্যার মেডিটেশনে দেখতাম, এসএসসি পরীক্ষায় জিপিএ ৫ পেয়েছি। সাথে চলল রুটিন করে পড়ালেখা। সত্যিই এসএসসি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলো জিপিএ ৫ পেয়ে।

[জ্যাকি মার্মা, দ্বাদশ শ্রেণি, কোয়ান্টাম কসমো স্কুল ও কলেজ, বান্দরবান। ২৮৭ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]



সফল জীবনের অভিযাত্রায় জয়ী হওয়ার অফুরন্ত সম্ভাবনা রয়েছে প্রতিটি শিক্ষার্থীর মধ্যেই। কিন্তু পারিপার্শ্বিক নেতিবাচকতার বৃত্তে আটকে গিয়ে অধিকাংশই একসময় হয়ে পড়ে ব্যর্থ হতাশ লক্ষ্যহীন। উপযুক্ত মেধা যোগ্যতা সুযোগ থাকা সত্ত্বেও পৌঁছতে পারে না তাদের কাক্ষিত গন্তব্যে। আবার সমাজে একটি প্রচলিত ধারণা হলো, যে-কোনো উপায়ে পরীক্ষায় ভালো রেজাল্ট করতে হবে। কিন্তু ক্লাসে ১ম হওয়ার সুস্পষ্ট কারণগুলো তুলে ধরা ও প্রয়োজনীয় কৌশলসমূহ শেখানোর কোনো প্ল্যাটফর্ম যেমন থাকে না, তেমনি থাকে না একজন শিক্ষার্থীকে মানবিক গুণসম্পন্ন ভালো মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার কোনো সচেতন প্রয়াস।

আমরা বলতে পারি, সাফল্যের ব্যাপারে এই খণ্ডিত দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন এবং একজন শিক্ষার্থীকে মেধাসম্পন্ন কল্যাণকামী মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার কার্যকর পথ কোয়ান্টাম। এর পাশাপাশি শিক্ষায় সাফল্যের জন্যে মনোযোগ, অধ্যবসায় ও রুটিন করে পড়াশোনার সুত্রগুলো সহজ করে দেয় মেডিটেশন চর্চা। সেইসাথে সৎসঙ্কল্পের ইতিবাচক বলয়ে থাকার ফলে সে উপলব্ধি করতে পারে শিষ্টাচার, সততা ও নৈতিকতার গুরুত্ব।

গত ২৩ বছরে কোয়ান্টাম মেথড কোর্সে অংশ নিয়েছে স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া হাজারো শিক্ষার্থী। মেডিটেশন ও চিরায়ত সাফল্যসূত্রগুলো আন্তরিকভাবে চর্চা করে তারা হতাশা লক্ষ্যহীনতা সংকোচ জড়তা আসক্তি পরীক্ষাভীতি-এমনি নানা সমস্যাকে রূপান্তরিত করেছে নতুন সম্ভাবনায়। উপরন্তু, সঙ্গে একাত্মতা তাদের জীবনে সৃষ্টি করেছে জীবনে ১ম হওয়ার অনুপ্রেরণা। এরকমই কয়েকজন শিক্ষার্থীর অনুভূতি ও অভিজ্ঞতা নিয়ে এবারের আয়োজন।

অনার্স মাস্টার্স দুটোতেই ফাস্ট ক্লাস পেলাম

মো. জসীম উদ্দীন

এইচএসসি পরীক্ষার প্রথমদিন টেনশনে পরীক্ষা কেন্দ্রেই অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলাম। ডাক্তার সব দেখে শুনে আমার অভিভাবককে বললেন, 'এই ছেলের দ্বারা পড়ালেখা হবে না। অন্য কোনো কাজে লাগিয়ে দিন।'



এরপর থেকে ডাক্তারের দেয়া কড়া ঘুমের ওষুধ খেয়ে বেশিরভাগ সময় তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে থাকতাম।

কলেজ পেরিয়ে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির পরও পরীক্ষাভীতি কাটল না। অসুস্থ হয়ে পড়তাম পরীক্ষার আগে আগে। ফলে ছয়টি সেমিস্টারে ইমপ্রুভমেন্ট পরীক্ষা দিতে হয়েছিল। এরপর কোয়ান্টামের খোঁজ পেলাম।

কোর্সের তৃতীয় দিন নিরাময়ের মেডিটেশনের পর ঘুমের ওষুধগুলো ডাস্টবিনে ছুড়ে ফেলে দিলাম। নিয়মিত মেডিটেশন ও অটোসাজেশন চর্চার পাশাপাশি ফাউন্ডেশনের সাথে একাত্ম হতে শুরু করলাম ধীরে ধীরে।

যে আমি ছিলাম পরিবারের সবচেয়ে রোগা সদস্য, সেই আমিই এখন পুরোপুরি সুস্থ এবং পরিবারের আস্থাভাজন। শিক্ষার্থী প্রোগ্রামে শেখা টেকনিকগুলো অনুসরণ করে চমৎকার ফল পেলাম। অনার্স ও মাস্টার্স দুটোতেই ফাস্ট ক্লাস অর্জন করলাম। সেইসাথে বিসিএস-এর মতো তীব্র প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় প্রথমবার অংশ নিয়েই সাফল্যের সাথে চূড়ান্তভাবে শিক্ষা ক্যাডারে নির্বাচিত হতে পেরেছি। সঙ্কল্পের সাথে একাত্ম থাকতেই সম্ভব হয়েছে আমার এ অর্জন।

[মো. জসীম উদ্দীন। ৩৩১ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]

ভালো কাজ করার সাহস যুগিয়েছে কোয়ান্টাম

জান্নাতুল হাসিনা লিজা

একদিন ট্রেনে করে ঢাকা থেকে রা জ শা হী তে ফিরছিলাম। ট্রেনে সেদিন প্রচণ্ড ভিড়। যাত্রীদের অনেকেই দাঁড়িয়ে আছেন। আমি সিটে বসেই খেয়াল করলাম বেশ প্রবীণ একজন ভদ্রলোক সামনের সিটে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। যখন তিনি ক্লান্ত হয়ে পড়ছেন তখন সিটের হাতলে বসছেন। অথচ সেই সিটে বসা কয়েকজন তরুণ নির্বিকারভাবে বসেই আছে।

এদিকে আমার পাশে বসা আপু ব্যাপারটা কীভাবে নেবেন, এটা ভেবে ভদ্রলোককে আমার সিটও ছেড়ে দিতে পারছি না। অবশেষে আপুর অনুমতি নিয়ে সেই ভদ্রলোককে আমার সিটে বসতে বললাম। বেশ অনুরোধের পর তিনি বসলেন।

এরপর ঘটল অপ্রত্যাশিত ঘটনা। আধাঘন্টাও পেরোয় নি, পুরো কামরার পরিস্থিতি বদলে গেল। সামনের সিটের দুই তরুণ তাদের সিটে এক দম্পতিকে বসতে দিলেন। সামনে পেছনে আরো কয়েকজন তরুণ তাদের সিট ছেড়ে দিলেন প্রবীণদের, মহিলাদের বসার সুযোগ করে দিতে।

আমি উপলব্ধি করলাম, অন্যের জন্যে কল্যাণকর কাজে এগিয়ে যাওয়ার এই সাহস আমার ভেতরে জাগ্রত করেছে কোয়ান্টাম। এখানে এসেই আমি শিখেছি, শুধু ক্লাসে ভালো রেজাল্ট করাটাই শেষ কথা নয়, একজন শিক্ষার্থীকে একইসাথে ভালো মানুষও হতে হবে।

[জান্নাতুল হাসিনা লিজা, মাস্টার্সের শিক্ষার্থী, জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড বায়োটেকনোলজি, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়। ৩৩৩ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]

লক্ষ্যকে বড় করতে শিখিয়েছে মেডিটেশন

মোহাম্মদ জাহিন সৌভিক



পারিবারিক ও পারিপার্শ্বিক নানা কারণে প্রায় দুই বছর পড়াশোনা করতে পারি নি। এমনকি সমস্যাগুলো শেষার করব এরকম কাউকেও পাই নি। পড়াশোনা ছেড়ে দিতে হয় কিনা, এ ভয় আমাকে আচ্ছন্ন

করে ফেলে। সবকিছু অর্থহীন মনে হতো।

জীবনের এ পর্যায়ে এসে কোয়ান্টাম মেথড কোর্সে অংশ নিই। নতুন করে ভবিষ্যৎ নির্মাণের ব্যাপারে আশাবাদী হয়ে উঠি কোর্সের একেকটি আলোচনা শুনে। সেইসাথে বুঝতে পারি যে, পরীক্ষা নিয়ে আতঙ্কিত হওয়ার কিছু নেই। বরং প্রত্যেকের মেধা ও যোগ্যতা প্রমাণের সুযোগ করে দেয়ার জন্যেই এই পরীক্ষা।

পরবর্তীতে নিয়মিত মেডিটেশন করায় আমার মনোযোগ ও স্মৃতিশক্তি আগের চেয়ে বেড়েছে। রেজাল্টও হচ্ছে আশানুরূপ। এছাড়া বিতর্কসহ বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে পারছি আত্মবিশ্বাসের সাথে। সম্প্রতি মডেল ইউনাইটেড নেশনস্ নামে বড় একটা বিতর্কের আসরে ৬০ জন বক্তার মধ্যে শ্রেষ্ঠ বক্তা হিসেবে পুরস্কার পেয়েছি।

আমি বিশ্বাস করি, এ পর্যন্ত আমার জীবনে যতটুকুই সাফল্য এসেছে, কোয়ান্টামে না এলে সেটা ভাবতেই পারতাম না। আমার লক্ষ্যকে বড় করতে শিখিয়েছে কোয়ান্টাম।

[মোহাম্মদ জাহিন সৌভিক, শিক্ষার্থী, নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়। ৩৭৪ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]

গণিতভীতি দূর হলো

সামিয়া জাহান

গণিতে বরাবরই আমি খুব কম নম্বর পেতাম। এর একটা ই কারণ, তা হলো পরীক্ষাভীতি। গণিতের প্রশ্ন দেখে এত ঘাবড়ে যেতাম যে, প্রস্তুতি ভালো থাকলেও অঙ্ক মিলতে চাইত না এবং কখনো পুরো প্রশ্নের উত্তর করতে পারতাম না। এই সমস্যা নিয়ে সবসময় হতাশায় ভুগতাম।



ক্লাস নাহিনে পড়ার সময় কোয়ান্টাম মেথড কোর্সে অংশ নিলাম। শিখলাম কীভাবে সমস্যার মুখে হার না মেনে সমাধানের চেষ্টা করতে হয়।

কোর্সের মাস দুয়েক পর দ্বিতীয় সাময়িক পরীক্ষা হলো। দেখলাম, গণিত পরীক্ষার দিন আমার আর ভয় লাগছে না। প্রশ্নপত্র জটিল হলেও প্রতিটি অঙ্ক সঠিকভাবে মেলাতে পারলাম এবং পুরো প্রশ্নের উত্তরও লিখতে পারলাম। সেই পরীক্ষায় আমার ক্লাসের চারটি শাখা মিলিয়ে গণিতে সর্বোচ্চ নম্বর পেলাম আমি।

[সামিয়া জাহান, শিক্ষার্থী। ৩০০ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]

চেষ্টা করি মেডিটেশন দিয়ে দিন শুরু করতে

সারাফ মাহনাজ

মেডিটেশন শেখার আগে আমার স্বপ্নগুলো ছিল সীমাবদ্ধ। বড় কিছু করার সামর্থ্য যে আমার ভেতরেও আছে, তা কোয়ান্টামে আসার আগে কখনোই উপলব্ধি করতে পারি নি।

আগে পড়াশোনা নিয়ে খুব দৃষ্টিহীন হতো, ফলে কোনো কাজই ঠিকমতো শেষ করতে পারতাম না। কোর্স করার পর থেকে প্রতিদিন সকালে মেডিটেশনে সারাদিনের কাজের ছক ঠিক করি, ফলে সবকিছুই সময়মতো করা অনেক সহজ হয়ে যায়।

স্কুলজীবনে নিয়মিত বিতর্ক প্রতিযোগিতায় অংশ নিতাম, তরুণ সবার সামনে কথা বলতে ভয় কাজ করত। অথচ একদিন প্রতিযোগিতায় যাবার আগে ফাউন্ডেশনের একটা প্রোগ্রামে অংশ নেয়ার সুযোগ হলো। আমি অবাক হয়ে লক্ষ করলাম, আমার আত্মবিশ্বাস অনেক বেড়ে গেছে। খুব সহজেই ভালো যুক্তি মাথায় চলে এলো, সুন্দরভাবে

বিতর্ক শেষ করলাম এবং ১ম স্থান অর্জন করলাম।

এছাড়া বড় সাফল্য এসেছে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষায়। এসময় আত্মবিশ্বাস ধরে রেখে পড়াশোনা চালিয়ে যাওয়া কঠিন

হয়ে পড়ছিল আমার জন্যে। প্রতিদিন নিজেকে বলতাম, ‘আমাকে পারতে হবে।’ সেইসাথে মনোবল দেখতাম বুয়েটে ভর্তি হওয়ার পর কেমন অনুভূতি হবে, আমার মা-বাবা কতটা খুশি হবেন।

জীবনের কঠিন এই সময় সফলভাবে অতিক্রম করতে মনোবল মেডিটেশন আমাকে অনেক সাহস যুগিয়েছে। বুয়েটে ভর্তি হওয়ার পর উপলব্ধি করলাম, ভালোভাবে শেখার জন্যে আমাকে আরো পরিশ্রম করতে হবে। তাই প্রতিদিন চেষ্টা করি মেডিটেশন দিয়ে দিন শুরু করার।

[সারাফ মাহনাজ, ১ম বর্ষ, ইলেক্ট্রিক্যাল এন্ড ইলেক্ট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং, বুয়েট। ৩০০ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]



মা-বাবার প্রতি আমার শ্রদ্ধা-মমতা বেড়েছে

মুনতাসির রহমান

কোয়ান্টামে আসার আগে নিজের দেশ নিয়ে আমি খুব নেতিবাচক ভাব ভুগতাম। কোর্সে গুরুজীর আলোচনা শুনে বিশ্বাস করতে শুরু করলাম, আমাদের দেশের সম্ভাবনা অনেক।

এখন আমি নিজের দেশ নিয়ে প্রবলভাবে আশাবাদী।

আরেকটি বড় প্রাপ্তি হলো, মেডিটেশন চর্চা করে আমি মাইগ্রেন থেকে মুক্তি পেয়েছি। অথচ মাইগ্রেনের ব্যথার কারণে আমি একসময় পড়তে পারতাম না। মেডিকেল কলেজে চান্স পাওয়াটাও সম্ভব হয়েছে মেডিটেশনের জন্যেই। কারণ পড়াশোনার তীব্র চাপের মাঝেও আমাকে প্রশান্ত অবিচল থাকতে সাহায্য করে মেডিটেশন। তবে কোর্সের সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি পারিবারিক সুসম্পর্ক।

কোর্সে পারিবারিক মেডিটেশনে অনুভব করলাম, মা-বাবার স্নেহ-ভালবাসা সন্তানের জন্যে কতটা গুরুত্বপূর্ণ। কোর্সের পরে মা-বাবার প্রতি আমার শ্রদ্ধা-মমতা আরো বেড়েছে।

[মুনতাসির রহমান, ৫ম বর্ষ, চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ। ২৭৩ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]



সবার সাথে স্বতঃস্ফূর্তভাবে মিশতে পারি এখন

সাইফুল ইসলাম ইফতি

ক্লাস এইট-এ ওঠার পর প্রথমদিন স্কুলে গিয়ে দেখি ক্লাসের ছাত্ররা একে অপরের সাথে পরিচিত হচ্ছে, হাসিমুখে কথা বলছে। এক ছেলে হ্যান্ডশেক করার জন্য হাত বাড়িয়ে দিল। সে আমার বন্ধু হতে চায়।

কিন্তু আমি উত্তর দিলাম, ‘আমি কারো সাথে বন্ধুত্ব করি না।’ এতটাই আত্মকেন্দ্রিক ছিলাম আমি।

কোর্স করার পরে অনুভব করলাম, চারপাশের সবাইকে সাথে নিয়ে বাঁচতে পারলেই জীবনটা সুন্দর হয়। আরো বুঝতে পারলাম, এই আত্মকেন্দ্রিক মানসিকতাই হলো আমার সাফল্যের পথে বড় বাধা।

কোয়ান্টামের প্রোগ্রামগুলোতে দেখি, কোয়ান্টিয়াররা সবার সাথে আন্তরিকভাবে কথা বলেন, সবার সাথে খুব সহজেই মিশে যান। এটা দেখে আমার দীর্ঘদিনের জড়তা ভাঙতে শুরু করল। পড়ালেখার বাইরে অবসর সময়টুকুতে আমিও কোয়ান্টিয়ার হিসেবে কাজ করতে শুরু করলাম। এখন আমি সবার সাথে স্বতঃস্ফূর্তভাবে মিশতে পারি।

[সাইফুল ইসলাম ইফতি, ২য় বর্ষ, ঢাকা সিটি কলেজ। ৩৫১ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]



শুধু ভালো রেজাল্টধারী নয়, ভালো ছাত্র তিনিই—যিনি চৌকস, দক্ষ, নৈতিক ও মানবিক শক্তিতে উজ্জীবিত, আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু, অন্যদের ভরসাস্থল।

সহপাঠী মানেই বন্ধু নয়। সুসম্পর্ক থাকবে সবার সাথে। কিন্তু বন্ধুত্ব হবে তাদের সাথেই যাদের জীবন চেতনা ও লক্ষ্যের সাথে আপনার মিল রয়েছে।

গ্রাজুয়েটদের প্রশ্ন ? উত্তর দিচ্ছেন গুরুজী

প্রশ্ন : আমি বেশ মিশুক বলে মানুষের সাথে খুব সহজে বন্ধুত্ব ও ভালো সম্পর্ক হয়ে যায়। আত্মীয়স্বজন, পরিচিত ছোট ভাই, বড় ভাইয়েরা যে-কোনো বিপদে পড়লে আমাকে জানায় সাহায্য করার জন্যে। কাউকে ‘না’ বলতে পারি না। ফলে নিজের পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ করতে পারি না। এ অবস্থায় আমার মেডিটেশন, লেখাপড়া এবং নিত্যানৈমিত্তিক দক্ষতা বৃদ্ধির কাজগুলো ব্যাহত হচ্ছে। ছুটির দিনগুলোতে বেশির ভাগ সময় এসব নিয়ে ব্যস্ত থাকি, এমনকি ঈদের দিনও বাড়ি গিয়েছি সকালে। এভাবে চলতে চলতে নিজেকে দলছাড়া মনে হচ্ছে। মেডিটেশনে মনোযোগ দেয়া কঠিন হয়ে পড়ছে। মনে হচ্ছে প্রকৃতি আমাকে কম সাহায্য করছে। এ অবস্থায় কীভাবে আমি নিজেকে গুছিয়ে নিয়ে অনন্য মানুষ হওয়ার পথে এগিয়ে যেতে পারি?

উত্তর : এই যে ‘না’ বলতে পারি না—এটা তো খুব বিপজ্জনক। প্রয়োজনে ‘না’ বলতে পারাটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। অনেক বছর আগে একবার এক মেয়ে কাদতে কাদতে এসেছে আমার কাছে। জিজ্ঞেস করলাম, মা কী হয়েছে? বলল, ‘আপনি তো নেতিবাচক কথা বলতে নিষেধ করেছেন যে, ‘না’ বলা যাবে না। আমি তাই ‘হাঁ’ বলে দিয়েছি।’ ঘটনা হচ্ছে একজন তাকে প্রেমের প্রস্তাব দিয়েছে। যদিও সে ঐ ছেলেকে পছন্দ করে না, কিন্তু ‘না’ বলা যাবে না বলে সে ‘হাঁ’ বলে দিয়েছে। আমি তখন বললাম, মা, এই ক্ষেত্রে ‘না’ বলাটাই হচ্ছে ইতিবাচক।

এই যে অন্যের উপকার করতে করতে আপনার লেখাপড়া মেডিটেশনসহ সব রুটিন এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে, এটা তো ঠিক নয়। প্রয়োজনে সাহায্য করবেন, কিন্তু মাত্রাটা বুঝতে হবে। না হলে পরে একটা সময় আসবে যখন এই ছোট ভাই, বড় ভাইয়েরা আপনাকে তচ্ছিল্য করবে। আপনি নিজের যোগ্যতা ও দক্ষতার বিকাশ ঘটাতে পারেন নি বলে অবজ্ঞা করবে। সবসময় মনে রাখবেন, আপনি শিক্ষার্থী। আপনার জন্যে ফরজ কাজ হচ্ছে পড়াশোনা। অর্থাৎ যে সময়ের যে কাজ। এটা ঠিক রেখে আপনি যত পারেন উপকার করেন।

আপনার সামনে আসলে কোনো মনছবি নেই। আপনি শুধু ক্ষণিকের হাততালিতে মুগ্ধ হয়ে যাচ্ছেন। আর আপনার মতো এমন কাউকে দিয়ে কাজ করতে পারলে সবাই তেল দেয়, সবাই হাওয়া দেয় তার কার্যোদ্ধারের জন্যে। একসময় কাজ শেষ, দেখবেন হাওয়াও শেষ। তখন আফসোস করবেন। অতএব, সময় থাকতে সচেতন হোন। এমন কিছু করবেন না, যা আপনার পড়াশোনাকে নষ্ট করে, আপনার বিকাশের পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়, আপনার কাজের ক্ষতি করে। নিজের পরিচয় সৃষ্টি করাটা গুরুত্বপূর্ণ। আর নিয়মিত মেডিটেশন করুন। মেডিটেশন করতে না পারার জন্যে কোনো অভ্যুহাত দাঁড় করাবেন না।

প্রশ্ন : বিয়ের ক্ষেত্রে কোয়ান্টাম কী মনে করে—বিয়েটা কি ভাগ্য, নাকি মানুষ নিজেই নিয়ন্ত্রণ করতে পারে?

উত্তর : আসলে বিয়ের ক্ষেত্রে ভাগ্যের ওপরে নির্ভর করবেন না। কর্মের ওপরে নির্ভর করবেন। আপনার প্রস্তুতি প্রয়াস আর প্রচেষ্টার ওপর নির্ভর করবেন। যে-কোনো ব্যাপারে, যেমন : একটা ভালো চাকরি

পাওয়ার জন্যে আপনি চেষ্টা করেন, ভালো রেজাল্টের জন্যে চেষ্টা করেন, পরিশ্রম করেন। তাহলে বিয়ের জন্যেও তো আপনাকে চেষ্টা করতে হবে। আপনাকে একটা প্রোগ্রাম সেট করতে হবে। একটা পরিকল্পনা করতে হবে।

সবকিছুর জন্যে পরিকল্পনা করবেন আর বিয়েটাকে বলবেন ভাগ্য, তাহলে কীভাবে হবে? সমস্যা হলো, বিয়ের ব্যাপারে আমাদের কোনো পরিকল্পনা থাকে না, শুধু কল্পনা থাকে। এ ব্যাপারে আমরা শুধু কল্পনাই করি। তারপর কল্পনার সাথে গরমিল হলে ভাগ্যকে দোষারোপ করি।

তাই যারা বিয়ে করতে চান তাদের বিয়ের ব্যাপারটাও পরিকল্পনা করতে হবে যে, আমি কেমন জীবনসঙ্গী চাই, সেইসাথে নিজের যোগ্যতাটাও দেখতে হবে।

বিয়ের ব্যাপারে সবসময় বাস্তববাদী হবেন। কারণ, এই জায়গাটাতেই আমরা ভুল করি, বিয়ের ব্যাপারে অধিকাংশ মানুষের চিন্তাভাবনাই মোটামুটি বাস্তবতাবর্জিত। আর সবচেয়ে বড় অসুবিধাটা এখন হলো, টিভি সিরিয়াল দেখতে দেখতে আমাদের চিন্তাভাবনাও বায়বীয় হয়ে যাচ্ছে। আমরা মনে করি, জীবনটাও একটা টিভি সিরিয়াল। কিন্তু জীবনটা তো টিভি সিরিয়াল না। জীবন হচ্ছে লক্ষ্য, পরিকল্পনা এবং সেইভাবে কাজ—এই তিনের সমষ্টি।

বাস্তবতা হলো, বিয়েটা একটা প্রয়োজন। এই প্রয়োজন শারীরিক মানসিক পারিবারিক সামাজিক এবং আত্মিক। বিয়ে আর প্রেম এক বিষয় নয়। বিয়ে এবং প্রেমকে একাকার করে ফেলি বলোই আমরা ভুল করি। প্রেমিকা আর স্ত্রী এক নয়। তেমনি প্রেমিক আর স্বামীও এক নয়। প্রেমিক-প্রেমিকার কোনো দায়িত্ব নেই, শুধু রেস্টুরেন্টে ঘোরা ছাড়া।

কিন্তু বিয়ের পরে দায়িত্ব আছে। সকাল হলে নাশতার ব্যবস্থা কী হবে, এই দিয়ে দিন শুরু। স্বামী হলে তাকে নাশতার উপকরণ আনতে হবে। স্ত্রী হলে সেটি তৈরি করে পরিবেশন করতে হবে। তারপর আরো অন্যান্য দায়িত্ব তো আছেই।

এই বিষয়গুলো যখন বুঝবেন, অনুধাবন করবেন তখন দেখবেন যে, আর কোনো সমস্যা নেই। তখন আপনি বিয়েটাকে আর ভাগ্য মনে করবেন না। বিয়ের ব্যাপারে আপনার যথাযথ প্রস্তুতি থাকবে এবং আপনি সেভাবেই কাজ করতে পারবেন।

প্রশ্ন : প্রত্যেক প্রাণীকে জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করা হয়েছে। তবে কি আমার জীবনসঙ্গী আগে থেকেই নির্ধারিত? যদি তাই হয় থাকে তাহলে আমি খারাপ কাউকে পেলে আমার দোষ কোথায়?

উত্তর : আপনাকে তো কেউ দোষ দিচ্ছে না। আপনি খারাপ কাউকে পেলে যন্ত্রণা যা ভোগ করার তা তো আপনিই করবেন। আবার উল্টোটা ঘটলেও আপনিই সুখী হবেন। এখানে দোষ দেয়ার কিছু নেই।

আর প্রত্যেক প্রাণীকে জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করা হয়েছে মানে আপনাদেরকে স্বামী-স্ত্রী হিসেবে নির্ধারণ করে সৃষ্টি করা হয়েছে, তা নয়। এখানে জোড়া বলতে বোঝানো হয়েছে যে, বিপরীত এবং পরিপূরকরূপে সৃষ্টি করা হয়েছে। এটা ব্যাপক অর্থে। অর্থাৎ প্রত্যেক প্রাণীর মধ্যেই নারী-পুরুষ অর্থে। যেমন, বিদ্যুতের নেগেটিভ পোল ও পজিটিভ পোল, দুটো পোল যদি না থাকে তাহলে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হবে না। এই জোড়া মানেও তাই, স্বামী-স্ত্রী নয়।

প্রশ্ন : আমি কোর্স করার পর থেকে নিয়মিত মেডিটেশন করছি। কিন্তু আমার মা বলেন, এখনো আমার মেজাজ ঠান্ডা হয় নি। কী করব গুরুজী?

উত্তর : আপনার মাকে বলুন যে, মা, তুমি দোয়া করো যেন আমার মেজাজ ঠান্ডা হয়। আসলে এই ক্রোধ সংবরণ করাটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। সবসময় রাতে শোয়ার আগে সারাদিনের কার্যক্রমকে অবলোকন করবেন—সারাদিনে কি আপনি কারো সাথে রাগ করেছেন? দুর্ব্যবহার করেছেন? একবছর এভাবে আত্মপর্যালোচনা করুন। মেজাজ ঠান্ডা হয়ে যাবে। একবছর পরে দেখবেন, আপনার মা সার্টিফিকেট দিচ্ছেন যে, আমার সন্তান এখন আর রাগ করে না।

আসলে আপনার মেজাজ তো একদিনে গরম হয় নি। বছরের পর বছর ধরে গরম হয়েছে। এটা পুরোপুরি ঠান্ডা হতেও কিছু সময় লাগবে। কারো একমাসে ঠান্ডা হয়ে যায়, কারো ছয় মাসে, কারো—বা আবার নয় মাসে হয়। তাই আপনি সবসময় আত্মপর্যালোচনা করবেন, দেখবেন ঠিক হয়ে গেছে।

প্রশ্ন : আমার দুজন ভাই ও একজন বান্ধবী কোয়ান্টাম ল্যাবে গিয়েছিল রক্ত নিতে। ওরা রক্ত পায় নি। ওরা বলে, ‘তোমরা এত রক্ত দাও, কোয়ান্টাম কী করে? এগুলো কখন পাওয়া যায়?’ আমি কী উত্তর দেবো ওদের?

উত্তর : আপনার এখন কোনো উত্তর দেয়ার প্রয়োজন নেই। আগে একদিন কোয়ান্টাম ল্যাবে গিয়ে বসে থাকবেন সকাল থেকে রাত পর্যন্ত। তাহলেই যে যা প্রশ্ন করুক আপনি উত্তর দিতে পারবেন। সেইসাথে বুঝতে পারবেন রক্তের জন্যে রোগী এবং তার স্বজনদের আকুতিটা কেমন। তখন আপনার পরিচিত যারা এ বিষয়ে প্রশ্ন করে, তাদেরকেও আপনি রক্ত দিতে উদ্বুদ্ধ করতে পারবেন। বলতে পারবেন, এই রক্ত নিয়ে এইভাবে মানুষ বাঁচে।

ল্যাবে এলে আপনি দেখবেন, কতজন মানুষ রক্ত দিচ্ছে এবং কতজন রক্ত নিচ্ছে। রক্ত দিয়ে কী হচ্ছে তা—ও আপনি দেখতে পাবেন। কারণ এই রক্ত মুমূর্ষের প্রয়োজনে কাজে লাগানো ছাড়া আর কিছু করার উপায় নেই।

আমরা আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করি, কোয়ান্টাম ল্যাব সারা বছর দিনরাত ২৪ ঘণ্টা মানুষের জন্যে কাজ করে যাচ্ছে এবং পরম করুণাময়ের রহমতে এ পর্যন্ত সাত লাখের বেশি মুমূর্ষের প্রাণ বাঁচাতে আমরা সাহায্য করেছি।

প্রতিদিন গড়ে প্রায় তিনশ ইউনিট রক্ত ও রক্ত উপাদান আমরা সরবরাহ করি। তারপরও দেড়শ-দুশ মানুষ রক্ত না পেয়ে খালি হাতে ফেরত যায়। কারণ ওটুকুই এখন পর্যন্ত আমাদের সামর্থ্য।

আপনারা যদি আপনাদের বন্ধুবান্ধবদের ল্যাবে এসে রক্তদানে উদ্বুদ্ধ করতে পারেন, তাহলে কেউই রক্ত না পেয়ে ল্যাব থেকে ফিরে যাবে না।

এ মাসের অটোসাজেশন

যে নদী যত গভীর তার বয়ে
যাওয়ার শব্দ তত কম। আমি
কথার চেয়ে কাজ বেশি করব।

ফাউন্ডেশন সংবাদ

উচ্চতর বাচিক শিল্প কোর্সের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মা-জী

সংস্কৃতির মূল শিকড় হলো ভাষা

কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে শুরু হলো বাংলা বাচন পরিশীলন কর্মশালার দ্বিতীয় ধাপ-উচ্চতর বাচিক শিল্প কোর্স। ১২ সেপ্টেম্বর এ কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন শ্রদ্ধেয়া মা-জী মাদাম নাহার আল বোখারী।

উল্লেখ্য, এ পর্যন্ত বাংলা বাচন পরিশীলন কর্মশালার ২১টি ব্যাচ সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে। পরবর্তীতে আবৃত্তি ও ধারাবর্ণনায় আগ্রহী

গ্রাজুয়েট ও প্রো-মাস্টারদের মধ্যে থেকে দ্বিতীয় ধাপের জন্যে উত্তীর্ণ ৫৭ জনকে নিয়েই পরিচালিত হচ্ছে উচ্চতর বাচিক শিল্প কোর্স।

মা-জী বলেন, একটি জাতির অভিজাত্য ফুটে ওঠে তার সংস্কৃতির মধ্যে দিয়ে আর এই সংস্কৃতির মূল শিকড় হলো তার ভাষা। তাই এ কোর্সে অংশগ্রহণকারীরা বাংলা ভাষার সার্বিক প্রয়োগ ও শুদ্ধচর্চার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবেন বলে



আমরা বিশ্বাস করি।

কোয়ান্টাম মেডিটেশন হলে আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ফাউন্ডেশনের পরিচালক-সমন্বয় মিসেস সুরাইয়া রহমান। স্বাগত বক্তব্য দেন কোয়ান্টাম মিডিয়া সেলের আহ্বায়ক মোহাম্মদ মাহমুদজ্জামান ও আভা সেলের প্রধান দায়িত্বশীল মীর রফিকুল ইসলাম এবং কর্মশালার পরিচালক নাট্য ও বাচন প্রশিক্ষক মো. গোলাম সারোয়ার।

৪৪ তম জাতীয় স্কুল ও মাদ্রাসা ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় কোয়ান্টার

জাতীয় পর্যায়ে হ্যান্ডবলে রানার আপ
আঞ্চলিক পর্যায়ে কাবাডিতে রানার আপ

কোয়ান্টাদের হাতে পুরস্কার তুলে দিচ্ছেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী জনাব নুরুল ইসলাম নাহিদ

৪৪ তম গ্রীষ্মকালীন জাতীয় স্কুল ও মাদ্রাসা ক্রীড়া প্রতিযোগিতার জাতীয় পর্যায়ে হ্যান্ডবলে রানার আপ এবং আঞ্চলিক পর্যায়ে কাবাডি-তে রানার আপ হওয়ার গৌরব অর্জন করেছে কোয়ান্টাম কসমো স্কুলের শিক্ষার্থী কোয়ান্টারা।

হ্যান্ডবল ইভেন্টে থানা পর্যায় এবং জেলা পর্যায়ে উত্তীর্ণ হয়ে কোয়ান্টারা সুযোগ পায় উপ-আঞ্চলিক পর্যায়ে অংশ নেয়ার। এ পর্যায়ে ফাইনাল ম্যাচে নোয়াখালী আর কে নারায়ণপুর হাই স্কুলকে পরাজিত করে কোয়ান্টারা অংশ নেয় আঞ্চলিক পর্যায়ের খেলায়। কুমিল্লা উপ-অঞ্চল চ্যাম্পিয়ন কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্ট ইন্সপাহানী পাবলিক স্কুলকে ১২-৭

গোলে পরাজিত করে তৃতীয় বারের মতো আঞ্চলিক পর্যায়ে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে কোয়ান্টারা। জাতীয় পর্যায়ে চূড়ান্ত পর্বে তিনটি ম্যাচের দুটিতে জয়ী হয় এবং একটিতে পরাজিত হয় কোয়ান্টারা। এর মধ্য দিয়ে জাতীয় পর্যায়ে রানার আপ পুরস্কার অর্জন করে। চ্যাম্পিয়ন হয়েছে গোপালগঞ্জের মকসুদপুর মৌলভী আব্দুল হাই মেমোরিয়াল হাই স্কুল।

কাবাডি-তে জেলা পর্যায়ে ফাইনালে বান্দরবান সরকারি হাই স্কুলকে ৫২-২৬ পয়েন্টে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়

কোয়ান্টারা। উপ-আঞ্চলিক পর্যায়ে প্রথমে খাগড়াছড়িকে ও সেমিফাইনালে নোয়াখালীকে পরাজিত করে ফাইনালে উত্তীর্ণ হয় তারা। ফাইনালে চট্টগ্রামের শাহ ওয়ালিউল্লাহ হাই স্কুলকে ৮৭-৫৮ পয়েন্টে পরাজিত করে প্রথমবারের মতো উপ-আঞ্চলিক পর্যায়ে চ্যাম্পিয়ন হয় কোয়ান্টারা এবং আঞ্চলিক পর্বে খেলার যোগ্যতা অর্জন করে।

সিলেটে অনুষ্ঠিত আঞ্চলিক প্রতিযোগিতায় কোয়ান্টারা কুমিল্লা উপ-অঞ্চলের কাবাডি দলের বিপক্ষে ৬৭-৪২ পয়েন্টে জয়ী হয় এবং ফাইনালে মৌলভীবাজার হাই স্কুলের সাথে ৩৯-৫১ পয়েন্টে পরাজিত হয়ে রানার আপ হয়।

ধানমণ্ডি শাখার উদ্যোগে
বুলেটিন করসেবা

‘কোরবানির পশুর দাম প্রচার থেকে বিরত থাকুন’ এই আহ্বানকে ছড়িয়ে দিতে কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন ধানমণ্ডি শাখার উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয় বুলেটিন করসেবা। ১১ ও ১২ সেপ্টেম্বর দুই দিনব্যাপী এ করসেবায় ফাউন্ডেশনের প্রো-মাস্টার, গ্রাজুয়েট ও এসোসিয়েটদেরকে কোরবানির বিষয়ে সঠিক ধারণা প্রদান এবং কোরবানির পশুর দাম বলা ও শোনার ব্যাপারে ধর্মীয় তাৎপর্য তুলে ধরে কোয়ান্টামের দৃষ্টিভঙ্গি জানানো হয়। সেইসাথে এ-সংক্রান্ত দিক-নির্দেশনা সম্বলিত কোয়ান্টাম বুলেটিন সেপ্টেম্বর সংখ্যা ১০৫০ কপি বিতরণ করা হয়। এছাড়াও পরিচিত সবাইকে এ বিষয়ে সচেতন করতে কোয়ান্টাম সদস্যরা বুলেটিনের প্রথম পৃষ্ঠা ফটোকপি করে তাদের চারপাশে ৪০ ঘরে বিতরণ করেন।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে
শিক্ষার্থী ওয়ার্কশপ

৩০ আগস্ট রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় মেডিটেশন সোসাইটি-র উদ্যোগে ডীনস কমপ্লেক্স কনফারেন্স হল-এ অনুষ্ঠিত হয় বিশেষ শিক্ষার্থী ওয়ার্কশপ। ‘মেডিটেশন সাফল্যের নিশ্চিত পথ’ শীর্ষক ওয়ার্কশপে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ২২৩ জন শিক্ষার্থী উপস্থিত ছিলেন।

শিক্ষার্থী জীবনে মেডিটেশনের গুরুত্ব প্রসঙ্গে অনুষ্ঠানে আলোচনা করেন ফাউন্ডেশনের অর্গানাইজার ইঞ্জি. প্রাণজিৎ লাল শীল এবং আডেন্টিয়ার ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. আশিক মোসাদ্দেক। সমাপনী বক্তব্য দেন অধ্যাপক ড. মো. শহীদুল আলম।

আবশ্যিক

কোয়ান্টাম কসমো স্কুল ও কলেজের জন্যে শিক্ষক/শিক্ষিকা/আবাসিক শিক্ষক (ন্যূনতম অনার্স পাশ), বিজ্ঞান বিভাগের জন্যে (পদার্থ বিজ্ঞান, রসায়ন, জীব বিজ্ঞান, উচ্চতর গণিত) শিক্ষক/শিক্ষিকা আবশ্যিক। বিএড ও নিবন্ধনকৃত প্রার্থীরা অগ্রাধিকার পাবেন। শিশুকানন ও শিশুসদনের শিক্ষার্থীদের দেখাশোনার জন্যে ব্রাদার, সিস্টার (ন্যূনতম এসএসসি পাশ) ও সিকিউরিটি গার্ড আবশ্যিক।

এছাড়াও কোয়ান্টামম-এর জন্যে কিছু সংখ্যক মালি, মাঠকর্মী প্রয়োজন। আগ্রহীরা যোগাযোগ করুন :

কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন

৩১/ভি শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদীন সড়ক,
শান্তিনগর, ঢাকা-১২১৭
ফোন : ৯৩৪১৪৪১, ০১৭১৪-৯৭৪৩৩৩

মেডিটেশন ও সুস্থ জীবনাচার করোনারি রক্কেজ নিরাময় করে

রক্কেজের পরিমাণ
অনেক কমেছে!

সফিউল্যা

আট বছর আগে একদিন বুকে বেশ চাপ অনুভব করলাম। স্বাভাবিক হাঁটাচলাও কঠিন হয়ে পড়ল। এনজিওগ্রামে দেখা গেল, হার্টের একটি আর্টারিতে (এলসিএক্স) ৯৯% ও আরেকটিতে (এলএডি) ৭০% রক্কেজ। ডাক্তাররা দুটো আর্টারিতেই রিং পরানোর পরামর্শ দিয়েছিলেন। কিন্তু তা করাই নি।

এরপর থেকেই খাদ্যাভ্যাসের ব্যাপারে বেশ সতর্ক হয়ে গেলাম। একসময় কোয়ান্টাম হার্ট ক্লাবের সদস্য হই এবং নিয়মিত দমচর্চা ও বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে খাদ্যাভ্যাস নিয়ন্ত্রণসহ অন্যান্য বিষয়গুলো চর্চা শুরু করি।

দু-মাস আগে আবার এনজিওগ্রাম করাই। দেখা গেল, একটি রক্কেজের পরিমাণ ৯৯% থেকে ৩০-৪০% এবং অন্যটি কমে ৫০-৬০% হয়েছে! আগেরবার ডাক্তাররা দুটো রিং লাগানোর পরামর্শ দিয়েছিলেন; কিন্তু এবারের রিপোর্ট দেখে শুধু ওষুধ চালিয়ে যাওয়ার পরামর্শ দিলেন।

[সফিউল্যা, অবসরপ্রাপ্ত সরকারি চাকরিজীবী]

বেড়েছে আমার হার্টের কার্যক্ষমতা

মো. শফিউল্লাহ

২০১০ সালে এনজিওগ্রাম করে আমার হার্টের এলএডি আর্টারিতে দুটো রক্কেজ পাওয়া গেল। দুটোই ৯০%-এর বেশি। সাড়ে চার লক্ষ টাকা ব্যয়ে দুটো রিং লাগাতে হলো।

হাসপাতালে ১০ দিন কাটিয়ে বাড়ি ফেরার পর এক ধরনের আতঙ্ক আমাকে ঘিরে ধরল। মৃত্যুভয় পেয়ে বসল। এমনই এক দুঃসময়ে কোয়ান্টাম মেথড কোর্সে অংশ নিলাম। চার দিন পর আত্মপ্রত্যয় সৃষ্টি হলো। বিশ্বাস জন্মাল যে, আমি বাঁচব। এরপর হৃদরোগ প্রতিরোধ ও নিরাময় ওরিয়েন্টেশনে অংশ নিই। সেভাবেই মেডিটেশন, ব্যায়াম ও সঠিক খাদ্যাভ্যাস গড়ে তুললাম।

গত ২৪ জুলাই আবার হার্ট চেক-আপ করলাম। দেখা গেল, যে দুটো রক্কেজে রিং লাগানো হয়েছিল সেই আর্টারি দুটো এখন রোগমুক্ত। ডাক্তাররা জানানেন, আমি এখন সুস্থ।

আগে ইকোকার্ডিওগ্রাম পরীক্ষায় আমার হার্টের ইজেকশন-ফ্ল্যাকশন ছিল ৫৫%। সম্প্রতি দেখা গেছে, এটি এখন বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৭০%-এ। সার্বিকভাবে আমার হার্টের কার্যক্ষমতা বেড়েছে।

[মো. শফিউল্লাহ, ব্যবসায়ী]



সঠিক জীবনদৃষ্টি, মেডিটেশন ও সুস্থ জীবনাচার করোনারি হৃদরোগ প্রতিরোধ ও নিরাময় করে। চিকিৎসাবিজ্ঞানের এ আধুনিক ধারণার ওপর ভিত্তি করে যাত্রা শুরু করে কোয়ান্টাম হার্ট ক্লাব। মে ২০১০ থেকে এ পর্যন্ত ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে অনুষ্ঠিত হয়েছে হৃদরোগ প্রতিরোধ ও নিরাময় ওরিয়েন্টেশনের ৬০টি ব্যাচ, যেখানে অংশ নিয়েছেন দুই সহস্রাধিক মানুষ। তারা উদ্দীপিত হয়েছেন সুস্থতার সঠিক দৃষ্টিভঙ্গিতে-‘জীবন আমার, সুস্থতার দায়িত্বও আমার’। সেইসাথে বুঝতে সক্ষম হয়েছেন নিজ নিজ হৃদরোগের কারণ এবং উদ্যোগী হয়েছেন সুস্থ জীবনাচার অনুসরণে।

হার্ট ক্লাবের দিক-নির্দেশনাগুলো দৈনন্দিন জীবনে যারা আন্তরিকতার সাথে অনুসরণ করেছেন, এনজিওগ্রাস্টি ও বাইপাস সার্জারি ছাড়াই কমতে শুরু করেছে তাদের রক্কেজের পরিমাণ। এছাড়াও হার্ট ক্লাবে আসার আগেই যারা এনজিওগ্রাস্টি কিংবা বাইপাস সার্জারি করেছেন তারাও এড়াতে পেরেছেন পুনঃরক্কেজের আশঙ্কা। সাম্প্রতিক চেক-এনজিওগ্রাম রিপোর্টের ভিত্তিতে তাদেরই কয়েকজনের অনুভূতি এখানে দেয়া হলো-

ডাক্তার বললেন, কেন এসেছেন? আপনার হার্টে তো কোনো সমস্যা নেই

মো. গিয়াস উদ্দীন

২০০৮ সালে ঘটনাচক্রে আমার হার্টের অসুখ ধরা পড়ে। এনজিওগ্রাম করে ডাক্তার বললেন, হার্টে দুটো রক্কেজ রয়েছে। ৭৫% ও ৪০%। দুটোতেই রিং লাগাতে বললেন। অথচ পরে জেনেছি, ৪০% রক্কেজের ক্ষেত্রে রিং পরানোর কোনো প্রয়োজনই নেই।

যা-ই হোক, যেহেতু তখন কোনো প্রস্তুতি ছিল না, তাই আর রিং লাগাই নি। পরবর্তী প্রায় এক বছর ওষুধ খেলাম। কিন্তু কোনো উন্নতি হলো না। বরং হার্টের সমস্যা আরো বেড়ে গেল। এর মাঝে আবার উচ্চ রক্তচাপ ধরা পড়ল। সবমিলিয়ে বেশ উদ্বেগের মধ্যে দিন কাটছিল।

২০১১ সালে বিজ্ঞাপন দেখে কোয়ান্টাম হার্ট ক্লাবের ওরিয়েন্টেশনে অংশ নিলাম। হার্ট সুস্থ রাখতে হলে যে সুস্থ জীবনাচার প্রয়োজন, সে-সম্পর্কে সচেতন হলাম। সেইমতো অনুসরণও করতে শুরু করলাম। একবছরে প্রায় ১২ কেজি ওজন কমল। কোলেস্টেরলের পরিমাণ অনেক বেশি ছিল, সেটা স্বাভাবিক অবস্থায় নেমে এলো।

এবছর আবার এনজিওগ্রাম করলাম। রিপোর্ট দেখে ডাক্তার বললেন, ‘আপনার হার্টে তো কোনো রক্কেজ বা অন্য কোনো সমস্যা নেই। আপনি কেন এসেছেন?’ রিপোর্টে দেখা গেল, রক্কেজ ৭৫% থেকে কমে ৫০-৬০%-এ নেমে এসেছে আর ৪০% রক্কেজ ছিল যে আর্টারিতে, তাতে কোনো রক্কেজই নেই! হার্ট ক্লাবের নির্দেশনা অনুসরণ করে আমি পুরোপুরি সুস্থ। উচ্চ রক্তচাপের ওষুধও আর খেতে হয় না।

[মো. গিয়াস উদ্দীন, ব্যবসায়ী]

আমার হার্ট এখন সুস্থ

মো. আশরাফ আলী

স্বাস্থ্যের জন্যে ক্ষতিকর জেনেও তেলভাজা ও উচ্চ চর্বিযুক্ত গুরুপাক খাবারে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিলাম। খুব একটা শারীরিক পরিশ্রমও করা হতো না। এসব অনিয়মের প্রভাব টের পেলাম কিছুদিন পরেই।

ওজন বেড়ে ৯৫

কেজিতে দাঁড়াল। হঠাৎ একদিন বুকে ব্যথা অনুভব করলাম। তারপর চিকিৎসকের শরণাপন্ন হলাম। এনজিওগ্রাম করে ডাক্তার জানানেন, হার্টের এলসিএক্স আর্টারিতে একটি রক্কেজ রয়েছে, যার পরিমাণ ৯০%। সেটিতে রিং লাগানো হলো।

এর কিছুদিন পর আমার ছেলের কাছ থেকে শুনলাম কোয়ান্টাম হার্ট ক্লাবের কথা। হৃদরোগ প্রতিরোধ ও নিরাময় ওরিয়েন্টেশন-এ অংশ নিলাম। হার্ট ক্লাবের দিক-নির্দেশনা অনুসারে জীবনযাপন করতে শুরু করলাম। প্রতিদিন ভোরে উঠে নামাজ পড়ে মেডিটেশন করি। এরপর ৩০ মিনিট হাঁটি ও ৩০ মিনিট ব্যায়াম করি। পরিবর্তন এসেছে খাদ্যাভ্যাসেও। সব ধরনের মাংস, ফাস্টফুড ও কোমল পানীয় পুরোপুরি বর্জন করেছি। প্রতিদিন বাদাম, স্পিরলিনা, টক দই ও দেশি ফল খাই। এর সুফলও অনুভব করছি প্রতিনিয়ত।

ওজন কমে এখন ৮৩ কেজিতে নেমে এসেছে। এনার্জি লেভেল আগের চেয়ে অনেক বেড়েছে। সিঁড়ি বেয়ে অনায়াসে ছয় তলায় উঠতে পারি। এই তিন বছরে হার্টের কোনো অসুবিধা আর হয় নি। গত ৮ জুলাই চেক-এনজিওগ্রাম করাই। চিকিৎসকরা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে জানানেন যে, আমার হার্টের এলসিএক্স আর্টারি এখন রোগমুক্ত এবং রিংয়ের আশেপাশে নতুন কোনো জটিলতাও তৈরি হয় নি।

[মো. আশরাফ আলী, সাবেক এম.ডি, বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্যাশিল্প কর্পোরেশন; সাবেক নির্বাহী পরিচালক, নাশা গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজ]

কোয়ান্টাম বুলেটিন : অক্টোবর ২০১৫ ॥ সম্পাদক : অধ্যাপিকা খাদিজা মাহতাব ॥ নাহার আল বোখারী, মহাপরিচালক, কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন কর্তৃক ৩১/ভি শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদীন সড়ক, শান্তিনগর, ঢাকা-১২১৭ থেকে প্রকাশিত ও উইন্ডোজ প্রিন্টিং সেন্টার থেকে মুদ্রিত ॥ **শুভেচ্ছা মূল্য - ৫ টাকা**
Phone : 9341441, 8319377, 9355756 Mobile : 01714-974333, 01711-671858, 09613-002025 ■ E-mail : bulletin@quantummethord.org.bd

স্বচ্ছ রক্তদান কার্যক্রম

একদিনে সর্বোচ্চ সরবরাহ ৪৩৭ ইউনিট

কোয়ান্টাম ল্যাব থেকে ২০ অক্টোবর সরবরাহ করা হয়েছে ৪৩৭ ইউনিট রক্ত ও রক্ত উপাদান। এ পর্যন্ত যা একদিনের সর্বোচ্চ সরবরাহ। এর আগে একদিনের সর্বোচ্চ সরবরাহ ছিল ৪০৯ ইউনিট রক্ত ও রক্ত উপাদান (২৩ ডিসেম্বর ২০১৪)।

কোয়ান্টাম স্বচ্ছ রক্তদান কার্যক্রমের সর্বস্তরের কর্মী ও দায়িত্বশীলদের অভিনন্দন জানিয়ে গুরুজী বলেন, ‘এটি নিঃসন্দেহে পরম করুণাময়ের অশেষ করুণা। আর এ কার্যক্রমের সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মী এবং সেইসাথে কোয়ান্টাম পরিবারের সবার অক্লান্ত পরিশ্রম ও পারস্পরিক সহযোগিতাপূর্ণ কর্মপ্রয়াসের ফলেই সম্ভব হয়েছে এ অর্জন।

সেইসাথে রক্তদাতারাও এতে ভূমিকা রেখেছেন সমানভাবে। তারা নিজেরা নিয়মিত রক্তদানের পাশাপাশি পরিচিত আত্মীয় বন্ধু সবাইকে উদ্বুদ্ধ করেছেন কোয়ান্টাম ল্যাবে এসে রক্তদানের জন্যে।’

উল্লেখ্য, ২০১৪ সালে সারা বছরে কোয়ান্টাম ল্যাব সরবরাহ করেছে ৯৭,০১৯ ইউনিট রক্ত ও রক্ত উপাদান। এবছর আরো বেশি সংখ্যক মুমূর্ষের জীবন বাঁচানোর লক্ষ্যে নিরলস কাজ করে যাচ্ছে কোয়ান্টাম ল্যাব।

চারপাশের মানুষকে রক্তদানে অগ্রহী ও সচেতন করে তুলতে বিতরণ করা হচ্ছে বিশেষ ব্রোশিওর। সারা বছর দিন-রাত ২৪ ঘণ্টা নিরাপদ রক্তের সেবাকে নিশ্চিত করার পাশাপাশি বিভিন্ন স্থানে আয়োজন করা হচ্ছে ব্লাড ক্যাম্প।

প্রো-মাস্টার্স ওয়ার্কশপ

শ্রদ্ধেয় গুরুজীর পরিচালনায় দুটি ব্যাচে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে প্রো-মাস্টার্স ওয়ার্কশপ। ২০ ও ২১ নভেম্বর (শুক্র ও শনিবার) অনুষ্ঠেয় ওয়ার্কশপে অংশগ্রহণ করতে পারবেন ২০ তম রিয়েলাইজেশন প্রোগ্রামের প্রো-মাস্টাররা। পরবর্তী ২৭ ও ২৮ নভেম্বর (শুক্র ও শনিবার) অনুষ্ঠেয় ওয়ার্কশপে অংশ নিতে পারবেন পায়োনিয়ার থেকে ১৯ তম ব্যাচের প্রো-মাস্টাররা।

স্থান : ইনস্টিটিউশন অব ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্স বাংলাদেশ (আইডিইবি) কাকরাইল, ঢাকা।

আসন সীমিত। দ্রুত কার্ড সংগ্রহ করুন।



কোয়ান্টাম বুলেটিন

নভেম্বর ২০১৫

রাজধানী আদর্শ বিদ্যাপীঠ

সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের দায়িত্ব নিল কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন



সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের প্রাথমিক বিদ্যালয় ঢাকার যাত্রাবাড়ীস্থ ‘রাজধানী আদর্শ বিদ্যাপীঠ’। ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের পরিচ্ছন্নতা কর্মীদের সন্তানরাই এ স্কুলের শিক্ষার্থী। সম্প্রতি স্কুলটির দায়িত্ব নিয়েছে কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন। বর্তমানে এ স্কুলের শিক্ষার্থী সংখ্যা ১৮৮ জন।

ঢাকা শহরের পরিচ্ছন্নতা কর্মীরা মূলত ভারতের তেলুগু-কানপুরী ভাষাভাষীদেরই উত্তরসূরি। বংশপরম্পরায় যারা এ শহরের আবর্জনা সাফ করার কাজ করে যাচ্ছে। যুগ যুগ ধরে অবহেলা বঞ্চনা দারিদ্র্য আর অবমাননার কষাঘাতে তারা বন্দি হয়ে পড়েছে মনোজাগতিক দাসত্বের আত্মবিশ্বাসী বৃত্তে। শৈশব থেকেই ওরা বিশ্বাস করতে শুরু করে-তাকেও একদিন বাবার সাথে ছুটে হবে পুঁতিগন্ধময় আবর্জনা সাফ করতে। কারণ, তার সামনে এমন কেউ থাকে না যাকে দেখে সে পায় বৃত্ত ভাঙার সাহস। উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত হতে পারে বড় কিছু করতে। পরিবার ও পারিপার্শ্বিক চাপে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সে বাধ্য হয় অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত লেখাপড়া করে পরিচ্ছন্নতাকর্মীর চাকরি যোগাড় করতে।

এই ছেলেমেয়েদের শিক্ষিত করে তোলার লক্ষ্যেই ১৯৮২ সালে ‘রাজধানী আদর্শ বিদ্যাপীঠ’ স্কুলটি প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষার একমাত্র সম্মল এ স্কুলটিও পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে গত বছর বন্ধ হয়ে যাবার উপক্রম হয়েছিল।

এ অবস্থায় স্কুল পরিচালনা কমিটির পক্ষ থেকে যোগাযোগ ও উৎসাহের প্রেক্ষিতে এখন থেকে এ স্কুলের শিক্ষার্থীদের নৈতিক শিক্ষা, পড়াশোনা-সংক্রান্ত সব ধরনের ব্যয় ও শিক্ষকদের বেতন-ভাতাসহ সার্বিক পরিচালনার দায়িত্ব পালন করবে ফাউন্ডেশন।

এ বছরের আগস্ট মাসে স্কুল পরিচালনা কমিটির পক্ষ থেকে সভাপতি প্রদীপ চন্দ্র দাস, সহ-সভাপতি সংকর দাস নাইডু ও প্রধান শিক্ষিকা মাহমুদা খানম কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশনের পরিচালক সমন্বয় মিসেস সুরাইয়া রহমানের কাছে স্কুল পরিচালনার দায়িত্ব হস্তান্তর করেন।

উল্লেখ্য, বান্দরবানের লামায় ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত কোয়ান্টাম কসমো স্কুল এন্ড কলেজে পড়াশোনা করছে আট শতাধিক শিশু-কিশোর।

১৩, ১৪, ১৫ ও ১৬ নভেম্বর

চার মাস পর ঢাকায় কোয়ান্টাম মেথড কোর্স ৩৯৭ ব্যাচ

চার মাস পর অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে কোয়ান্টাম মেথড কোর্স। ১৩, ১৪, ১৫ ও ১৬ নভেম্বর অনুষ্ঠিত হবে কোয়ান্টাম মেথড কোর্সের ৩৯৭ তম ব্যাচ। আধুনিক তথ্য-উপাত্ত-গবেষণার আলোকে জীবনযাপনের বিজ্ঞানকে আয়ত্ত করার এ এক অনন্য সুযোগ।

দীর্ঘ ২৩ বছরে কোয়ান্টাম মেডিটেশনের সাথে একাত্ম হয়েছেন নানা শ্রেণি-পেশার মানুষ। লাভ করেছেন সঠিক ও ইতিবাচক জীবনদৃষ্টি, আলোকিত জীবনের চিরায়ত দর্শন ও সাফল্যসূত্র। রোগকে পরিণত করেছেন সুস্থতায়, ব্যর্থতাকে সাফল্যে আর অশান্তিকে প্রশান্তিতে। বদলে গেছে লাখো জীবন।

উল্লেখ্য, এবছর ১২, ১৩, ১৪ ও ১৫ জুন ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয় ৩৯৬ তম ব্যাচ। পরবর্তী চার মাসে ফাউন্ডেশনে আত্ম উন্নয়নমূলক নানা ধরনের প্রোগ্রাম, ওরিয়েন্টেশন, ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠিত হলেও ঢাকা বা ঢাকার বাইরে কোনো কোর্স অনুষ্ঠিত হয় নি। তাই আসন্ন কোর্সকে ঘিরে নতুন উৎসাহ-উদ্দীপনায় সক্রিয় হয়ে উঠেছেন ফাউন্ডেশনের সদস্যরা।

৩৯৭ তম ব্যাচকে কেন্দ্র করে কোয়ান্টাম পরিবারের গ্রাজুয়েট, প্রো-মাস্টার, কোয়ান্টিয়ার, আর্ডেন্সিয়াররা নিয়মিত সংযোগায়ন করছেন তাদের পরিচিত, আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব, সহকর্মী ও প্রতিবেশীদের সাথে।

চারপাশের মানুষকে উদ্বুদ্ধ করছেন জীবন বদলের আলোকিত অভিযাত্রায় অংশ নিতে। সেইসাথে বিভিন্ন অফিস, মার্কেট, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আয়োজন করছেন কোয়ান্টাম সভা ও বৈঠক। বিতরণ করছেন কোর্স কার্ড, বুলেটিন ও অন্যান্য প্রকাশনা।

এর পাশাপাশি ফাউন্ডেশনের বিভিন্ন সেন্টার, শাখা, সেল, প্রি-সেলগুলোও উদ্যোগ নিয়েছে নানা ধরনের উদ্বুদ্ধায়ন কার্যক্রমের। সবমিলিয়ে কোয়ান্টাম মেথডের সাফল্যযাত্রায় ঘটে যাচ্ছে নিরাময় ও সাফল্যের আরেকটি মাইলফলক।

কোয়ান্টাম মেথড কোর্স

৩৯৮ তম ব্যাচ ১১ ঢাকা

১৮, ১৯, ২০ ও ২১ ডিসেম্বর
(শুক্র, শনি, রবি ও সোমবার)

স্থান : ইনস্টিটিউশন অব ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্স বাংলাদেশ (আইডিইবি) কাকরাইল, ঢাকা

অধ্যাপক ডা. আবদ হোসেন মোল্লা। দেশের বিশিষ্ট শিশু-চিকিৎসক ও ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের নিওন্যাটোলজি বিভাগের প্রধান। সম্প্রতি (২৩ জুলাই) মাগুরায় একটি রাজনৈতিক সহিংসতায় গুলিবিদ্ধ হন একজন মহিলা ও তার গর্ভস্থ শিশু। দেশজুড়ে আলোচিত এ শিশুটির চিকিৎসায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন তিনি। জন্মের দুদিন পর সংকটাপন্ন অবস্থায় শিশুটিকে ঢা.মে.ক হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। ১০ জন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সমন্বয়ে গঠিত মেডিকেল বোর্ডের চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করেন অধ্যাপক আবদ। উল্লেখ্য, তিনি কোয়ান্টাম মেথড কোর্সের ৩২৮ ব্যাচে অংশ নেন। গত ১৫ সেপ্টেম্বর এ বিষয়ে তার অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধি তিনি তুলে ধরেন সাপ্তাহিক আলোকায়ন কার্যক্রমের একটি বিশেষ সেশনে।

আত্মিক সুখের জন্যে অন্যের কল্যাণে কাজ করতে হবে

অধ্যাপক ডা. আবদ হোসেন মোল্লা

২৩ জুলাই মাগুরা সদর হাসপাতালে জরুরি অপারেশনের মধ্য দিয়ে জন্ম নেয় মাতৃগর্ভে গুলিবিদ্ধ এ শিশুটি। মাতৃগর্ভে ৪০ সপ্তাহ (ন্যূনতম ৩৭ সপ্তাহ) সময়কাল পার করলে আমরা তাকে ফুল-টার্ম বেবি বলে থাকি। কিন্তু এ শিশুটির গর্ভকালীন বয়স ছিল ৩২ সপ্তাহ। অর্থাৎ প্রি-ম্যাচিউর বেবি। স্বাভাবিকভাবেই তাই নানান জটিলতা দেখা দিয়েছিল। এছাড়াও গুলির জখম তো আছেই!

স্থানীয়ভাবে চিকিৎসকরা সর্বোচ্চ চেষ্টা করলেন শিশুটিকে বাঁচাতে, দুদিন বাদে পাঠিয়ে দিলেন ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে। আমাদের নিওন্যাটোলজি ইউনিটে ওকে ভর্তি করা হলো। গুলির ক্ষত সারাতে মোট ২১টি সেলাই পড়ল ওর ছোট্ট শরীরে।

এ ধকল সামলে ওঠার আগেই মারাত্মক জন্মসি দেখা দিল শিশুটির।

শরীরে পানি জমে গেছে, যেখানে হাত দেই দেবে যাচ্ছিল। এছাড়াও রক্তের প্লাটিলেট কমে যাচ্ছে, উপরন্তু হার্টে একটি ছিদ্র ধরা পড়ল এবং সেইসাথে অস্বাভাবিক হৃৎস্পন্দন। সবমিলিয়ে অবস্থা রীতিমতো সংকটাপন্ন। সাথে যুক্ত হয়েছে নানারকম চাপ-গণমাধ্যমের চাপ, মানুষের প্রত্যাশার চাপ ইত্যাদি।

অবশ্য এ সময়টাতে সবাই খুব সহযোগিতা করেছেন। ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের সংশ্লিষ্ট চিকিৎসক ও নার্সরা তো ছিলেনই, সাথে অন্যান্য হাসপাতালের বিভিন্ন বিষয়ের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকরাও আমাদের পাশে ছিলেন তাদের সাধ্যমতো।

সময়টা ছিল ভীষণ কঠিন। একে তো অপরিণত শিশু, ওজন স্বাভাবিকের চেয়ে অর্ধেক, তার ওপর একটার পর একটা সমস্যা প্রতিদিন দেখা দিচ্ছিল। আমরা সর্বোচ্চ চেষ্টা করে যাচ্ছিলাম। একদিন কোয়ান্টামের একজন অর্গানায়ারকে ফোনে বললাম, ‘গুরুজীকে বিষয়টা জানিও, দোয়া করতে বোলো।’ সে বলল, ‘স্যার, আমি জানাব গুরুজীকে। আর আপনি যেহেতু বাচ্চাটার দায়িত্ব নিয়েছেন, আপনি একটু বেশি করে দোয়া করবেন।’

এর মধ্যেই একদিন অবস্থা বেশ খারাপ হয়ে গেল। রাতে বাসায়ে গিয়েও দুশ্চিন্তায় ছটফট করছি। আমার স্ত্রী বললেন, ‘কী হয়েছে?’ কিছুটা হতাশার সুরেই বললাম, ‘বাচ্চাটার অবস্থা বিশেষ ভালো না, সকালে হাসপাতালে গিয়ে কী শুনতে হয় জানি না।’ উনি বললেন, ‘তুমি নামাজ পড়ো।’

নামাজ পড়ে গভীর আকুতি নিয়ে দোয়া করলাম। মনে হলো, আমরা আমাদের সর্বাঙ্গিক চেষ্টা করে যাচ্ছি, এখন সিদ্ধান্ত তাঁর হাতে। একটা শান্তি অনুভব করলাম দোয়ার পর। এমন একটি অনুভূতি হলো যেন আল্লাহ আমার দোয়া কবুল করেছেন!

আল্লাহর অশেষ রহমত, পরদিন থেকেই অবস্থার উন্নতি হতে শুরু করল।

সংকট কেটে গেল একসময়। অবশেষে ২০ আগস্ট আমরা শিশুটিকে মায়ের কোলে ফিরিয়ে দিতে পেরেছি। এটি আমাদের জন্যে আল্লাহর তরফ থেকে বিশেষ সাহায্য। এজন্যে সবসময় তাঁর কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি।

এ ঘটনাটি আমাকে এক অন্যরকম উপলব্ধিতে সিক্ত করেছে। কারো জন্যে আন্তরিকভাবে কিছু করা এবং মানুষকে দেয়ার মধ্য দিয়েই আমরা আসলে সত্যিকার সুখ ও আত্মিক পরিতৃপ্তি লাভ করি, যা অর্থবিশ্ব প্রশংসা যশ হাততালি কখনোই দিতে পারে না। আর এগুলো বেশি হলে বরং মানুষ বেহিসাবি হয়ে পড়ে। স্থলন ঘটে নানাভাবে।

আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ স্যারের একটা লেখা পড়েছিলাম। তিনি বলেছেন— ‘আমাদের দুই টাকা হলে আমরা চার টাকা চাই, চার টাকা পেলে আট টাকা, আট টাকা পেলে ১৬ টাকা ...। এভাবে আমাদের চাওয়াটা ক্রমান্বয়ে বাড়তেই থাকে। কোথায় এর শেষ আমরা নিজেরাই জানি না। আর এ নিদ্রাহীন চাওয়ার মধ্যেই অধিকাংশ মানুষের জীবন শেষ হয়ে যায়। সুখ আর মেলে না।

সুখী হওয়ার জন্যে তাই তিনি বলেছেন, তোমরা প্রত্যাখ্যান করতে শেখো। অর্থাৎ আমার বেঁচে থাকার জন্যে এর বেশি আর দরকার নেই। বেশি যা আছে সেটা দিয়ে দাও।’

কথাটা আমি নিজেও গভীরভাবে বিশ্বাস করি। এই যে কোয়ান্টামের উদ্যোগে এত ছেলেমেয়ে লামায় পড়াশোনা করছে, এ কাজটা তো গুরুজী ঢাকায়ও করতে পারতেন। কিন্তু করেন নি, কারণ তিনি প্রচার চান নি। দুর্গম পাহাড়ে যারা শিক্ষা ও ন্যূনতম সুযোগসুবিধা বঞ্চিত—তিনি চেয়েছেন তাদের জন্যে কাজ করতে। ওদের সন্তানদের গড়ে তুলতে। তিনি চেয়েছেন আত্মার সুখ—নিজের জন্যে, কোয়ান্টাম পরিবারের সবার জন্যে।

আত্মার এ সুখটা পায় বলেই একজন মানুষ পরার্থে কাজ করে, দিয়ে দিতে পারে তার প্রয়োজনের

অতিরিক্ত সবটুকু। আমাদের শ্রদ্ধেয় শিক্ষক জাতীয় অধ্যাপক ডা. এম আর খান স্যার তার পেনশনের পুরো অর্থই জনকল্যাণে ব্যয় করেছেন। হাসপাতাল নির্মাণ করেছেন তার জন্মস্থান সাতক্ষীরাতে। একদিন গেলাম তার কাছে।

স্যারকে বললাম, পরম করুণাময়ের ইচ্ছায় পেশাগত ও বৈষয়িক অনেক অর্জন আছে আমার জীবনে। এ সবকিছুই আমাকে বাহ্যিক সুখ দেয় সত্যি, কিন্তু একটা অন্তর্জ্বালা প্রায়ই ভেতরে কাজ করে—মানুষকে আসলে আমি কতটুকু দিতে পেরেছি?

স্যার বললেন, যে মাটিতে তুমি বেড়ে উঠেছ সে মাটির ঋণ শোধ করো। তোমার আয়ের শতকরা ২.৫ ভাগ যাকাত তো দিচ্ছ। আরো ২.৫ ভাগ সেবামূলক কাজে দান করো। আর প্রতি মাসে তোমার মোট কর্মঘণ্টার শতকরা ২.৫ ভাগ সময় ওখানে সেবামূলক কাজে ব্যয় করো।

স্যারের কথামতো আমি এটি অনুসরণ করছি এবং যশোরে নিজ গ্রামে শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও সামাজিক উন্নয়নে কাজ করছি। আসলে সুস্থ সুন্দরভাবে সমাজে বাস করতে চাইলে এ-কাজগুলো আমাদের সবাইকেই করতে হবে। কারণ, একা ভালো থাকা যায় না। সম্ভবও নয়।

ধরা যাক, আপনি ভালো ড্রাইভ করেন, কিন্তু ওপাশ থেকে যে আসছে সে যদি ভালো ড্রাইভার না হয় তাহলে তো দুর্ঘটনার আশঙ্কা থেকেই যায়। তাই তাকেও প্রয়োজনীয় শিক্ষা ও দক্ষতায় যোগ্য করে তুলতে হবে।

আর এজন্যে নিজেদের চাওয়া-পাওয়ার গণ্ডি ছেড়ে বাইরে আসতে হবে আমাদের। দাঁড়াতে হবে মানুষের পাশে। মানুষের প্রয়োজনের পাশে। এভাবে অন্যের কল্যাণে কাজ করার মধ্য দিয়েই মিলতে পারে আমাদের আত্মিক সুখ ও সত্যিকার পরিতৃপ্তি।

অনুলিখন : ডা. আতাউর রহমান

গুরুজীকে লেখা চিঠি

শ্রদ্ধেয় গুরুজী,

আসসালামু আলাইকুম।

কোয়ান্টাম মেথড কোর্স করে আমি পেশাগত অনেক সফলতা অর্জন করি। বুয়েট থেকে পাস করে ভালো চাকরি করছিলাম। কিন্তু আত্মিক শান্তি পাচ্ছিলাম না। কারণ আমার স্বপ্ন যে আরো বিস্তৃত। আমার স্বপ্ন এমন কিছু করার, যা আমাকে নিয়ে যাবে লাখো মানুষের কাছে। কিন্তু সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ঠিক করতে না পেরে প্রচণ্ড যন্ত্রণায় ভুগছিলাম।

তখন আমার মায়ের পরামর্শে লামা কোয়ান্টায়নে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিই। উদ্দেশ্য হলো আমার ভেতরের আমিকে খুঁজব, বুঝতে চেষ্টা করব আসলে আমি কী চাই। আজ থেকে ১০/২০/৩০ বছর পর আমি নিজেকে কোথায় দেখতে চাই।

কোয়ান্টায়নে গিয়ে (নভেম্বর ২০১৪) মনে হলো, আমি নিজেকে কিছুটা বুঝলাম। অনুতাপ অনুশোচনা আর ভালো কিছু করার তীব্র আকাঙ্ক্ষার অশ্রু মিশে একাকার হলো। কোয়ান্টায়ন থেকে ফিরে পুরো পৃথিবীটা আমার কাছে নতুন লাগছিল।

লামা কোয়ান্টায়নে আমি দুটো সূত্র পেলাম। প্রথমত, সফল না হওয়া পর্যন্ত আমি চেষ্টা করে যাব। কেউ আমাকে থামাতে পারবে না। দ্বিতীয়ত, আমি আর কোনোদিন হতাশ হবো না। হতাশা শব্দটি আমার জীবন থেকে বিদায় নিয়েছে। শূন্য-কে কীভাবে পূর্ণ করতে হয় তা এখন আমি জানি। ফলাফল দেয়ার মালিক একমাত্র স্রষ্টা। আমি শুধু আমার কাজ করে যাব। আমি তখন যেন এক অন্য মানুষ-দৃঢ়, আত্মপ্রত্যয়ী ও আশাবাদী।

চাকায় ফিরে ই-মেইল চেক করে দেখি আমার যোগাযোগের ভিত্তিতে জার্মানির একটি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একজন প্রফেসর ই-মেইল করেছেন। তিনি এক সপ্তাহের মধ্যে আমার ইন্টারভিউ নিতে চান। সেদিনই বুয়েটে ছুটলাম সার্টিফিকেট ও রিক্রুটমেন্ট লেটার যোগাড় করতে। ইতিপূর্বে কোনো প্রফেসরকে আমি এ ব্যাপারে রাজি করতে পারি নি। অথচ সেদিন কাকতালীয়ভাবে চার জন প্রফেসর আমাকে তৎক্ষণাৎ সুপারিশ করলেন!

এর পরের গল্পটা শুধু সামনে এগিয়ে যওয়ার। ইন্টারভিউ-এর দিন জার্মান প্রফেসর এত খুশি হলেন যে, সাথে সাথে আমার এডমিশন কনফার্ম করলেন। মাত্র তিন মাসে জার্মানির ভিসা পেয়ে গেলাম। শুধু তা-ই নয়, প্রফেসর নিজে আমার জন্যে স্টুডেন্ট ডরমিটরিতে সুপারিশ করলেন।

এ বছর মার্চের ১০ তারিখে আমি মিউনিখে পা রাখি। ওখানে পৌঁছে আমার প্রথম চিন্তা ছিল কীভাবে মাটির ব্যাংক বানাব। ছোটবেলা থেকেই আমার মা আমাদের দুই ভাইবোনকে দানে উদ্বুদ্ধ করতেন। দেশে প্রতিদিন অফিসে যাবার আগে মাটির ব্যাংকে টাকা রাখতাম। মাসের বেতনের একটি নির্দিষ্ট অংশ মাটির ব্যাংকে দান করতাম। জার্মানিতে এসে হাড়ি-পাতিল কেনার আগে তাই একটা সুন্দর কাচের বয়াম জোগাড় করি। প্রথম ইউরো রাখি আমি আমার মাটির ব্যাংকে। প্রচণ্ড আনন্দ হয় মনে-আল্লাহ আমাকে অশেষ সৌভাগ্য দান করেছেন!

মনোযোগ দিয়ে লেখাপড়ার পাশাপাশি স্টুডেন্ট জব খুঁজতে শুরু করি। কারণ বাবা-মায়ের জন্যে খুব কষ্ট হতো। আমার বাবা বড় অঙ্কের টাকা ব্যয় করেছেন আমাকে জার্মানি পাঠানোর জন্যে। তাই কারো কথায় কান না দিয়ে নিজের প্রজ্ঞা ও বুদ্ধি দিয়ে নতুন কিছু পদক্ষেপ নিই। আশ্চর্যজনকভাবে জার্মানির বড় বড় কোম্পানি থেকে ইন্টারভিউ-এর ডাক পেতে থাকি। আমার আত্মবিশ্বাস এতে আরো বেড়ে যায়। কিছু জায়গা থেকে প্রত্যাখ্যাতও হয়েছি। কিন্তু আমি থেমে যাই নি। প্রতিকূলতার মাঝে লেখাপড়া ও চাকরির আবেদন চালিয়ে গেছি।

লামার শিশুদের কথা আমার সবসময় মনে পড়ে। পরিশ্রম করার স্পৃহা আরো বেড়ে যায় যখন ভাবি, নতুন বাচ্চাদের জন্যে একটা ভালো বিস্তিৎ দরকার। একদিন আল্লাহকে বললাম, আমি লামার শিশুদের জন্যে কিছু করতে চাই। ওদের জন্যে যা প্রয়োজন তা-ই আমার বেতন নির্ধারিত হোক। আমি প্রথম মাসের বেতন লামার শিশুদের জন্যে দিতে চাই। এর পর কিছু মজার ঘটনা ঘটতে শুরু করে।

বিশ্বখ্যাত প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান ইন্টেল থেকে

ইন্টারভিউ কল পাই।

সেদিনই ইন্টেল

রিসার্চ এন্ড

ডেভেলপমেন্ট

ডিপার্টমেন্টে আমি

রিসার্চ স্টুডেন্ট

হিসেবে কাজ করার

সুযোগ পাই। এক

বছরের কন্ট্রাক্ট দেয়া

হয়। জার্মানিতে

প্রথমেই এক বছরের

কন্ট্রাক্ট পাওয়া খুবই দুর্লভ ব্যাপার। কিন্তু আল্লাহ

আমার স্বপ্ন পূরণ করলেন-পৃথিবীর অন্যতম দক্ষ

গবেষক দলের সাথে কাজ করার সুযোগ পেলাম।

১ আগস্ট ইন্টেল-এ যোগদান করি। তার

আগের দিন সকালে ৩১ জুলাই আমাদের প্রথম

সেমিস্টারের রেজাল্ট প্রকাশিত হলো। মেধা

তালিকায় স্থান পেয়ে আমি সবার নজর কাড়তে

সক্ষম হলাম। দুইটা বিষয়ে আমি ১০০% মার্কস

পেয়েছি! ক্লাসে যারা বাংলাদেশকে চিনত না, তারা

বাংলাদেশকে চিনল।

গুরুজী, ইনশাল্লাহ আমি আমার প্রথম মাসের

বেতন ফাউন্ডেশনে পাঠাব। এই টাকা যদি লামার

শিশুদের কোনো কাজে লাগে আমি খুব খুশি হবো।

আমি এখনো সাধারণ একজন শিক্ষার্থী। আমার

বাবা-মাকে একটিবার হলেও ছবির মতো সুন্দর এই

জার্মানি ঘুরিয়ে দেখাতে চাই। এজন্যে অল্প অল্প করে

অর্থ সংগ্ৰহ করছি। দোয়া করবেন যেন আমার এ

আশাটা পূরণ হয়।

গুরুজী, আমি মনোযোগ দিয়ে আমার পড়ালেখা

এবং কাজ চালিয়ে যাচ্ছি। দোয়া করবেন স্রষ্টা যেন

আমার সহায় হন এবং কাজ দিয়ে, সাফল্য দিয়ে

আমি যেন আমার দেশকে সুপরিচিত করতে পারি।

—সানজিদা আফরিন

মাস্টার্স স্টুডেন্ট, ইউনিভার্সিটি অব অ্যাপ্লাইড সায়েন্স,

রোজেনহেইম, জার্মানি

৩৭২ ব্যাচের গ্রাজুয়েট



শ্রদ্ধেয় গুরুজী,

আসসালামু আলাইকুম। আশা করি ভালো আছেন। আমিও বেশ ভালো আছি।

আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের কাছে অশেষ শুকরিয়া প্রকাশ করছি। কারণ তিনি আপনার মাধ্যমে আল কোরআন বাংলা মর্মবাণী আমাদের হাতে তুলে দিয়েছেন। ফলে আমরা জ্ঞান অর্জনের পথে যাত্রা করার সুযোগ পেয়েছি এবং জীবনের ভুলভ্রান্তিগুলো ক্রমাগত চিহ্নিত করার মাধ্যমে আলোকিত হচ্ছি।

যত ব্যস্ততাই থাকুক কোরআনের মর্মবাণী আমি নিয়মিত পড়ি। মাস খানেক আগে মর্মবাণী পড়তে গিয়ে হঠাৎ দেনমোহর-সংক্রান্ত আয়াতগুলো (সূরা বাকারা : ২৩৬-২৩৭, সূরা নিসা : ৪, ২৪ ও ২৫) মনে খুব দাগ কাটে এবং নিজের ভেতরে এক ধরনের অস্থিরতা ও অনুশোচনা শুরু হয়।

কারণ বিয়ের সময় দেনমোহরের ব্যাপারে আমার বা আমার স্বামীর কোনো ধারণাই ছিল না। আমাদের বিয়ে হয়েছে প্রায় ১০ বছর হতে চলল এবং ২ লক্ষ ১ টাকা মোহরানা ধার্য করা হয়েছিল। যারা বিয়ে পড়ান তারাও দেনমোহর আদায়ের গুরুত্ব বিষয়ে কিছুই বলেন নি।

মর্মবাণী পড়ার পর আমি আমার স্বামীকে

আয়াতগুলো পড়ে শোনাই এবং বোঝাতে থাকি-যেহেতু তিনি দিতে সক্ষম, দীর্ঘদিন পর হলেও তার দেনমোহর আদায় করা উচিত। কারণ স্বয়ং স্রষ্টা নারী-পুরুষের সম্পর্কে বিয়ের মাধ্যমে বৈধ করেছেন এবং একে পবিত্র ও আইনসম্মত করার জন্যে দেনমোহর আদায় করাটাকে ফরজ করেছেন।

আমার স্বামী হেসে বিষয়টিকে পাশ কাটিয়ে যাচ্ছিলেন বার বার। তখন আমি তাকে বললাম, দেনমোহর জীবন কাছের স্বামীর এক ধরনের ঋণ এবং খুশিমনে অন্তর থেকে মাফ না করলে মাফ হয় না। তাছাড়া আমি যে ঘর-সংসার করছি, বাচ্চাদের মানুষ করছি এর জন্যে কোনো বেতন বোনাস ইনক্রিমেন্ট কিছুই তো পাই না। বিষয়টিকে ঋণ আদায় হিসেবে না দেখে অন্যভাবে দেখ। হয়তো এই কারণেও তুমি আত্মোত্তরে আটকা পড়ে যেতে পারো। মনে মনে ঠিক করলাম, এতদিন পর মাফ করার প্রশ্নই আসে না। তারপরও যদি অনুরোধ করে, অর্ধেক মাফ করে দেবো। বাকি অর্ধেকের ১০ ভাগের একভাগ ফাউন্ডেশনে দানের নিয়ত করলাম।

এর মধ্যে হঠাৎ করে আমার স্বামীর নামে তার অফিসে লাখখানেক টাকার একটা চেক জমা হয়। এর অল্প কিছুদিন পর আমাকে অবাক করে দিয়ে

মোহরানার সম্পূর্ণ টাকাটা তিনি আমাকে নগদ দিয়ে দেন। আর আমিও স্রষ্টার কাছে শুকরিয়া প্রকাশ করে দেনমোহরের টাকার চার ভাগের একভাগ ফাউন্ডেশনে দান করে দেই।

গুরুজী, আমাদের দেশে বিয়েতে অভিভাবকরা দেনমোহরের ব্যাপারে ছেলেদের কোনো জোর দেন না। একইভাবে কন্যাপক্ষের অভিভাবকরাও নিজেদের স্ট্যাটাস বজায় রাখার জন্যে বা অন্যদের কাছে বলে বেড়ানোর জন্যে পাত্রপক্ষের সাধ্যের অতিরিক্ত দেনমোহর ধার্য করেন। অথচ এটা আদায় করা নিয়ে কারো কোনো সচেতনতা নেই।

আমি ব্যক্তিগতভাবেই অনেক দম্পতিকে দেখেছি, যাদের বিয়ের ২০/২৫ বছর পার হলেও দেনমোহর শোধ হয় নি। শোধ করা যে জরুরি তা-ও তারা জানেন না। আবার অনেক স্ত্রী আহ্নে যারা স্বামীর চাপচাপিতে মুখে মাফ করেছেন কিন্তু অন্তর থেকে মাফ করেন নি, অন্তরে ক্ষোভ-কষ্ট পুষেই রেখেছেন।

গুরুজী, দোয়া করবেন যেন নিয়মিত মর্মবাণী পাঠ করার মধ্য দিয়ে সর্বোচ্চ উপকৃত ও আলোকিত হতে পারি এবং অন্যদেরও আলোকিত করতে পারি।

[নাম প্রকাশ করা হলো না]

গ্রাজুয়েটদের প্রশ্ন



প্রশ্ন : আমি বুয়েট থেকে ২০০৭ সালে পাশ করি। তার পর থেকেই প্রায় আট বছর টেলিকমিউনিকেশন খাতে একটা কোম্পানিতে কাজ করছি। এখন আমার পরিবারের সবাই চাচ্ছেন, আমি যেন উন্নত কোনো দেশে ইমিগ্রেশনের চেষ্টা করি। বিশেষ করে আমার বড় ভাই, যিনি তিন বছর যাবৎ কানাডায় আছেন। তিনি আমাকে প্রায় দেড় বছর ধরে বলছেন, কানাডাতে ইমিগ্রেশনের চেষ্টা করতে। আমি তার সাথে কোনো তর্কে না গিয়ে এড়িয়ে গিয়েছিলাম। কিন্তু এ ব্যাপারে কোনো উদ্যোগ নিই নি বলে তার সাথে আমার একরকম মনোমালিন্যও হয়েছে। আমার দুবোনও আমাকে বলছেন যেন আমি ভবিষ্যতের জন্যে অন্তত কিছু ব্যাক-আপ প্ল্যান রাখি।

এখন কথা হলো, আমি ফাউন্ডেশনের কাজ ও প্রোগ্রামে অংশগ্রহণের সুযোগ এবং একাত্মতার কথা চিন্তা করে এ ব্যাপারে মানসিক সায় পাচ্ছি না। কিন্তু তারা তাদের কথায় বেশ কিছু যুক্তি তুলে ধরছেন, যা আমি আপনাকে বিশদভাবে লিখছি—

প্রথমত, টেলিকমিউনিকেশন এখন একটা স্যাচুরেটেড খাত। খুব অল্প সময়ের মধ্যেই এই ইন্ডাস্ট্রির অধিকাংশ খাতেই ক্যারিয়ার উন্নয়নের সুযোগ একদমই কমে যাবে। এমনকি বড় বড় কোম্পানিগুলো অপারেটিং খরচ কমানোর জন্যে সুযোগসুবিধা হ্রাস করাসহ কর্মী ছাঁটাই ও অন্যান্য ব্যয় সংকোচনমূলক উদ্যোগ নেবে।

তাই এ ধরনের কোনো খাতই ক্যারিয়ারের জন্যে খুব সুবিধাজনক অবস্থায় থাকবে না। আমার বয়স ৩২ বছর, আমি যদি এখন সুযোগ তৈরি করে না রাখি এবং দু-তিন বছর পর গিয়ে যদি উপলব্ধি হয়, তখন আর ভালো দেশগুলোতে যাওয়ার সুযোগ থাকবে না।

দ্বিতীয়ত, ঢাকায় যে হারে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে নাগরিক সুযোগসুবিধা সেই হারে বাড়ছে না। এত ছোট একটা শহরে এত লোকের নাগরিক সুবিধার ব্যবস্থা করা স্বাভাবিক কারণেই সম্ভব হবে না। যেসব দেশে উন্নত নাগরিক সুযোগসুবিধা রয়েছে, সেখানে যদি যাওয়ার যোগ্যতা থাকার পরও না যাই, তাহলে সেটা নিরুদ্ভিতা ছাড়া আর কিছু না। আমার পরিবারের সবার যুক্তি অনেকটা এরকম যে, আমি খাওয়ার টাকা থাকার পরও ইচ্ছা করে না খেয়ে থাকছি। যখন উপলব্ধি হবে তখন দেরি হয়ে যাবে।

তৃতীয়ত, নিজের বিনিয়োগ নিয়ে সঠিকভাবে চিন্তা করাটাও স্মার্টনেস। তাই সঞ্চয়পত্র, জমি কেনা ও অন্যান্য বিনিয়োগের মতো করে হলেও ইমিগ্রেশনের ব্যবস্থা করে রাখার মধ্যে কোনো ক্ষতি নেই। আমাকে যা বিনিয়োগ করতে হচ্ছে, তা হলো ছয়-সাত লাখ টাকা এবং চার-পাঁচ বছর সময়। এরপর তো চাইলে আমি চলে আসতে পারি। তাহলে আমি কেন করব না?

চতুর্থত, যদি নিজের জন্যে যেতে না চাই, অন্তত সন্তানদের জন্যে হলেও যেন যাই। হয়তো এখনো কিছু নাগরিক সুবিধা পাচ্ছি কিন্তু সন্তানদের জন্যে তা-ও নিশ্চিত করতে পারব না। যেমন : খেলার মাঠ, ফরমালিন-মুক্ত খাবার, নির্ভেজাল দুধ, ভালো স্কুলে পড়ার সুযোগ, বিশ্বাস করার মতো চিকিৎসক, ভেজালহীন ওষুধ ইত্যাদি।

তাই আমার যদি যেতে ইচ্ছা না হয় তাহলে অন্তত চার/ পাঁচ বছর বিদেশে থেকে পাসপোর্টটা এনে সন্তানদের হাতে যেন দেই। তাদের জন্যে সঞ্চয় হিসেবে আমি এই সুযোগ যেন তৈরি করে রাখি। আমি নিজের ইচ্ছায় দেশে থেকেছি কিন্তু তারা চাইলে এটা ব্যবহার করতে পারে। বিদেশে যেতে পারে।

এই ইমিগ্রেশন নিয়ে তাদের কথার বিপক্ষে আমার নিজের কিছু যুক্তি রয়েছে। যেমন, আমি যেখানেই যাই, কেউ তো আমার জন্যে জব তৈরি করে রাখে নি। তাছাড়া আমি তো সেখানে প্রথম শ্রেণির নাগরিক নই। কিন্তু আমি একবার যদি চলে যাই তাহলে আর ফিরে আসা হবে না।

কারণ আরামবলয়ে একবার ঢুকে গেলে কেউ আর চ্যালেঞ্জ নিতে চায় না। সর্বোপরি আমি দেশে ফাউন্ডেশনের কাজের সাথে সংযুক্ত থাকতে পারি, প্রোগ্রামগুলোতে অংশগ্রহণ করতে পারি। এ আনন্দ তো ওখানে কোনোভাবেই পাব না।

আবার নিজের ভেতরে একটা ভিন্নমতও মাঝে মাঝে উঁকি দেয়। গত ১৪ মাস চাকরিসূত্রে আমি যখন দেশের বাইরে ছিলাম, তখন মাটির ব্যাংকে দানসহ ফাউন্ডেশনের বিভিন্ন সেবামূলক ক্ষেত্রে সাবলীলভাবে দান করতে পেরেছি। কিন্তু দেশে ফেরার পর এখনকার উপার্জিত অর্থে আমার পক্ষে ঐ পরিমাণ দান চালিয়ে যাওয়া যথেষ্ট কষ্টসাধ্য।

আমি যদি একটা ভালো বেতনে কাজ করি, তাহলে একদিক থেকে তো ফাউন্ডেশনের একটা উপকার হচ্ছে। কারণ শারীরিক পরিশ্রম করার সুযোগ অনেকের আছে। কিন্তু এতটা অর্থ উপার্জনের সুযোগ হয়তো সবার নেই। সক্ষে তো অর্থ ও পরিশ্রম দুটোরই দরকার আছে।

এই সমস্ত যুক্তি নিয়ে অবশ্য পরিবার-পরিজনদের সাথে আমি কোনো তর্কে যাই না। শুধু হাসি এবং এড়িয়ে যাই। কিন্তু আমি নিজের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিয়ে কিছু ঠিক করতে পারছি না। আগামী পাঁচ/ দশ বছর পর ঠিক কী কাজ করব, বুঝতে পারছি না। কোম্পানির অবস্থা যা দেখতে পাচ্ছি, তাতে আর দুবছরের বেশি এখানে ক্যারিয়ার নিয়ে বিশেষ প্রত্যাশা নেই।

অন্যদিকে প্রায় যেখানেই যাচ্ছি সবার মুখে একই কথা শুনে একটু কনফিউজড হয়ে গেছি। কারণ যারা বলছেন তাদের নির্দেশনা অনুসরণ করেই আমি পেশাগত জীবনে কিছুটা হলেও সাফল্য পেয়েছি। আর পরিবারের কথা নাই-বা বললাম।

উপরন্তু আমার বস আমাকে বলেছেন, আমার আট বছরের চাকরি জীবনে আমি যে কয়েকজন মানুষকে কিছুটা হলেও অনুসরণ করেছি, তাদের দিকে একটু তাকাতে যে, তারা এখন কে কী করছেন।

আমিও চিন্তা করে দেখলাম, তাদের একজন কানাডাতে ইমিগ্রেশন করেছেন, একজন আফ্রিকাতে কনসালটেন্ট হিসেবে কাজ করছেন, একজন নিজের কোম্পানি করেছেন, আরেকজন বাবার ব্যবসায় কাজ করছেন। বস আরো বললেন, অধিকাংশ মানুষই যখন কোনো একটা বিষয়ে একমত হয়, সেটা অধিকাংশ ক্ষেত্রে সঠিক সিদ্ধান্ত হয়। বাকিটা আমার ইচ্ছা।

গুরুজী, তাই সবকিছু চিন্তা করে কিছুটা অস্থির হয়ে আপনাকে লিখছি। আপনি সবসময় আমাদেরকে বলেন, একটা স্বপ্ন থাকতে হবে, একটা লক্ষ্য স্থির করতে হবে।

এ অবস্থায় একজন কোয়ান্টাম গ্রাজুয়েট হিসেবে আমার ঠিক কী দৃষ্টিভঙ্গি নেয়া উচিত এবং কীভাবে লক্ষ্য স্থির করতে হবে, সে ব্যাপারে আপনার দিক-নির্দেশনা আশা করছি। অনুগ্রহ করে আমার ভুলগুলো শুধরে দেবেন।

উত্তর : চমৎকার প্রশ্ন। অধিকাংশ তরুণ-তরুণী, মোটামুটিভাবে যাদের বয়স এখন ২৮-৩৫ অর্থাৎ যারা ক্যারিয়ারের প্রাথমিক পর্যায়ে আছেন, তাদের একটি সামগ্রিক চিত্র এ প্রশ্নের মধ্যে ফুটে উঠেছে। বিশেষত যারা বিভিন্ন মাল্টিন্যাশনাল প্রতিষ্ঠানে কাজ করছেন। প্রশ্নগুলো যতই জটিল মনে হোক, একটু চিন্তা করলেই কিন্তু উত্তরগুলো খুব সহজ।

প্রথমত, ব্যাংক থেকে শুরু করে মাল্টিন্যাশনাল প্রতিষ্ঠান যত আছে, তাদের লক্ষ্যই হচ্ছে একজন কর্মী তরুণ/ তরুণীকে নিয়োগ দেয়া এবং তাকে দুজনের বেতন দিয়ে চার জনের কাজ করানো। এ প্রতিষ্ঠানগুলো যতজন তরুণ-তরুণীকে নিয়োগ দেয়, তার একটা বড় অংশকে ১০ বছরের মধ্যে নানাভাবে ছাঁটাই করে ফেলে। বড়জোর ৫% কোনোভাবে টিকে যায়।

আবার ১০ বছর কাজ করার পর চাইলে যে একজন ওখান থেকে নিজেই বেরিয়ে আসবে তা-ও পারা যায় না। কারণ, তারা বেতন পাচ্ছেন দুজনের। অতএব তাদের জীবনযাত্রার ব্যয় একসময় এমন হয়ে যায় যে, ইচ্ছা করলেও তিনি আর সেটা কমাতে পারেন না। আর ততদিনে ঘাড়ো ব্যথা, কাঁধে ব্যথা, কোমরে ব্যথা, মাথাব্যথা এসব তো আছেই। সাথে আছে ফাইভ-স্টার হাসপাতালে এসব রোগের চিকিৎসা-ব্যয়।

আর মাল্টিন্যাশনাল প্রতিষ্ঠানগুলোও দেখে যে, মোটামুটি বছর দশেক কাজ করার পর সে যে পরিশ্রম করছে তা চার জনের পরিশ্রম আর হচ্ছে না। তাই কর্তৃপক্ষ আবার নতুন করে তাদেরই নিয়োগ দেয় যারা চার জনের পরিশ্রম করতে সক্ষম। পুরনোদের মধ্যে তখন টিকে থাকতে পারে কেবল তারাই, ওপর মহলের বড়কর্তাদের সাথে যোগাযোগটা যাদের ভালো। কিন্তু সবার পক্ষে তো সেটা সম্ভব হয় না, সবাই তা পারেও না।

দ্বিতীয়ত, বিদেশে যাওয়া বা ইমিগ্রেশন প্রসঙ্গ। আমাদের দেশের পদস্থ একজন সরকারি কর্মকর্তার কথা জানি, যিনি আমেরিকায় গেছেন অনেক বছর আগে। তখন আজকের মতো ডিভি লটারি ছিল না, কিন্তু এরকমই কিছু একটা মাইগ্রেশন প্রোগ্রাম ছিল। তো সেভাবে তিনি মনের আনন্দে চলে গেলেন আমেরিকাতে। তারপর চাকরি না পেয়ে ওখানকার একটি পেট্রোল পাম্প ফিলারের কাজ নিয়েছেন। আসলে আমরা এখন থেকে বিদেশটাকে স্বর্গ মনে করি। তারপর ওখানে গিয়ে যখন সব বুঝতে পারি ততদিনে আর দেশে ফেরার কোনো পথ থাকে না।

তৃতীয়ত, আপনি কী উদ্দেশ্যে বিদেশে যাবেন সেটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। যারা ওখানকার ভালো কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা/ গবেষণা/ শিক্ষকতা করার কিংবা ভালো কিছু করার যোগ্যতা নিয়ে যান সেটা আলাদা বিষয়।

কিন্তু যোগ্যতা ছাড়া ভালো কাজ পাওয়াটা খুব কঠিন। কারণ ওখানে প্রতিযোগিতা আরো বেশি। তাই অধিকাংশই ওসব দেশে গিয়ে অড জব করেন। তাই আপনি কী জন্যে যাবেন, কারণটা আপনার কাছে সুস্পষ্ট থাকতে হবে।

আর বিদেশে আপনি নিঃসন্দেহে দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিক। এ ব্যাপারে কোনো সংশয় রাখবেন না। আবার, আপনি যদি মানুষকে আলোকিত করার জন্যে কোথাও যান, সেখানে আপনাকে প্রথমে দ্বিতীয় শ্রেণির বলে গণ্য করবে। কিন্তু যখন প্রথম শ্রেণির



উত্তর দিচ্ছেন গুরুজী

লোকেরা আপনার দ্বারা আলোকিত হওয়া শুরু করবে, তখন আপনি ওদের চেয়েও বেশি সম্মানিত হবেন। কারণ গুণ ও জ্ঞানের কদর সর্বত্র।

চতুর্থত, আপনি বলেছেন, ১৪ মাস যখন দেশের বাইরে ছিলেন তখন আপনি সাবলীলভাবে দান করতে পেরেছেন, সে পরিমাণ দান এখন চালিয়ে যাওয়া কষ্টসাধ্য।

আবার এটাও সত্যি যে, আপনি বিদেশে থেকে একা অনেক দিচ্ছেন কিন্তু দেশে যিনি এতটা দিতে পারছেন না, তিনি হয়তো চারপাশের আরো ২০ জনকে দানে উদ্বুদ্ধ করছেন এবং আপনার চেয়ে বেশি দান সংগ্রহ করছেন। তিনি ২০ জনকে সৎকর্মে সম্পৃক্ত ও উদ্বুদ্ধ করলেন, এর গুরুত্ব কি কম? টাকাটা গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু তার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে মানুষ। শুধু টাকা দিয়ে কাজ হয় না, যদি মানুষ তৈরি না হয়।

টাকার চেয়ে মানুষ তৈরি হওয়াটাকে আমরা তাই বেশি গুরুত্বপূর্ণ মনে করি। ফাউন্ডেশনে অনেক অনুদান দেয়ার চেয়ে আপনি প্রতি মাসে হয়তো ১০ টাকা দান করলেন। কিন্তু আপনি যদি নিজেকে একজন আলোকিত মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে পারেন, তাহলে তার গুরুত্ব ও প্রভাব সার্বিকভাবে অনেক অনেক বেশি। স্রষ্টার কাছেও তখন আপনি আরো বেশি প্রিয় হবেন।

শুধু টাকা দিয়ে নিজেকে আলোকিত করা যায় না। অবশ্যই দানটা গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু দানের চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে চেতনার রঙে নিজেকে রাঙানো।

পঞ্চমত, সম্বয় হিসেবে আপনি সন্তানদের জন্যে বিদেশি পাসপোর্ট দিতে চান। কিন্তু বাস্তব চিত্রটা কী? বহু বাঙালি সন্তান যারা বিদেশে জন্মগ্রহণ করেছে বা শিশুকালে যারা বিদেশে পাড়ি জমাচ্ছে, অধিকাংশের কী অবস্থা? তাদের নিজেদের কোনো পরিচয় নেই। না আছে তার কোনো সাংস্কৃতিক পরিচয়, না আছে চেতনাগত পরিচয়।

মনে রাখবেন, আপনার সন্তানকে আলোকিত করার সবচেয়ে বড় নিশ্চয়তা আপনি। আপনি যদি আপনার সন্তানকে যোগ্য করে তুলতে চান তবে দেশে থেকেও তা সম্ভব। এমন উদাহরণ আমাদের চারপাশে অসংখ্য।

আর বিদেশে যারা যাচ্ছে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাদের ছেলেমেয়েরা অন্যান্য সুযোগসুবিধার চেয়ে সেখানকার বৈষয়িক আরামের সুযোগ গ্রহণ করছে, ফাস্টফুড খেয়ে মোটা হচ্ছে। সেখানকার ভালোগুলোর চেয়ে অপসংস্কৃতি যা আছে, সেটাই তারা গ্রহণ করে বেশি। আপনার সন্তানও যদি বিদেশি পাসপোর্ট নিয়ে ওই অপসংস্কৃতিতে হারিয়ে যায়, ড্রাগনে হারিয়ে যায়, তাহলে আপনি সন্তানের উপকার করলেন, না ক্ষতি করলেন?

আসলে এই ইমিগ্রেশন আর বিদেশি পাসপোর্ট মানেই আপনার সন্তানের জীবনের নিরাপত্তা বা নিশ্চয়তা নয়। কারণ, যোগ্য না হলে সে বিদেশে গিয়ে ডিশ ওয়াশ করবে। তাই সন্তানকে আলোকিত মানুষ করে গড়ে তোলার চেষ্টাই আপনার কর্তব্য, বিদেশি পাসপোর্ট দেয়া নয়। আর তার আগে প্রয়োজন নিজে আলোকিত হওয়া।

আপনি বলছেন, দেশে ফরমালিন-মুক্ত খাবার ও নির্ভেজাল দুধ নেই। বিদেশের খাবার নির্ভেজাল এটা মনে করার কোনো কারণ নেই। বরং ওখানকার ফুড ইন্ডাস্ট্রিগুলো এতই ক্ষমতাধর যে, তাদের উৎপাদিত

ও বাজারজাতকৃত খাবারে ভেজাল যে ধরতে যাবে, তার বিপদ আছে। কারণ খাদ্য ব্যবসায়ীরা ওখানে অনেক বেশি প্রতাপশালী এবং তাদের খাদ্যে ভেজাল আরো সুস্বাদু, আরো জটিল, আরো ব্যাপক।

তাই ফরমালিন-মুক্ত খাবার, নির্ভেজাল দুধ আর বিশ্বাস করার মতো চিকিৎসক ও ভেজালহীন ওষুধ-এসব বিষয়ে আমরা বিদেশ সম্পর্কে যা ভাবি তা পুরোপুরি সত্য নয়। অন্য দেশের কথা বাদ দিন, খোদ আমেরিকাতে মৃত্যুর তৃতীয় কারণ হচ্ছে ডাক্তার ও ভুল চিকিৎসা।

এটা আমার কথা না, জার্নাল অব আমেরিকান মেডিকেল এসোসিয়েশন-এ (২৮ জুলাই, ২০০০) প্রকাশিত একটি রিপোর্টে উল্লিখিত পরিসংখ্যান। যুক্তরাষ্ট্রের প্রবীণ চিকিৎসাবিজ্ঞানী ও জঙ্গ হপকিন্স মেডিকেল স্কুলের জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ ডা. বারবারা স্টারফিন্ড তার সুদীর্ঘ গবেষণার ফলাফল হিসেবে রিপোর্টটি প্রকাশ করেন। তাতে বলা হয়েছে, হৃদরোগ ও ক্যান্সারের পর যুক্তরাষ্ট্রে মৃত্যুর তৃতীয় কারণ ডাক্তারদের ভুল ও অপ্রয়োজনীয় চিকিৎসা এবং প্রতিবছর গড়ে দুই লক্ষ ২৫ হাজার মানুষ শুধু এ কারণেই মৃত্যুর মুখোমুখি হয় ওখানে। যার মধ্যে ১২ হাজারই মারা যায় অপ্রয়োজনীয় সার্জারির কারণে।

সাম্প্রতিক পরিসংখ্যান আরো ভয়াবহ। ২০ নভেম্বর, ২০১৪-তে হাফিংটন পোস্ট-এ প্রকাশিত একটি চিকিৎসা নিবন্ধে ডিউক ইউনিভার্সিটির প্রফেসর ইমেরিটাস অ্যালেন ফ্রান্সিস জানিয়েছেন, এ সংখ্যা এখন বছরে চার লক্ষ ৪০ হাজার। তার মতে, 'এ-তো কেবল হাসপাতালে-ভর্তি রোগীদের পরিসংখ্যান, এর বাইরে হাসপাতালের বহির্বিভাগে চিকিৎসাপ্রাপ্ত রোগীদের কী দশা কে জানে!'

এই হলো 'বিশ্বাস করার মতো চিকিৎসকদের' অবস্থা! বিশ্বাস করার মতো চিকিৎসক যদি দু-চারজন থাকেন তবে আমাদের দেশেই আছে। পাঁচাতো বিশ্বাস করার মতো চিকিৎসক নেই, ওখানে প্রায় সবই চিকিৎসাব্যবসা। কোর্সেই তো আমরা বলি-শতকরা ৯৫টি সিজারিয়ান ওখানে হয় ক্লিনিকের বিল বাড়ানোর উদ্দেশ্যে। এটাও আমেরিকান মেডিকেল এসোসিয়েশনেরই গবেষণালব্ধ তথ্য।

হাঁ, ওখানে পণ্যের প্রাচুর্য আছে। কারণ পণ্যের উৎপাদন ওখানে অনেক বেশি। এবং প্রযুক্তি ওখানে অনেক অগ্রসর। কিন্তু প্রশান্তি কি আছে? যদি থাকত তাহলে এত অস্থিরতা কেন? এত মানসিক রোগী, এত চাঁদাবাজি কেন? নিউইয়র্কে কেউ দোকান করতে পারে না মাকিয়াদের পয়সা না দিয়ে।

ওখানে বিভিন্ন রাস্তা আছে, সেখানে পুলিশ বলেই দেয় যে, পাঁচ/দশ ডলার সাথে রাখতে, কারণ কোনো ডলার না পেলে সন্ত্রাসীরা ছুরি বসিয়ে দিতে পারে, আর ওই মামলা পুলিশ নেয় না। অতএব এ ভুল ধারণায় ভুগবেন না যে, ওখানে সবাই ভালো। সবকিছুতে ব্যবসাই হচ্ছে ওদের আসল কথা।

এখন কথা হলো, একজন গ্রাজুয়েট হিসেবে আপনি যদি কল্যাণমূলক কাজের সাথে জড়িত হতে পারেন, সেটাই আপনার জন্যে সবচেয়ে ভালো। আর বিদেশে স্থায়ী হলে পণ্যের যে বলয়, সোজা কথায় পণ্যদাসত্ব, তা থেকে বেরিয়ে আসা খুব কঠিন।

পণ্যের তো একটা জৌলুস আছে, সেটা আপনাকে কিছুদিন ভুলিয়ে রাখবে, তারপর যখন দেশে ফিরতে চাইবেন তখন ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও পারবেন না। কারণ, দেশে ফিরে কী করবেন, এ

অনিশ্চয়তাই আপনাকে সিদ্ধান্তহীন করে তুলবে।

আগেই বলেছি, যদি বিদেশে যান এই মিশন নিয়ে যে, আমি ওখানে গিয়ে ভালো উপার্জন করব, সেখানকার মানুষকে আলোকিত করার জন্যে কাজ করব-তাহলে ভিন্ন কথা। এটা একটা চ্যালেঞ্জ।

বিদেশে গিয়েও মানুষকে আলোকিত করার কাজ-এর চেয়ে সাহসী উদ্যোগ আর কিছু হতে পারে না। আর যে সত্যিকারের সেবা দেয় সে কখনো দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিক থাকে না। সে তখন প্রথম শ্রেণির নাগরিক হয়ে যায়।

আর সবচেয়ে বড় সেবা হচ্ছে, একজন মানুষকে আলোকিত করা। তার দৃষ্টিভঙ্গি বদলানো এবং চেতনার বিভ্রান্তি দূর করার চেষ্টা। এই সেবা যে দিতে পারবে, পৃথিবীর যেখানেই যাক সে সম্মানিত হবে। সেজন্যে আপনাকেও আলোকিত হতে হবে। চেতনাগত দিক থেকে এগিয়ে যেতে হবে। সঙ্গে একাত্ম হলেই কেবল তা সম্ভব। যেখানেই আপনি থাকুন না কেন, এ একাত্মতা চির অটুট থাকতে পারে যদি আপনি আন্তরিক হন।

আপনি যেহেতু মাল্টিন্যাশনাল প্রতিষ্ঠানে চাকরি করছেন, মনে রাখবেন, সর্বোচ্চ ১০ বছর। এর আগেই অর্থাৎ পাঁচ/সাত বছরের মাথায় যদি অন্য প্রতিষ্ঠানে চলে যেতে পারেন তাহলে খুব ভালো। চাকরি যারা করেন তারা যত প্রতিষ্ঠান বদলাতে পারবেন পেশাগত জীবনে তত ওপরে যেতে পারবেন। এক্ষেত্রে দৃষ্টিভঙ্গি হবে একটাই-'আমি আমার শ্রম বিক্রি করছি, যেখানে বেশি পয়সা ও সুযোগসুবিধা দেবে সেখানে কাজ করব।'

এ-তো গেল ক্যারিয়ারের একটা দিক। তবে এ ব্যাপারে আমার পরামর্শ হলো, যত ভালো প্রতিষ্ঠানই হোক চাকরি হলো চাকরিই। তাই যদি উদ্যোক্তা হতে পারেন সেটা সবচেয়ে ভালো। একজন উদ্যোক্তা হলে আপনার মেধা, শ্রম ও প্রজ্ঞার সর্বোচ্চ ব্যবহার করে আপনি বহুদূর যেতে পারবেন।

আর তা না হলে মিশনারি হবেন। মানুষের জন্যে কাজ করবেন। সেবা, সৎকর্ম ও মানুষকে আলোকিত করার কাজে আপনার পুরোটা সময় দেবেন। তাহলে প্রাকৃতিক নিয়মেই আপনি ভালো থাকবেন। অভাবমুক্ত থাকবেন। শারীরিক মানসিক দিক থেকে সুস্থ থাকবেন।

অতএব, এই সমস্ত দিক বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত নিন। কোনো ভুল বা অলীক ধারণার বশবর্তী না হয়ে জীবনের লক্ষ্য ঠিক করুন। সন্তানের নিরাপত্তা নিয়ে কখনো দৃষ্টিভ্রান্তি করবেন না। কারণ আমরা কেউই জানি না আগামীকাল আমাদের জীবনে আসবে কিনা। অতএব আমরা যতদিন বেঁচে থাকি যেন কল্যাণের পথে চলতে পারি এবং কখনো স্রোতে যেন গা ভাসিয়ে না দেই। যা সত্য বলে জানব, সবসময় সেই সত্যের সাথে যেন থাকতে পারি, যেখানেই আমরা থাকি না কেন।

এ মাসের অটোসাজেশন

শুধু ভোগবিলাসের জন্যে নয়,
মানুষকে কিছু দেয়ার জন্যে
আমি কাজ করব।
আমি অমর হবো।

নিয়মিত রক্তদানের অনুভূতি

দেড় দশক ধরে নিরাপদ রক্তের চাহিদা পূরণে নিরলস কাজ করে যাচ্ছে কোয়ান্টাম স্বাস্থ্য রক্তদান কার্যক্রম। রক্তদান ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে যেমন অশেষ পুণ্যের কাজ, তেমনি রক্তদাতার মনোদৈহিক সুস্থতার ক্ষেত্রেও এর রয়েছে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। দেশে মোট রক্তচাহিদার ১৬%-ই এখন মেটাচ্ছে কোয়ান্টাম। মুমূর্ষু মানুষের প্রাণ বাঁচাতে সারা বছর এখান থেকে দিন-রাত ২৪ ঘণ্টা সেবা নেয়ার সুযোগ রয়েছে সবার জন্যে। দুর্গত মানুষের কল্যাণে এ পর্যন্ত সরবরাহ করা সম্ভব হয়েছে সাত লক্ষ ১৫ হাজার ইউনিট রক্ত ও রক্ত উপাদান। আর এ রক্ত যারা দান করছেন তাদের নিয়ে গড়ে উঠেছে আড়াই লক্ষ রক্তদাতার একটি সমৃদ্ধ ডোনার পুল। এমনই কয়েকজন রক্তদাতা জানিয়েছেন তাদের অনুভূতি—

রক্তদান স্রষ্টার সেবা করার অনন্য প্ল্যাটফর্ম

তিমথী হালদার

রক্তদানের ব্যাপারে আমি তরুণ বয়স থেকেই উৎসাহী ছিলাম। তবে রক্তের গ্রুপ নেগেটিভ হওয়ায় কিছু সময়সায় পড়তে হতো। ব্লাড ল্যাবগুলো রক্ত নিতে চাইত না। নিয়মিত রক্তদান করার সৌভাগ্য হবে



কিনা এরকম একটা অনিশ্চয়তা ছিল। এর মাঝে কোয়ান্টাম ল্যাবের নাম শুনে যোগাযোগ করলাম। এখানকার কর্মীদের আন্তরিক ব্যবহার আমাকে মুগ্ধ করল। সেই ২০০১ সাল থেকে আজও নিয়মিত কোয়ান্টামে রক্তদান করছি।

রক্তদান করার পর ল্যাব থেকে পাঠানো রিপোর্ট আমার জন্যে এক বড় প্রাপ্তি। প্রাণঘাতী রোগের আক্রমণ থেকে নিরাপদ থাকার নিশ্চয়তা পাই এই রিপোর্ট দেখেই।

স্রষ্টার সেবা করার জন্যে একটি প্ল্যাটফর্ম লাগে। আমি মনে করি, কোয়ান্টাম ল্যাব হলো সেই প্ল্যাটফর্ম। আজ সারাদেশে সবাই জানে কোয়ান্টাম ল্যাবের রক্ত বিশুদ্ধ ও নিরাপদ। এই অর্জনের অংশ হতে পেরে আমি গর্বিত।

[তিমথী হালদার, জিএম, ফিন্যান্স এন্ড এডমিন, টিম ক্রাউলি বাংলাদেশ লিমিটেড]

পরিচিত সবাইকে রক্তদানে উদ্বুদ্ধ করি

মো. সাগর

রক্তদানের গুরুত্ব উপলব্ধি করার পর থেকে নিজে রক্ত দিচ্ছি ও আত্মীয় সহকর্মীদের রক্তদানে উদ্বুদ্ধ করছি। পরিচিত কাউকে রক্তদানের ব্যাপারে উৎসাহিত করতে গেলে তাদের প্রথম কথাই হয় ‘আমার তো ভাই রক্ত নাই’। তারপর যখন তাদের বুঝিয়ে বলি যে, তার এক ব্যাগ রক্তে বাঁচতে পারে চারটি প্রাণ, তখন তারা আগ্রহী হয়।



একবার একজনকে কোনোভাবেই রক্তদানে রাজি করতে পারলাম না। তবে ল্যাবে আসতে তিনি রাজি হলেন। ল্যাবের কর্মীদের আন্তরিক ব্যবহার ও পরিবেশ দেখে তিনি রক্ত দিলেন। তারপর থেকে খাবারে তার রুচি ও শারীরিক সুস্থতা বেড়েছে।

[মো. সাগর, ব্যবসায়ী]

আপনিও বাঁচাতে পারেন চারটি প্রাণ যদি—

- ◆ আপনার বয়স হয় ১৮ থেকে ৬০ বছর
- ◆ ওজন হয় কমপক্ষে ৪৫ কেজি
- ◆ শারীরিকভাবে যদি হন সুস্থ-সবল

১৬ বছর ধরে নিয়মিত রক্তদান করছি

অনিবার্ণ হক

ল্যাব প্রতিষ্ঠার আগের ঘটনা। ওয়ার্কশপে গুরুজী একটি গল্প বললেন— এক



দম্পতির দুই মেয়েই থ্যালাসেমিয়ায় আক্রান্ত। এক ঈদের আগের রাতে দুজনই অসুস্থ হয়ে পড়ল, দুজনকেই রক্ত দিতে হবে। বাবা-মা অনেক খোঁজাখুঁজি করে এক ব্যাগ রক্ত জোগাড় করতে পারলেন। কিন্তু কোন বাচ্চাকে দেবেন? বড় মেয়েটি তখন বলল, ‘বাবা, আমি বড়, আমি ব্যথা সহ্য করতে পারব। ও তো ছোট! রক্তটা ওকে দাও।’ ছোট মেয়েটিকে রক্ত দেয়া হলো। ঈদের দিন ভোরবেলা বড় মেয়েটি মারা গেল।

গল্পটি আমাকে এতটা আলোড়িত করল যে, তারপর থেকে এই ১৫-১৬ বছর ধরে নিয়মিত রক্তদান করছি। যদি এতে মানুষের কোনো উপকার হয় তবে কারো কাছেই কোনোরকম প্রতিদানের প্রত্যাশা নেই আমার। স্বাস্থ্য রক্তদান এমন এক সেবা যার প্রতিদান একমাত্র স্রষ্টাই দিতে পারেন।

[অনিবার্ণ হক, প্রকৌশলী]

রক্তদান করা প্রতিটি সুস্থ মানুষের দায়িত্ব

কৃত্তিকা আক্তার মোনালিসা

যখন একজন মানুষ শারীরিকভাবে সুস্থ-সবল থাকে, রক্তদান করা তার দায়িত্ব হয়ে দাঁড়ায়। আর্থিকভাবে যারা সচ্ছল তাদের সম্পদে যেমন অসচ্ছল মানুষের হক থাকে, আমি মনে করি, সুস্থ মানুষের রক্তে তেমনি অসুস্থ রোগগ্রস্ত মানুষের হক আছে। এই হক অবশ্যই পালন করতে হবে। যদি না করি, হয়তো অন্য কোনোভাবে সেই রক্ত দিতে হবে। তাই বয়স ১৮ হওয়ার পর থেকে আমি রক্ত দিচ্ছি। আমার বিশ্বাস এজেন্সি শারীরিকভাবে আমি সুস্থ আছি।



[কৃত্তিকা আক্তার মোনালিসা, ফিল্যান্স মেক-আপ আর্টিস্ট]

আমার পরিবারের সবাই এখন রক্তদাতা

নাহার নিগার

প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর থেকে নিয়মিত রক্ত দেয়ার চেষ্টা করি। আমাকে রক্ত দিতে দেখে আমার দুই শিশুপুত্র বলত, ‘মা, আমরাও রক্ত দেবো।’ আমার জন্যে আনন্দের বিষয় হলো তারাও এখন রক্তদাতা।



কয়েক বছর আগের একটি ঘটনা রক্তদানে আমাকে বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করে। থ্যালাসেমিয়া-আক্রান্ত একটি শিশুর জন্যে রক্ত দেয়ার পর জানতে পারলাম, বেঁচে থাকার জন্যে প্রতি মাসে এই শিশুটির রক্তের প্রয়োজন হয়। তাই প্রতি মাসেই তাকে ল্যাবে এসে অপেক্ষা করতে হয় এক ব্যাগ রক্তের জন্যে। বিপন্ন মানুষের পাশে দাঁড়ানোর যে সুযোগ কোয়ান্টাম আমাদের করে দিয়েছে, সেজন্যে আমি কৃতজ্ঞ।

[নাহার নিগার, গৃহিণী]

যতদিন সুস্থ আছি রক্তদান করতে চাই

বিকাশ চন্দ্র রায়

রক্তদান যে কত বড় পুণ্যের কাজ তা বুঝলাম বছর কয়েক আগে। তখন ঢাকা শহরে সাক্ষ্য আইন জারি ছিল। হঠাৎ এক রাতে ল্যাব থেকে ফোন এলো— ক্যাসারে আক্রান্ত একটি শিশুর জন্যে জরুরি ভিত্তিতে রক্তের প্রয়োজন। যেহেতু আরেকজন মানুষের বিপদে সাহায্য করার নিয়তে যাচ্ছি, স্রষ্টার ওপর ভরসা করে রওনা হলো। অবাক হয়ে দেখলাম, পথে কেউ আটকাল না বা জিজ্ঞাসাবাদও করল না।



মুমূর্ষু মানুষের প্রাণরক্ষায় রক্তদান হলো সাত্বিক দান। যে দান দাতার হৃদয়ে অহম সৃষ্টি করে না। সনাতন ধর্মে এমন দানের ব্যাপারেই নির্দেশ দেয়া হয়েছে। যতদিন সুস্থ আছি, নিয়মিত যেন রক্তদান করতে পারি সেই প্রার্থনাই করি।

[বিকাশ চন্দ্র রায় (বাঙ্গি), বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে কর্মরত]

ডাক্তাররা বিস্মিত হলেন!

শাহীদা রহমান



হঠাৎ করে আমার স্বামী অসুস্থ হয়ে পড়লেন। হাসপাতালে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে ডাক্তাররা জানালেন, তার লিভারে সিস্ট হয়েছে। আরো বললেন, সিস্টের আকার দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে যা খুবই

আশঙ্কাজনক। অপারেশনের জন্যে তারা তিন মাস পর হাসপাতালে যেতে বললেন।

স্বামীর সুস্থতার নিয়তে আমি নিয়মিত মাটির ব্যাংকে দান করতে শুরু করলাম। লামা হিলিংয়েও নাম দিলাম। তিন মাস পর আবার টেস্ট করানো হলো। দেখা গেল সিস্টের আকার তো বাড়েই নি বরং ছোট হয়ে অর্ধেক হয়ে গেছে!

ডাক্তাররা বিস্মিত হয়ে গেলেন। তারা বললেন, 'সিস্টের আকার কমে গেল কীভাবে? এটা তো অপারেশন ছাড়া কোনোভাবেই সম্ভব না।' আমার বিশ্বাস, সৎ দানের ফলেই স্রষ্টা আমাদের এই উপহার দিলেন।

[শাহীদা রহমান, অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক। ৩২৯ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]

সুস্থ সন্তান লাভ করলাম

ডা. গাজী মো. সালাহুদ্দীন

আমার স্ত্রী সন্তানসম্ভবা হওয়ার পর ডাক্তাররা বললেন, মায়ের ডায়াবেটিস থাকায় সন্তানের সুগার লেভেল কম থাকতে পারে।

সুস্থ সন্তান লাভের নিয়তে আমি প্রতিদিন দান করতে থাকি।

স্রষ্টার রহমতে পুত্র সন্তান ভূমিষ্ঠ হলো। কিন্তু ডাক্তাররা জানালেন বাচ্চার দেহে গ্লুকোজ স্বাভাবিকের চেয়ে কম। তারা বেশ কিছু ওষুধ কিনতে দিলেন। তখন বেশ কষ্ট হচ্ছিল—আমার দান কি তবে বিফলে গেল? তিন দিন পর আবার টেস্ট করানো হলো। এবার ধরা পড়ল ক্লিনিকের গ্লুকোমিটার নষ্ট! বাচ্চা আসলে প্রথম দিন থেকেই সম্পূর্ণ সুস্থ ছিল।

[ডা. গাজী মো. সালাহুদ্দীন। ১৯২ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]



মাটির ব্যাংকে দানের সাফল্য

কোয়ান্টাম মাটির ব্যাংক কার্যক্রম নিরন্তর ও বঞ্চিত মানুষের সেবায় নিয়মিত দানের চমৎকার এক সুযোগ। গত দেড় যুগে দানের স্বতঃস্ফূর্ত কল্যাণধারায় হাজারো দাতা লাভ করেছেন বৈষয়িক সমৃদ্ধি ও আত্মিক প্রশান্তি। সৎদান স্রষ্টার পছন্দনীয় কাজ। এ বছর থেকে আমরা তাই দিন শুরু করেছি দানের মধ্য দিয়ে। পরম করণাময়ের করুণায় যা দাতার জীবনে নিশ্চিত করছে প্রশান্তি, রোগমুক্তি ও সাফল্য। তেমনই কয়েকজনের অনুভূতি এখানে তুলে ধরা হলো—

বিপদের বন্ধু মাটির ব্যাংক

এড. প্রিয়লাল সাহা

কিডনির সমস্যায় মা অসুস্থ হয়ে পড়লেন। আইসিইউ-তে ভর্তি করলাম। এক পর্যায়ে ডাক্তার বললেন, স্রষ্টার কাছে দোয়া করা ছাড়া আর পথ নেই।

তৎক্ষণাৎ সিদ্ধান্ত নিলাম, মা সুস্থ হলে ২০ হাজার টাকা মাটির ব্যাংকে দান করব। একটু পর সেই ডাক্তার এসে মা-কে ছয়টি ইঞ্জেকশন দিয়ে বললেন, 'যা করার করেছি, বাকিটা ওপরওয়ালার হাতে।' আধঘণ্টা পর মা ভালো বোধ করতে শুরু করলেন। সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরলেন আমার মা। মাটির ব্যাংক-কে এখন মনে হয় বিপদের বন্ধু।

[প্রিয়লাল সাহা, আইনজীবী। ১২৯ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]



হারানো ব্যাগ ফিরে ফেললাম

কামরুন্নাহার

ট্রেনে করে যাচ্ছিলাম। এক স্টেশনে ট্রেন থামলে দেখি আমার ব্যাগটি নেই। একটু পর ট্রেন ছেড়ে দিল। জানালা দিয়ে দেখি চোরেরা ব্যাগটি ফেলে দিয়ে চলে যাচ্ছে। ব্যাগ উদ্ধার করে দেখা গেল, কোনো জিনিসই তারা নেয় নি!

সফরের আগে নিরাপদ যাত্রার নিয়তে সবসময় মাটির ব্যাংকে দান করি। আমার বিশ্বাস, এজন্যেই আল্লাহর রহমতে ব্যাগটি অক্ষত ফিরে পেলাম।

[কামরুন্নাহার, গৃহিণী। ৩৭৫ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]



ডাক্তারের কাছে যাওয়ার আগে দান করি

দিলারা হোসেন

কিছুদিন আগে আমার ছেলের পেটে প্রচণ্ড ব্যথা হয়। বিশেষজ্ঞ ডাক্তার বললেন, সম্ভবত প্যানক্রিয়াসের ক্যান্সার। সাথে সাথেই মাটির ব্যাংকে দান করলাম। পরবর্তী টেস্টে নিশ্চিত হলো তেমন কিছু হয় নি।

দানের উপকার এর আগেও পেয়েছি। আমার স্বামীর ব্রেনে টিউমার আছে বলে ডাক্তাররা আশঙ্কা করছিলেন। তার নিরাময়ের নিয়তে মাটির ব্যাংকে ৩০ হাজার টাকা দান করলাম। এমআরআই করে দেখা গেল টিউমার আছে, তবে সেটা ব্রেনে নয় এবং তা নিরাময় সম্ভব।

যখনই ডাক্তারের কাছে যেতে হয়, মাটির ব্যাংকে দান করে তারপর যাই। দানের ব্যাপারে আত্মীয়স্বজনদেরও উদ্বুদ্ধ করি। আমি এ পর্যন্ত ২৫টি মাটির ব্যাংক বিতরণ করেছি।

[দিলারা হোসেন, গৃহিণী। ২৩২ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]



রিকশায় ককটেল পড়লেও আমি অক্ষত

সাকি মাহমুদ

গত বছর একদিন রিকশা করে কাজে যাচ্ছিলাম। তখন মাটির ব্যাংকে একবেলা দান করতাম। গুরুজীর নির্দেশ অনুযায়ী সেদিন দুই বেলা দান করেছিলাম। যা-হোক কিছুদূর এগোতেই

একটি ককটেল এসে পড়ল রিকশার কাছেই। ককটেলের আঘাতে চাকার অনেকগুলো স্পোক ছিঁড়ে গেল। কিন্তু আমি ও রিকশাচালক দুজনই সম্পূর্ণ অক্ষত ছিলাম! স্রষ্টার কাছে শুকরিয়া করলাম।

এ বছর হজে গিয়েও প্রতিদিন দান করেছি। এর সুফলও অনুভব করেছি প্রতিমুহূর্তে। ঘরের বাইরে থাকলেও নিয়মিত দান যেন মিস না হয় সেজন্যে মানিব্যাগের একটি পকেট মাটির ব্যাংকের জন্যে নির্দিষ্ট করেছি।

[সাকি মাহমুদ, বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর পদে কর্মরত। ১২৩ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]



বেঁচে গেলাম নিশ্চিত দুর্ঘটনা থেকে

মো. আল-আমীন

বিশ্ববিদ্যালয়ের হলে থাকি। একদিন মাঝরাত্তে ঘুম ভেঙে গেল। বেশ অস্থির লাগছিল। অস্থিরতা দূর করার জন্যে ভাবলাম মেডিটেশন করি। তাই বিছানা থেকে নেমে রুমের ফাঁকা একটা জায়গায় চলে গেলাম। মেডিটেশন শেষে চোখ মেলায় একটু পরেই সিলিং ফ্যানটা সশব্দে আমার বিছানার ওপর খুলে পড়ল। আমি যদি শুয়ে থাকতাম, ফ্যানটা পড়ত সোজা আমার মাথায়।

আরো একবার অনুভব করলাম স্রষ্টার দয়া ও

প্রতিশ্রুতি—‘দান অকল্যাণের ৭০টি দরজা বন্ধ করে।’ প্রতিদিন ভোরে ঘুম থেকে উঠে দান করি। ছুটিতে বাড়ি গেলে যে-কদিন ছুটি সে অনুযায়ী হিসাব করে আত্মাই মাটির ব্যাংকে টাকা রাখি।

[মো. আল-আমীন, শিক্ষার্থী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। ৩৩৪ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]



স্বৈচ্ছা রক্তদান ক্যাম্প মাসজুড়ে সংগ্রহ সহস্রাধিক ব্যাগ রক্ত



ঢাকা ইমপিরিয়াল কলেজে মোট সংগ্রহ ৩৪৪ ব্যাগ রক্ত

কোয়ান্টাম স্বৈচ্ছা রক্তদান কার্যক্রমের আয়োজনে অক্টোবর মাসজুড়ে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে বেশ কিছু ব্লাড ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয়। ১১ অক্টোবর ওয়ুথ প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠান এরিস্টোফার্মা লিমিটেড-এ একটি ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয়। ক্যাম্পটি উদ্বোধন করেন প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান এম এ হাসান এবং লায়স ক্লাব অব ইন্টারন্যাশনাল-এর গভর্নর স্বদেশ রঞ্জন সাহা। দিনব্যাপী এ ক্যাম্পে রক্তদান করেন প্রতিষ্ঠানের সর্বস্তরের ১৮১ জন কর্মী।

১৩ ও ১৪ অক্টোবর ব্লাড ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয় ঢাকার ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ (আইইউবি)-এর নিজস্ব ক্যাম্পাসে। এতে উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভিসি (ডেজিগনেট) প্রফেসর মিলান প্যাগোন এবং সিনিয়র ম্যানেজার



রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান চেকপয়েন্ট সিস্টেম বাংলাদেশ লি.-এ অনুষ্ঠিত ব্লাড ক্যাম্পে সংগৃহীত হয় ৫৬ ব্যাগ রক্ত

অধ্যক্ষ মো. ওয়ালি উল্লাহ। কলেজের শিক্ষকমণ্ডলী ও শিক্ষার্থীদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে দিনব্যাপী এ ব্লাড ক্যাম্প থেকে মোট সংগৃহীত হয় ৩৪৪ ব্যাগ রক্ত।

শারদীয় দুর্গোৎসব উপলক্ষে রাজধানীর দুটি মন্দিরে ব্লাড ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয়। ১২ অক্টোবর স্বামীবাগস্থ লোকনাথ ব্রহ্মচারী আশ্রম ও মন্দিরে অনুষ্ঠিত ক্যাম্পটি উদ্বোধন করেন মন্দিরের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি পঙ্কজ নাথ এমপি (বরিশাল-৪)।

পরবর্তীতে ২২ অক্টোবর ঢাকেশ্বরী মন্দিরে অনুষ্ঠিত হয় আরেকটি ব্লাড ক্যাম্প। প্রতি বছরের মতো এবারও ঢাকেশ্বরী মন্দির কর্তৃপক্ষ শারদীয় উৎসবে ব্লাড ক্যাম্প আয়োজনে সহযোগিতার জন্যে কোয়ান্টাম রক্তদান কার্যক্রমকে আমন্ত্রণ জানায়। সনাতন ধর্মাবলম্বীদের শারদীয় ধর্মীয় উৎসব উপলক্ষে আয়োজিত দুটি ক্যাম্পেই প্রচুর জনসমাগম ঘটে।

রক্তদান সম্পর্কিত নানা তথ্য জানতে ক্যাম্পে ভিড় করেন অগ্রহীরা।

২১ অক্টোবর আদমজী ইপিজেড-এ রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান চেকপয়েন্ট সিস্টেম বাংলাদেশ লি.-এর আয়োজনে অনুষ্ঠিত হয় আরেকটি ব্লাড ক্যাম্প। প্রতিষ্ঠানের এইচ আর ম্যানেজার আবু হাসনাত নিজে রক্তদানের মধ্য দিয়ে ক্যাম্পটি উদ্বোধন করেন। প্রতিষ্ঠানের সকল স্তরের কর্মীদের সহযোগিতায় ও

দুই দিনব্যাপী এ ক্যাম্পে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী ও শিক্ষক মিলিয়ে ১৮৬ জন রক্তদান করেন। এছাড়াও ২১ জন আজীবন রক্তদাতাকে (ন্যূনতম তিন বার রক্তদানকারী) বিশেষ ক্রেস্ট ও সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়।

ঢাকা ইমপিরিয়াল কলেজে ব্লাড ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয় ১৫ অক্টোবর। ক্যাম্পটি উদ্বোধন করেন লায়স ক্লাব অব ইন্টারন্যাশনাল-এর গভর্নর স্বদেশ রঞ্জন সাহা এবং কলেজের



ঢাকার স্বামীবাগে লোকনাথ ব্রহ্মচারী আশ্রম ও মন্দিরে অনুষ্ঠিত ব্লাড ক্যাম্প উদ্বোধন করেন পঙ্কজ নাথ এমপি

আন্তরিক অংশগ্রহণে ৫৬ ব্যাগ রক্ত সংগ্রহ করা হয় এ ক্যাম্প থেকে।

এছাড়াও অক্টোবর মাসজুড়ে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে আয়োজন করা হয় ব্লাড ক্যাম্প। ক্যাম্পগুলোতে রক্তদাতাদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে সংগৃহীত হয়েছে সহস্রাধিক ব্যাগ রক্ত।



আইইউবি-তে দুই দিনব্যাপী ব্লাড ক্যাম্পে ক্রেস্ট ও সার্টিফিকেট দেয়া হয় ২১ জন আজীবন রক্তদাতাকে



ওয়ুথ প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠান এরিস্টোফার্মা লিমিটেড-এ অনুষ্ঠিত ব্লাড ক্যাম্প থেকে সংগৃহীত হয় ১৮১ ব্যাগ রক্ত

আসুন দাতা হই দিন শুরু হোক দানে



সম্ভব দানে আলোকিত মানুষ হয়ে বেড়ে উঠছে এ শিশুরা

ভালো কাজ, কল্যাণকর কাজ নিয়মিত করাটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। যিনি নিয়মিত নামাজ পড়েন, তাকেই নামাজী বলা হয়; যিনি মাঝেমধ্যে নামাজ পড়েন, তাকে নয়। তেমনিভাবে দাতা তিনিই, যিনি নিয়মিত দান করেন। মহান স্রষ্টার কাছে দাতা হিসেবে পরিচিত হতে চাইলে দান করাকে প্রাত্যহিক জীবনচাচরে পরিণত করতে হবে।

আসলে ভালো কোনো কিছুকে জীবনের সার্বক্ষণিক সঙ্গী করে তুলতে পারলে তবেই তা থেকে পরিপূর্ণ বরকত আসে, সূচনা ঘটে প্রত্যাশিত পরিবর্তনের।

তাই আমরা দিন শুরু করব মাটির ব্যাংকে দান করার মধ্য দিয়ে। দানকে

করে নেব প্রাত্যহিক জীবনের সঙ্গী। আত্মীয়-বন্ধু-সহকর্মীদেরও উৎসাহিত করব নিয়মিত দানে।

দেড় যুগেরও বেশি সময় ধরে ফাউন্ডেশন এ দানের অর্থ ব্যয় করে আসছে বঞ্চিত, নিপীড়িত মানুষের সেবায়। এবছর লামার কোয়ান্টামমে পূর্বপ্রতিষ্ঠিত শিক্ষাকাননের প্রায় আট শ শিক্ষার্থীর পাশাপাশি শুরু হয়েছে নতুন শিক্ষাকাননের কার্যক্রম; যেখানে আলোকিত মানুষ হিসেবে গড়ে উঠছে ৬১টি অনাথ ও এতিম শিশু।

এছাড়াও কোয়ান্টাম শিশুসদনে উদারনৈতিক শিক্ষা ও সুস্থ সাংস্কৃতিক আবহে বেড়ে উঠছে অভিভাবকহীন ৭৫টি মেয়েশিশু।

এর পাশাপাশি সম্প্রতি ঢাকার পরিচ্ছন্নতা-কর্মীদের (তেলেগু কানপুরী বংশোদ্ভূত) সম্ভানদের স্কুল যাত্রাবাড়ীস্থ রাজধানী আদর্শ বিদ্যাপীঠ-এর শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার দায়িত্বও গ্রহণ করেছে ফাউন্ডেশন। উল্লেখ্য, ১৯৮২ সালে প্রতিষ্ঠিত এ স্কুলটি যথাযথ পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে বন্ধ হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিল।

শুধু তা-ই নয়, সম্মিলিত দানের অর্থে দেশের বিভিন্ন সেন্টার শাখা সেল প্রি-সেলের উদ্যোগে ফাউন্ডেশন পরিচালনা করছে নানা ধরনের সেবামূলক কার্যক্রম। যার মধ্যে চিকিৎসাসেবা, মাতৃমঙ্গল কার্যক্রমের আওতায় দরিদ্র প্রসূতিকে চিকিৎসা পরামর্শ ও পুষ্টি সেবা, দাফন ও সৎকার, খতনা, ত্রাণ কার্যক্রম এবং গৃহনির্মাণ ও স্বনির্ভরায়ন অন্যতম।

আমরা বলতে পারি, স্রষ্টা যেহেতু সবচেয়ে বড় দাতা, তিনি আমাদের সবাইকে অফুরান রিজিক বা জীবনোপকরণ দিয়ে লালনপালন করছেন, স্বাভাবিকভাবেই তিনিও একজন দাতাকেই পছন্দ করবেন। তাই স্রষ্টার পছন্দনীয় সংকর্মশীল বান্দ্যয় পরিণত হওয়ার জন্যে আমাদের দাতা হওয়ার বিকল্প নেই।

আসুন দাতা হই। দিন শুরু হোক দানে। পরম করুণাময়ের অনুগ্রহে আমাদের সবার জীবন পরিপূর্ণ হয়ে উঠুক নিয়মিত দানের বরকত ও অফুরান কল্যাণে।

বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি পরীক্ষা ২০১৫ কোয়ান্টাদের সাফল্য

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

কাইংপ্রা মুরং : গ ইউনিট ৫৫১ তম
লেংগি মুরং : ঘ ইউনিট ১৫৯ তম

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

লেংগি মুরং : কলা ও মানববিদ্যা
অনুষদে ৮ম, সমাজবিজ্ঞান অনুষদে
৭৩ তম।

মাংইয়াঙ মুরং ও পাসিং মুরং :
চারুকলা ইনস্টিটিউটে যথাক্রমে ১৯
ও ২৫ তম।

রিংইয়াঙ মুরং, মিল্টন বম, শরিফুল
ইসলাম ও সুনীল ত্রিপুরা :
ফিজিকেল এডুকেশন এন্ড স্পোর্টস
সায়েন্স বিভাগে চূড়ান্ত পরীক্ষায় ১ম,
২য়, ৩য় ও ৪র্থ স্থান।

ডিসেম্বর ২৫ ও ২৬

মিলাদুন্নবী (স) করসেবা

আগামী ২৪ ডিসেম্বর পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (স)। এ উপলক্ষে ২৫ ও ২৬ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত হবে মিলাদুন্নবী (স) করসেবা। এতে ফাউন্ডেশনের সকল স্তরের সদস্যরা অংশ নেবেন মাটির ব্যাংক সংগ্রহ ও বিতরণে। চারপাশের মানুষকে উদ্বুদ্ধ করবেন নিয়মিত দানের অফুরন্ত কল্যাণে শরিক হতে।



সেই ছোট্ট শিশুরা এখন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী

মেয়েশিশুদের লালনপালনে সম্ভব দান

হযরত মওলানা ছায়ীদুল হক

মহান স্রষ্টা সমস্ত রিজিকের মালিক। তিনি আমাদের জীবন যাপনের জন্যে এবং তাঁর প্রতিনিধিত্ব যেন স্বাধীনভাবে করতে পারি, সেজন্যেই আমাদের রিজিক দিয়েছেন। সেইসাথে আমরা যেন স্রষ্টাকে ভুলে না যাই, সেজন্যে আমাদের রিজিক থেকে তাঁর সন্তষ্টির পথে একটা অংশ ব্যয় করার নির্দেশ দিয়েছেন।

আল্লাহর সন্তষ্টিতে সামনে রেখেই দৃষ্ট অবহেলিত সাতটি শিশুকে নিয়ে শুরু হয়েছিল কোয়ান্টাম শিশুকানন। এই শিশুদের সৃষ্টি লালনপালনের জন্যে ছোট ছোট মাটির ব্যাংকে দান সংগ্রহ করতে শুরু করে ফাউন্ডেশন। পরবর্তীতে সম্ভবদান এ দানে শুরু হয় নানামুখী সেবামূলক কার্যক্রম। প্রথম বছর ১৯৯৮ সালে সংগৃহীত হয়েছিল ১৮ হাজার টাকা। ২০১৪ সালে সংগৃহীত দানের পরিমাণ ১৯ কোটি ১১ লক্ষাধিক টাকা।

প্রথমে আমরা বান্দরবানের লামায় ছেলেশিশুদের নিয়ে কাজ শুরু করি। ২০০৪ সাল থেকে অভিভাবকহীন মেয়েশিশুদের জন্যে শিশুসদনের কার্যক্রম শুরু হয় রাজশাহীতে। তবে মেয়েশিশুদের পরিপূর্ণ বিকাশের জন্যে ২০১৪ সালে আনুষ্ঠানিকভাবে শিশুসদন স্থানান্তর করা হয় কোয়ান্টামে। সাধারণভাবে একটি বালক বিদ্যালয় ও একটি বালিকা বিদ্যালয়ের যে পার্থক্য, কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশনের প্রেক্ষাপটে বালক বিদ্যালয় ও বালিকা বিদ্যালয় সে রকম না। মানবিক দিক থেকে তার চাইতেও অনেক বেশি গুরুত্বের দাবিদার।

কন্যাশিশুদের প্রসঙ্গে সূরা তাকভির-এর ৭, ৮ ও ৯ আয়াতে বলা হয়েছে-‘যখন দেহে আবার আত্মা সংযুক্ত হবে, যখন জীবন্ত কবর দেয়া শিশুকন্যাকে জিজ্ঞেস করা হবে, কী অপরাধে তাকে হত্যা করা হয়েছিল?’ এই আয়াতগুলোকে কেন্দ্র করে জাহেলিয়াতের যুগে নারী এবং কন্যাশিশুদের অবস্থা নিয়ে একদিন সাহাবীদের সাথে আলোচনা করছিলেন নবীজী (স)। তখন একজন সাহাবী ব্যাকুল হয়ে কাঁদতে লাগলেন। নবীজী (স)-এর অনুমতি নিয়ে তিনি বলতে শুরু করলেন-‘জাহেলিয়াতের সময় আমার স্ত্রী যখন সন্তানসম্ভবা, পারিবারিকভাবে আমাকে ডেকে সবাই সিদ্ধান্ত দিল, যদি কন্যাসন্তান হয় তাহলে কেউ জানার আগেই তাকে হত্যা করতে হবে। আমার স্ত্রী কিছুতেই এ ব্যাপারে রাজী হয় নি। পরে আমি ধাত্রী-মাতাকে ঘুষ দিয়েছি, যদি কন্যাসন্তান হয় তাহলে শিশুটিকে সরিয়ে ফেলতে হবে। কিন্তু কন্যাসন্তানটি এত সুন্দর হয়েছিল যে, ধাত্রী তাকে আমার হাতে তুলে দিতে পারে নি। মায়ের কাছে সন্তানকে রেখে সে পালিয়ে যায় আমার শান্তির ভয়ে।

মায়ের কোল থেকে মেয়েকে নিয়ে আর মারতে পারলাম না। এরপরে বহুবার উদ্যোগ নিয়েছি। মা তাকে আগলে রেখেছে। অসম্ভব সুন্দর হয়েছিল সে। আস্তে আস্তে আমিও মায়ার বাঁধনে আটকে গেছি। একপর্যায়ে ভুলেই গিয়েছি যে, তাকে মেরে ফেলতে হবে। কিন্তু একদিন বাজারে আমাকে নিয়ে বন্ধুরা-সমবয়সীরা সাংঘাতিক উপহাস করল। আমাকে পুরুষত্বহীন বলল কারণ মেয়েটাকে আমি হত্যা করতে পারি নি। সিদ্ধান্ত নিলাম মেয়েকে মেরে ফেলব।

এরপর একদিন মেয়েকে সুন্দর পোশাক পরিয়ে, সাজিয়ে বাইরে বেড়াতে নিয়ে গেলাম। মানসিক প্রস্তুতি নিলাম তাকে হত্যা করার জন্যে। তার মা-ও ততদিনে নিশ্চিত হয়ে গেছে যে, আর বুঝি মেয়েকে মেরে ফেলা হবে না। মেয়েকে নিয়ে হাঁটা শুরু করলাম। উঁচু পাহাড়ের ওপরে উঠছি আর সে বার বার

বলছে, ‘আমরা কোথায় যাব? এদিকে তো পথ নেই। এদিকে যাচ্ছেন কেন?’ এরকম কত কথা যে সে বলছে! মায়ার আমার চোখ বেয়ে পানি আসছিল। আবার যখন বন্ধুদের কথা মনে হয় তখন ইচ্ছে করে মেয়েকে ফেলে দেই।

আস্তে আস্তে পাহাড়ের চূড়ায় উঠলাম। চতুর্দিকে দেখলাম। একদিকে গাল ভরা কথা বলছে আমার সন্তান। আরেকদিকে আমার ভেতরে পাশবিকতা। আমি মেয়েকে কোলে তোলার ভান করে ওপরের দিকে তুলে সেই উঁচু পাহাড় থেকে নিচে ফেলে দিলাম। সে শুধু একবার ইয়া আবী (বাবা) বলে চিৎকার দিল। সেই চিৎকারের আওয়াজ এখনো পৃথিবীতে ভেসে বেড়াচ্ছে। আমি সহ্য করতে পারি না। আমি এখনো শুনতে পাই-বাবা বলে তার সেই চিৎকার।’

জাহেলিয়াতের যুগে এরকম শত শত ঘটনা ঘটেছে। অথচ এই পাশবিকতায় আচ্ছন্ন মানুষগুলোই পরবর্তীতে কোরআনের আলোয় আলোকিত হয়েছে, বদলে গেছে। ইসলাম যে কত বড় কল্যাণ করেছে নারী জাতির, তা আমরা সহজেই অনুধাবন করতে পারি।

আরেকজন সাহাবী একদিন নবীজীর (স) সামনে এসে বললেন, ‘ইয়া রসুলুল্লাহ! জাহেলিয়াতের যুগ বলে আমাদেরকে গালি দেয়া হয়। আসলেই আমরা জাহেল ছিলাম, পশু ছিলাম। কিন্তু ভালো কাজও কিছু করেছি। কন্যাসন্তানকে জীবন্ত দাফন করাটা ছোটবেলা থেকেই আমাকে কষ্ট দিত। আমি ৩৬০টি কন্যাশিশুকে জীবন্ত দাফন করার হাত থেকে রক্ষা করেছি। প্রত্যেকটি শিশুর জন্যে আমার সম্পদ থেকে দুটি করে উট দান করতে হয়েছে। আমি কি এর বিনিময়ে কিছু পাব?’ নবীজী (স) উঠে তাকে জড়িয়ে ধরলেন এবং বললেন, ‘আল্লাহ তোমাকে কবুল করেছেন।’

কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশনও স্রষ্টার সন্তষ্টির লক্ষ্যে দায়িত্ব নিয়েছে অভিভাবকহীন মেয়েশিশুদের। এদের নিয়ে গড়ে উঠল কোয়ান্টাম শিশুসদন। নির্মম হলেও সত্য-পরিত্যক্ত অবস্থায় যত শিশু পাওয়া যায়, এর প্রায় সবই মেয়েশিশু। তাহলে সেই জাহেলিয়াতের যুগ থেকে আমরা কি এক পা-ও সামনে এগোতে পেরেছি? সমাজের সবাই কি কন্যাসন্তান জন্মগ্রহণ করার পর আনন্দিত হতে পারি? মনটা ছোট হয়ে যায় কিনা অনেকের? কেন এরকম হয়?

সেখান থেকে গুরুজী জীবনের ঝুঁকি নিয়ে তাদেদেরকে লালনপালন করার উদ্যোগ নিলেন। জীবনের ঝুঁকি বলছি, কারণ এ ধরনের দায়িত্ব তো কেউ নেয় না। এ শিশুদের জন্যে আমাদেরও তো দায়িত্ব আছে। আল্লাহ শুধু তাদের বাবা-মা বা ওই জাহেল পশুদেরকেই জিজ্ঞাসা করবেন না। অদবেশী আমরা যারা সমাজে বেঁচে আছি, আমাদেরকেও জিজ্ঞেস করবেন-‘তোমরা কন্যাশিশুদের রক্ষা করার জন্যে কী করেছ?’ অবহেলিত এই শিশুদের অন্ধকার-অনিশ্চিত ভবিষ্যতের হাত থেকে বাঁচানোর একটা সুযোগ আমরা পেয়েছি। কোয়ান্টাম সে সুযোগ আমাদের দিয়েছে।

তাই জীবন রক্ষার এই মিছিলে সাধ্যমতো সবকিছু উজাড় করে দেয়া আমাদের মানবিক দায়িত্ব। এজন্যেই সাধারণ একটি বালিকা বিদ্যালয়ের সাথে কোয়ান্টাম শিশুসদনের তুলনা করলে চলবে না। এটি আলোকিত জীবন নির্মাণের একটি সংগ্রাম, একটি অভিযাত্রা।

অবহেলিত মেয়েশিশুদের আবাসন, লেখাপড়াসহ সার্বিক কার্যক্রম পরিচালনার জন্যে লামায় বহুতলবিশিষ্ট ভবন নির্মাণের উদ্যোগ নিয়েছে ফাউন্ডেশন। এতে আমরা সাধ্যমতো অংশ নিতে চাই। অভিভাবকহীন এই শিশুরাসহ ভবিষ্যতে দেশের গোটা নারী সমাজ যেন মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারে, এই লক্ষ্যে আমরা কাজ করতে চাই। এই অনন্ত কল্যাণে শরিক হতে কোয়ান্টাম মাটির ব্যাংকে দানের অর্থ জমা করতে চাই নিয়মিত।

[হযরত মওলানা ছায়ীদুল হক, খতিব ও বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ]



দানের ধর্মীয় গুরুত্ব

আল কোরআন

আল্লাহ-সচেতনরা গায়েবে (মানুষের সীমাবদ্ধ জ্ঞানে বোধগম্য না হওয়া সত্ত্বেও অদৃশ্য বাস্তবতায়) বিশ্বাস করে, নামাজ কায়েম করে, প্রাপ্ত রিজিক থেকে অন্যের জন্যে ব্যয় করে (অর্থাৎ দান করে)।

(হে বিশ্বাসীগণ!) তোমার প্রিয় ও পছন্দের জিনিস থেকে দান করতে না পারলে তুমি কখনো সত্যিকারের ধার্মিক হতে পারবে না। **সূরা আলে ইমরান : ৯২**

আমার বিশ্বাসী বান্দাদের বলো (নির্ধারিত দিন আসার আগেই) নামাজ কায়েম করতে এবং আমি যে জীবনোপকরণ দিয়েছি, তা থেকে আমার পথে প্রকাশ্যে ও গোপনে ব্যয় করতে। নির্ধারিত দিন এলে তখন কোনো লেনদেনও হবে না বা বন্ধুত্বও কোনো কাজে লাগবে না। **সূরা ইব্রাহিম : ৩১**

যারা আল্লাহর কিতাব অনুসরণ করে, নামাজ কায়েম করে এবং আমি তাদের যে জীবনোপকরণ দিয়েছি, তা থেকে প্রকাশ্যে ও গোপনে দান করে, তারাই সফল বিনিয়োগকারী। কারণ তিনি তাদের কর্মের পূর্ণ প্রতিফল দেবেন, এর সাথে নিজের অনুগ্রহ-ভাণ্ডার থেকে বহুগুণ পুরস্কার দেবেন। **সূরা ফাতির : ২৯-৩০**

হে বিশ্বাসীগণ! তোমাদেরকে আল্লাহর পথে ব্যয় করতে বলা হচ্ছে, অথচ তোমাদের অনেকেই কৃপণতা করছে। যারা (আল্লাহর পথে) কার্পণ্য করে, তারা তো আসলে নিজেরদের প্রতিই কার্পণ্য করে। **সূরা মুহাম্মদ : ৩৮**

আমি তোমাদেরকে যে জীবনোপকরণ দিয়েছি, সময় থাকতেই তা থেকে অন্যের জন্যে ব্যয় করো, যাতে মৃত্যুর মুহূর্তে একথা বলতে না হয়, 'হে আমার প্রতিপালক! আমাকে আরেকটু সময় দাও, আমি দান করে সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত হই।' কিন্তু মৃত্যুর নির্ধারিত সময় উপস্থিত হলে আল্লাহ কাউকেই অবকাশ দেন না। **সূরা মুনাফিকুন : ১০-১১**

তুমি কি জানো ধর্মের দুর্গ কী? ধর্মের দুর্গ (নেক আমল বা সৎকর্মের সুউচ্চ স্তর) হচ্ছে (এক) দাসমুক্তি (অর্থাৎ একজন মানুষকে মনোজাগতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক অর্থাৎ সকল ধরনের দাসত্ব থেকে মুক্ত করা), (দুই) দুর্ভিক্ষের দিনে অন্নদান, (তিন) নিকটবর্তী এতিম বা ধূলিমলিন মিসকিন-অসহায়কে লালন এবং (চার) বিশ্বাসীদের সাথে সজ্ঞাবদ্ধ হয়ে পরস্পরকে বিশ্বজনীন মমতা ও সবরে (অর্থাৎ পরিস্থিতি পরিবর্তনের জন্যে নিরলস প্রচেষ্টা ও আত্মসংযমে) উদ্বুদ্ধ করা। এরাই সফলকাম। **সূরা বালাদ : ১২-১৮**

বেদ

সমাজকে ভালবাসো। ক্ষুধার্তকে অন্ন দাও। দুর্গতকে সাহায্য করো। সত্য-ন্যায়ের সংগ্রামে সাহসী ভূমিকা রাখার শক্তি অর্জন করো। **ঋগ্বেদ : ৬.৭৫.৯**

নিঃশর্ত দানের জন্যে রয়েছে চমৎকার পুরস্কার। তারা লাভ করে আশীর্বাদধন্য দীর্ঘজীবন ও অমরত্ব। **ঋগ্বেদ : ১.১২৫.৬**

এসো প্রভুর সেবক হই! গরিব ও অভাবীদের দান করি। **ঋগ্বেদ : ১.১৫.৮**

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

স্থান কাল বিবেচনা করে কোনো প্রত্যাশা না করে উপযুক্ত পাত্র প্রদত্ত দান সাত্ত্বিক বা উত্তম দান। প্রতিদানের প্রত্যাশায় অনিচ্ছাসত্ত্বে প্রদত্ত দানকে রাজসিক দান বলা হয়। অযোগ্য পাত্রের আদর্শে এবং অবজ্ঞা সহকারে যে দান, তা হচ্ছে তামসিক। **শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা : ২০-২২**

বুদ্ধবাণী

ক্রোধকে ক্ষমা দ্বারা, অন্যায়কে ন্যায় দ্বারা, কৃপণতাকে দান দ্বারা, মিথ্যাকে সত্য দ্বারা জয় করো। **ধর্মপদ : কোধবগ্গো : ২২৩**

দানের অনন্ত কল্যাণ সম্পর্কে আমি যা জানি, যদি মানুষ তা জানত, তাহলে কাউকে না দিয়ে সে অন্ন গ্রহণ করত না। স্বার্থপরতার কালিমা তাকে বশীভূত করতে পারত না। তার মনের গভীরে নীচতার কালিমা প্রবেশ করতে পারত না। **ইতিবুত্তক : ২৬**

প্রকৃত নিরন্ন মানুষকে যে অন্ন দান করে, সে পরলোকে স্বর্গে গমন করবে। **ইতিবুত্তক : ২৬**

বাইবেল

যখন দান করো গোপনে করো। ডান হাত কী দিচ্ছে বাম হাত যেন জানতে না পারে। তোমার নীরব দান সদাপ্রভু দেখছেন। তিনি তোমাকে পুরস্কৃত করবেন। **মথি : ৩-৪**

অভাবীদের সাহায্য করো। ঈশ্বরের সম্ভ্রষ্টমূলক কাজে অগ্রগামী থাকো। **রোমীয় ১২ : ৯-১৩**

সৎকাজ সম্পর্কে জানার পরও তা করা থেকে বিরত থাকা পাপ। **যাকোব ৪:১৭**

বিকাশ করুন দানের অর্থ

এখন থেকে কোয়ান্টাম মাটির ব্যাংকে আপনার দানের অর্থ দেশের যে-কোনো প্রান্ত থেকে বিকাশ করা যাবে সহজেই। বিকাশ নম্বরটি হলো ০১৮৪৮-৩৬৬৬০১।

এছাড়া সদকা হিলিং ও যাকাত ফান্ডেও বিকাশের মাধ্যমে অনুদান জমা দেয়া যাবে। অনুদান পাঠানোর জন্যে আপনার নিজস্ব বিকাশ একাউন্ট থেকে পেমেন্ট

অপশনে গিয়ে রেফারেন্স-এ মাটির ব্যাংকের জন্যে MB সদকা হিলিংয়ের জন্যে HL এবং যাকাত-এর জন্যে ZK লিখতে হবে। এরপর অনুদানের পরিমাণ লিখে ফাউন্ডেশনের বিকাশ নম্বরটিতে (০১৮৪৮-৩৬৬৬০১) পাঠাতে হবে। বিস্তারিত জানতে ভিজিট করুন : quantummethord.org.bd/bkash

ভালো কাজে সাহায্য করুন

শিশুবন্ধু ডা. এম আর খান

কোয়ান্টাম নিঃস্বার্থভাবে মানুষের জন্যে কাজ করছেন। আমার সুযোগ হয়েছিল আমার শিশুকানন দেখার। সুন্দর আর প্রাণবন্ত শিশুরা যেন স্বর্গের একেকটি ফুল।



বান্দরবানের লামায় অবহেলিত ও বঞ্চিত শিশুদের আলোকিত মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার বৈচিত্র্যময় কর্মকাণ্ড দেখে আমার খুব ভালো লেগেছে। ইতোমধ্যেই ওখানকার শিশুদের স্বাস্থ্যসেবার মানোন্নয়নে আমরা বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছি।

এই শিশুদের আলোকিত মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে আমরা মাটির ব্যাংকে নিয়মিত দান করতে পারি, আমাদের যাকাতের একটি অংশ এখানে দিতে পারি। কারণ, যিনি ভালো কাজ করছেন তার কাজে সাহায্য করলে মানুষ উপকৃত হবে। আর ভালো কাজে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়ে আমরা সবাই সওয়াবের অংশীদার হতে পারি।

[জাতীয় অধ্যাপক ডা. এম আর খান, বাংলাদেশে শিশু চিকিৎসার সূচনা ও বিকাশে জীবন্ত কিংবদন্তি]

অল্প হলেও দান করুন নিয়মিত

আল্লামা এম শমশের আলী



দান সর্বোত্তম মানবীয় গুণ। সব ধর্মেই দানের কথা বলা হয়েছে। ব্রহ্ম দাতাকে পছন্দ করেন। তাই যুগে যুগে মহামানবরা নিজে দান করেছেন,

অন্যকে উৎসাহিত করেছেন।

তবে কোথায় দান করছেন, তা ভাবতে হবে আপনাকেই। কারণ, দান করলেই দায়িত্ব শেষ হয়ে যায় না। গ্রহীতা সেই অর্থ দিয়ে ভালো কাজ করলে দাতার জন্যে তা সদকায়ে জারিয়া হিসেবে গণ্য হয়। আর গ্রহীতা সেই অর্থ দিয়ে মন্দ কাজ করলে, পাপের ভাগীদার হওয়া থেকে দাতা-ও রক্ষা পায় না।

এদেশে যেসব প্রতিষ্ঠান দান সংগ্রহ করে ভালো কাজ করছে কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন তাদের অন্যতম। এখানে যদি নিয়মিতভাবে দান করেন, সে দান ব্রহ্মের কাছে অনেক অর্থবহ হবে বলে আমার বিশ্বাস। যত অল্পই হোক নিয়মিত দান করুন। শেষ বিচারের দিনে করণাময়ের করুণায় আপনি ধন্য হবেন।

[আল্লামা প্রফেসর ড. এম শমশের আলী, পরমাণু বিজ্ঞানী, শিক্ষাবিদ, লেখক ও ইসলামী চিন্তাবিদ]

প্রশ্ন : দান করলে দাতার কী উপকার হবে?

উত্তর : আমাদের একটা বক্তব্য হচ্ছে, নিজের কল্যাণে ও অন্যের কল্যাণে দান করুন। প্রথমেই নিজের কল্যাণে দান। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলছেন, '(হে মানুষ!) যে অর্থবিত্ত তোমরা দান করো, সে দান তোমাদের নিজেদের কল্যাণের জন্যেই। তোমরা তো আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যে ব্যয় করো। অতএব দানের পুরোপুরি প্রতিদান তোমাদেরকে অবশ্যই দেয়া হবে। তোমাদের হক কখনো নষ্ট করা হবে না' (সূরা বাকারা, আয়াত ২৭২)।

অর্থাৎ স্রষ্টা নিজেই বলছেন যে, দান করলে প্রথম কল্যাণ হয় দাতার।

আল্লাহ সূরা বাকারা-র ২৬১ নম্বর আয়াতে উদাহরণ দিয়ে বলছেন, 'যারা নিজেদের ধনসম্পত্তি আল্লাহর পথে ব্যয় করে, তাদের এই সৎদান এমন একটি শস্যবীজ, যাতে উৎপন্ন হয় সাতটি শিশু আর প্রতিটি শিশু থাকে শত শস্যদানা।' আল্লাহ যাকে ইচ্ছা বহুগুণ প্রবৃদ্ধি দান করেন।' অর্থাৎ আল্লাহ দাতাকে এর বহুগুণ প্রতিদান দেবেন।

কোরআনে আল্লাহর ওয়াদা অনুযায়ী নিয়মিত দান করার মধ্য দিয়ে আমরা ধনী হওয়ার সুযোগ পাচ্ছি। ভয় দুঃখকষ্ট ও টেনশন থেকে মুক্ত, বিপদমুক্ত, সমস্যামুক্ত, দারিদ্র্যমুক্ত, এবং সমস্ত অনিশ্চয়তামুক্ত সচ্ছল জীবন পাচ্ছি।

দানের নগদ বিনিময় হচ্ছে, টেনশন ও পেরেশানি দূর হয়ে যাবে যেটা এ যুগের সবচেয়ে বড় অভিযাপ। নবীজী (স) বলেছেন, দান ৭০টিরও বেশি বিপদ থেকে মানুষকে রক্ষা করে। অর্থাৎ সমস্যামুক্ত সুস্থ সফল জীবন যাপনের জন্যে নিয়মিত দান অনেক বড় ভূমিকা পালন করে।

দানের বিনিময়ে দাতা যেহেতু পার্থিব জীবনেই এত কল্যাণ লাভ করছেন, তাহলে পরকালে কি দাতা কোনো পুরস্কার পাবেন না? দাতার জন্যে পরকালের কল্যাণ তো স্রষ্টা নিজের কাছেই গচ্ছিত রেখেছেন।

প্রশ্ন : দান করবে ধনীরা। আমি তো এখনো দান করার মতো ধনী হই নি।

উত্তর : দান শুধু ধনীদের জন্যে নয়। বরং নিজ নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী ধনী-গরিব সবার জন্যেই। সূরা আলে ইমরান-এর ১৩৪ নম্বর আয়াতে আল্লাহ তায়ালা নির্দেশ দিচ্ছেন, 'নিশ্চয়ই যারা (এক) সচ্ছল ও অসচ্ছল অবস্থায় দান করে, (দুই) রাগ নিয়ন্ত্রণ করে, (তিন) মানুষকে ক্ষমা করে, আল্লাহ তাদের ভালবাসেন।' অর্থাৎ সচ্ছল অবস্থায় যেমন দান করতে হবে, তেমনি অসচ্ছল অবস্থাতেও দান করতে হবে। এটাই শাস্ত্বত ধর্মের শিক্ষা।

প্রশ্ন : আমার টাকা যদি আমি দান না করি তাহলে সমস্যা কী?

উত্তর : আমরা মনে করি, আমার সম্পদের মালিক আমি। দান না করলে কার কী? এ ধরনের দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালা সূরা হাদীদের ১০ নম্বর আয়াতে বলেন, 'মহাবিশ্বের সবকিছুর একক মালিক আল্লাহ। তা জানার পরও (হে বিশ্বাসীগণ!) তোমরা আল্লাহর পথে মুক্তহস্তে ব্যয় করো না কেন?' এই আয়াত থেকে বোঝা যায়, আমার সম্পদের মালিক আমি নই বরং সবকিছুর একক মালিক আল্লাহ। তাই দানের ব্যাপারে গড়িমসি করা ঠিক নয়।

অনেকে গরিব হয়ে যাওয়ার ভয়ে দান করতে চায় না। কেউ কেউ আবার দানের ব্যাপারে অন্যদের নিরুৎসাহিত করে। তাদের সম্পর্কে সূরা নিসা-র ৩৭ নম্বর আয়াতে আল্লাহ বলেছেন, 'যারা নিজেরা

দান সম্পর্কে

কৃপণ এবং অন্যকে কৃপণতা করতে উৎসাহিত করে (বা দানে নিরুৎসাহিত করে) এবং আল্লাহর অনুগ্রহ-সম্পদ গোপন করে, আল্লাহ তাদেরও অপছন্দ করেন। এ ধরনের অকৃতজ্ঞদের জন্যে আমি অপমানজনক শাস্তির ব্যবস্থা করে রেখেছি।'

প্রশ্ন : ভিক্ষুককে দান করলে তা কেন আল্লাহর কাছে দান হিসেবে গ্রহণযোগ্য হবে না?

উত্তর : আমরা যাদের ভিক্ষুক মনে করি তারা আসলে পেশাদার ভিক্ষুক। ভিক্ষাবৃত্তি এখন একটা ব্যবসা। এমন কোনো নজির দেখাতে পারবেন না যে, কোনো ভিক্ষুক ধনী হওয়ার পর ভিক্ষাবৃত্তি বন্ধ করে দিয়েছে। তাই ভিক্ষুককে দান করলে তাতে দারিদ্র্য বিমোচনে সহায়ক কিছু করা হলো না।

অথচ আমরা দানের টাকায় প্রথম যে কয়টি শিশুর লালনপালন শুরু করেছিলাম, তাদেরই একজন এবছর খুলনা মেডিকেল কলেজ থেকে ডাক্তার হয়ে বের হবে। তখন সে কিংবা তার পরিবার কি আর দরিদ্র থাকবে? এরকম হাজারো শিশু আপনারদের মাটির ব্যাংকে জমাকৃত দানের অর্থে বেড়ে উঠছে স্বাবলম্বী ও আলোকিত মানুষ হওয়ার লক্ষ্যে। ভিক্ষাবৃত্তির সাথে সৎদানের এটাই হচ্ছে পার্থক্য।

প্রশ্ন : আমরা দান কোথায় করব? সজ্ঞবদ্ধভাবেই কেন দান করতে হবে? আমি তো যে-কোনো জায়গায় দান করতে পারি যদি আমার নিয়ত ঠিক থাকে, তাই নয় কি?

উত্তর : সূরা বাকারা-র ২১৫ নম্বর আয়াতে আল্লাহ বলেছেন, 'হে নবী, তারা তোমাকে প্রশ্ন করবে, আমরা অন্যের জন্যে কী প্রক্রিয়ায় ব্যয় করব? তুমি বলো, তোমাদের অর্থসম্পত্তি প্রথমত মা-বাবা, তারপর পরিবার, আত্মীয়স্বজন, এতিম, অভাবী ও মুসাফিরদের জন্যে ব্যয় করবে।' দান এবং যাকাত উভয়ের লক্ষ্য দারিদ্র্য বিমোচন। নবীজী (স)-এর নির্দেশ হলো, কাউকে ভিক্ষা দিয়ে স্থায়ীভাবে গ্রহীতা বানাবে না।

আর একই লক্ষ্যে কাজ করছে কোয়ান্টাম মাটির ব্যাংক কার্যক্রম। এই দান অসহায় জনগোষ্ঠীকে স্বাবলম্বী করার জন্যে। অতএব সজ্ঞবদ্ধভাবে দান করে আমরা এতিম ও মিসকিনের হক আদায় করতে পারি। সবচেয়ে বড় কথা, দানের ব্যাপারে নিশ্চিত হতে হবে যে, তা দরিদ্রের হাতে পৌঁছাচ্ছে কিনা। বর্তমানে মাজারে কিংবা ভিক্ষুককে দান করলে সে ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া কঠিন। এখন এটা একটা পেশা। তাই নিশ্চিত হয়ে দান করার খাত হিসেবে বলা যায়, বাবা-মা, গরিব আত্মীয়স্বজন এবং তারপর এতিম-মিসকিনের জন্যে কোয়ান্টাম মাটির ব্যাংক।

প্রশ্ন : মাটির ব্যাংকে জমাকৃত দানের অর্থ অমুসলিমদের জন্যেও ব্যয় করা হয়। সুতরাং, একজন মুসলিম কি এখানে দান করতে পারে?

উত্তর : মুসলমান-অমুসলমান তো পরের কথা, খলিফা হওয়ার পর হযরত ওমর (রা) বলেছিলেন, 'ফেরাত নদীর তীরে যদি একটি বিড়ালও না খেয়ে মারা যায়, আমি ওমরকে আল্লাহর দরবারে জবাবদিহি করতে হবে।' তখন খেলাফতের অধীনে অনেক অমুসলিম বাস করত। রাষ্ট্র তাদেরকে বঞ্চিত করে নি, তাদের মৌলিক প্রয়োজন পূরণ করেছে। তাহলে আমরা কীভাবে তাদের বঞ্চিত করব?

তাছাড়া বিদেশি সাহায্য বা রিলিফ যখন আসে, আপনি কি ভেবে দেখেন, এই সাহায্যটা আমাকে মুসলমান দিয়েছে, নাকি হিন্দু বা খ্রিস্টান দিয়েছে? গ্রহণ করার সময় জিজ্ঞেস করছেন না। তাহলে দান করার সময় কেন জিজ্ঞেস করবেন?

অসুস্থ হলে আপনি ভালো ও দক্ষ ডাক্তারের কাছে যান, নাকি ডাক্তার মুসলমান হিন্দু না খ্রিস্টান-এটা বিচার করেন? মামলায় পড়লে আইনজীবীর ধর্ম বিচার করেন, নাকি তার যোগ্যতা বিচার করেন? একইভাবে দান পাওয়ার জন্যে যে সবচেয়ে উপযুক্ত, অর্থাৎ সবচেয়ে অবহেলিত-বঞ্চিতকেই দান করতে হবে। তার ধর্মধর্ম বিচার করা অমানবিক।

ধরুন, সড়ক দুর্ঘটনায় কিছু মানুষ আহত হলো। অমুসলমানদের রেখে শুধু মুসলমানদের আপনি হাসপাতালে নিয়ে যাবেন? আপনার বিবেক কি তাতে সায় দেবে? প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় আপনি বিপন্ন মানুষের ধর্ম জিজ্ঞেস করবেন, নাকি তাকে উদ্ধার করবেন? উদ্ধার করাটাই তো মানবিকতা। এটাই আল্লাহর রসুলের নির্দেশ।

রসুলুল্লাহ (স)-কে আল্লাহ তায়ালা রাহমাতুল্লিল আলামীন করে পাঠিয়েছেন, অর্থাৎ সৃষ্টি তথা সমগ্র মানবজাতির জন্যে রহমতস্বরূপ। তিনি সকল মানুষের কল্যাণে কাজ করেছেন। তিনি অভুক্ত প্রতিবেশীর কথা বলেছেন, অভুক্তের ধর্ম বিচার করতে বলেন নি। অতএব তাঁর অনুসারী হিসেবে আমাদেরও সকল দুর্গত মানুষের জন্যে কাজ করা উচিত। সেটাই হবে নবীজী (স)-এর প্রতি আমাদের ভালবাসার প্রকাশ।

প্রশ্ন : দান কি আমার ইচ্ছেমতো করব? নাকি এ ব্যাপারে স্রষ্টার কোনো নীতিমালা আছে?

উত্তর : এ ব্যাপারে আল্লাহ সূরা আলে ইমরানে (আয়াত নম্বর ৯২) সুস্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছেন। '(হে বিশ্বাসীগণ!) তোমার প্রিয় ও পছন্দের জিনিস থেকে দান করতে না পারলে তুমি কখনো সত্যিকারের ধার্মিক হতে পারবে না। অন্যের জন্যে তুমি যা-কিছু ব্যয় বা দান করো আল্লাহ তা ভালোভাবেই জানেন।'

অর্থাৎ হেঁড়া পরিত্যক্ত পোশাক দান করলে কিংবা পকেটে এক হাজার টাকা রেখে পাঁচ টাকা দান করলে তা স্রষ্টার পছন্দনীয় হবে না। আর দান করতে হবে নিয়মিত। আমরা যারা ব্যবসায়ী/ চাকরিজীবী তারা উপার্জনের জন্যে প্রতিদিন পরিশ্রম করি। আল্লাহ প্রতিদিন আমাদের রিজিক দেন। তাহলে, দান কেন প্রতিদিন হবে না? তাই আপনার যা আছে তা থেকে নিয়মিত দান করুন। অস্থিরতা ও বাল্য-মুসিবত থাকবে না। আসবে সাফল্য প্রাচুর্য প্রশান্তি।

প্রশ্ন : আমাদের পরিবারে দুই জন প্রো-মাস্টার, একজন গ্রাজুয়েট। দুই বাচ্চা আছে। প্রত্যেকেরই আলাদা মাটির ব্যাংক আছে। একজনের আয় থেকেই ব্যয় করা হয়। তাহলে কি প্রত্যেকের আলাদা মাটির ব্যাংক প্রয়োজন আছে?

উত্তর : এটি অত্যন্ত ভালো একটা অভ্যাস। নিয়মিত দান করাটা প্রত্যেকেরই দায়িত্ব এবং এ দায়িত্ব পালনে সবাইকে সহযোগিতা করা উচিত। আমরা যদি পরিবারের সবাইকে আনন্দের সাথে মাটির ব্যাংক দেই, এতে একটা সং অভ্যাস গড়ে উঠবে। অতএব পরিবারে যত সদস্য আছে, সবাইকে আপনি আলাদা আলাদা মাটির ব্যাংক দিতে পারেন।



আপনার যত প্রশ্ন

প্রশ্ন : মাটির ব্যাংকে দান শিরক কিংবা ইসলামী চেতনার পরিপন্থী কিনা?

উত্তর : আল্লাহর সাথে কাউকে শরিক করলে তা হয় শিরক। এটা যতটা না প্রায়োগিক, তার চেয়ে বেশি মানসিক বা বিশ্বাসের। যেমন, বলা হয় আল্লাহ ছাড়া আর কারো কাছে কিছু চাওয়া যাবে না। কিন্তু মা-বাবার কাছে আমরা কি চাই না? বলি না যে, পাঁচটা টাকা দাও; বাবা, অমুক জিনিসটা এনে দাও। বলি। কারণ, এটাই দৈনন্দিন কথোপকথন। কাজেই সবকিছুতে শিরক খোঁজার মানসিক জটিলতায় যারা আক্রান্ত তাদের কথা দ্বারা প্রভাবিত হবেন না। এরা নিজেরা সংকল্প করছে না, করতে সাহায্য করছে না এবং আরেকজন কর্তৃক এটাও চাচ্ছে না।

আমরা আল্লাহর ওয়াস্তে দান করছি। দানের টাকা মাটির ব্যাংকে জমিয়ে একত্রে কিছুদিন পর ফাউন্ডেশনে জমা দিচ্ছি। ফাউন্ডেশন প্রতিটি জমার বিপরীতে মানি রিসিট দিয়ে টাকা রাখছে এবং তা সৃষ্টির কল্যাণে ব্যয় করছে। এর মধ্যে আল্লাহর সাথে কোনোকিছুকে শরিক করার কোনো সুযোগ নেই।

তাই মাটির ব্যাংকে দান শিরক তো নয়-ই, বরং উত্তম ইবাদত। সূরা বাকারার-র ২৭৪ নম্বর আয়াতে সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে, ‘নিশ্চয়ই যারা তাদের উপার্জন থেকে রাতে বা দিনে, প্রকাশ্যে বা গোপনে, সচ্ছল বা অসচ্ছল অবস্থায় দান করে, তাদের জন্যে তাদের প্রতিপালকের কাছে পুরস্কার রয়েছে। তাদের কোনো ভয় বা পেরেশানি থাকবে না।’

আমরা যদি একটু চিন্তা করি তাহলে দেখব-দিনে বা রাতে প্রকাশ্যে বা গোপনে সচ্ছল বা অসচ্ছল অবস্থায় আপনার দান জমা করার জন্যে কোয়ান্টাম মাটির ব্যাংকের চেয়ে ভালো মাধ্যম আর নেই। কারণ মাটির ব্যাংক দিনে-রাতে সবসময় আপনার হাতের কাছেই থাকছে। আর সং নিয়তে সম্ভবদান দানের বরকত ও প্রতিদান অনেক বেশি।

প্রশ্ন : দান নিগর্ত হওয়া উচিত। অর্থাৎ পাওয়ার আশায় নয়। অথচ আমরা প্রতিনিয়তই বালা-মুসিবত দূরের জন্যে বা এটা-ওটা পাওয়ার নিয়তে মাটির ব্যাংকে দান জমা করি। সেটা কি নিগর্ত?

উত্তর : দান অবশ্যই নিগর্ত হওয়া উচিত এবং দান করে প্রতিদানের আশা করা উচিত নয়। কিন্তু কার কাছে প্রতিদানের আশা করা যাবে না সেটা জানা জরুরি। এই প্রতিদানের আশা করা যাবে না তার কাছ থেকে যাকে দান বা সাহায্য করা হয়েছে। এমনকি দান করে বা সাহায্য করে যদি খোঁটা দেয়া হয় বা কথা শোনানো হয়, তাহলেও তা সমস্ত সংকল্পকে ব্যর্থ করে দিতে পারে।

মাটির ব্যাংকের ক্ষেত্রেও আমরা যাকে সাহায্য করি তার কাছ থেকে প্রতিদানের আশা করি না। এমনকি যে ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে আলাদা আলাদা মাটির ব্যাংকের দানসমূহ সম্ভবদান হচ্ছে, সে ফাউন্ডেশনের কাছেও কোনোকিছু পাওয়ার প্রত্যাশা করা হলে সে দান নিগর্ত হবে না।

দান করে আমরা আসলে যার কাছে প্রতিদান প্রার্থনা করি তিনি মহান স্রষ্টা। আল্লাহ বলেছেন, ‘তোমরা আমার কাছে প্রার্থনা করো। আমি কবুল করব।’ অর্থাৎ আল্লাহর কাছে চাওয়ায় কোনো বাধা নেই বরং এটাকেই উৎসাহিত করা হয়েছে। আর সত্যিকার অর্থে তিনিই হলেন দেয়ার মালিক। কারণ

তাঁর সব আছে। কাজেই অভাবের কথা, নিরাময়ের কথা, সমস্যামুক্তির কথা তো তাঁকেই বলতে হবে। অতএব মাটির ব্যাংকে দান জমা করে আমরা প্রার্থনা করছি স্রষ্টার কাছে। এখানে নিগর্ত দানের কোনো শর্ত লঙ্ঘন হচ্ছে না। আর দানের প্রতিদান একমাত্র স্রষ্টাই দেবেন।

প্রশ্ন : যারা ছাত্র, যাদের আয়ের কোনো উৎস নেই, তারা কীভাবে দান করবে?

উত্তর : যদি আর্থিক দান হয় তাহলে হাতখরচের টাকা থেকে দান করতে হবে। সে যদি দান করে তাহলে এটা তার জন্যে অত্যন্ত কল্যাণকর হবে। কারণ, নবীজী (স) বলেছেন, ‘একটা খেজুর যদি থাকে তাহলে খেজুরের একটা অংশ হলেও দান করো।’ এমন কোনো ছাত্র নেই যার হাতখরচ নেই, যে খরচ করে না। প্রত্যেকে খরচ করছে, নিজের আয় না থাকলেও খরচ করছে। অতএব, সেখান থেকে দান করতে হবে।

দুই নম্বর হচ্ছে, দান বলতে শুধু অর্থ বোঝায় না। শুধু অর্থ দান করতে হবে তা নয়। একটু শুভ কামনা, একটু সুন্দর ব্যবহার, একটা সুপরামর্শ, পথিককে আন্তরিক সাহায্য কিংবা পথ থেকে কলার খোসা সরিয়ে ফেলা-এ সবই হতে পারে দান।

প্রশ্ন : কোয়ান্টাম মাটির ব্যাংকের টাকা অন্য কোথাও দান করা যাবে কিনা।

উত্তর : মাটির ব্যাংকটা তো কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশনের এবং আপনি এখানে দেয়ার নিয়তেই টাকা রাখছেন। তাহলে অন্য কোথাও এটা কীভাবে দেয়া যাবে? অন্য কোথাও দেয়ার স্বাধীনতা আপনার আছে-কিন্তু মাটির ব্যাংকে রাখার পর এ টাকার হকদার ফাউন্ডেশন। সবসময় মনে রাখবেন, স্রষ্টার জন্যে যে টাকা রাখবেন, সেটা স্রষ্টার জন্যেই। এটাতে অন্য কাউকে ভাগ দেবেন না। সেটা যত ভালোর জন্যেই হোক না কেন। ফাউন্ডেশনের জন্যে দানও তেমনি।

আর মাটির ব্যাংকের টাকা ফাউন্ডেশনে দেয়ার চেয়ে ভালো জায়গা আপনি কোথাও পাবেন না। এ টাকা মানুষকে আলোকিত করার জন্যে, মানুষের কল্যাণের জন্যে পরিকল্পিত ও সম্ভবদানভাবে ব্যয় করা হয়। যেহেতু এটি যৌথ কাজ, যত টাকা জড়ো হচ্ছে সমস্ত টাকার সওয়াব আমরা সবাই পাচ্ছি। বছরে যদি পাঁচ কোটি বা ১০ কোটি টাকা আসে, সেই ৫/১০ কোটি টাকা দিয়ে যে কাজগুলো আমরা করছি, তা সদকায়ে জারিয়া। যার ফলে এই দানের পূর্ণ সওয়াব মৃত্যুর পরও আপনি পেতে থাকবেন। তাই মাটির ব্যাংকে নিজে দান জমা করবেন এবং বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়স্বজন সবাইকে নিয়মিত দান করতে উৎসাহিত করবেন।

প্রশ্ন : যখন কোনোকিছুর মানত করে মাটির ব্যাংকে টাকা রাখি, তখন যদি মনে মনে বলি, এই মাটির ব্যাংকের কারণে আমার মানত পূর্ণ হবে। তাহলে কি গুনাহ হবে না? কারণ মানত পূরণের শক্তি কেবল আল্লাহর হাতে।

উত্তর : প্রার্থনাটা খুব সহজ। হে আল্লাহ! তোমার অবহেলিত বঞ্চিত বান্দাদের কল্যাণে এবং তোমার সন্তুষ্টির জন্যে দান করছি, তুমি আমার মঙ্গল করো, আমার উপকার করো। কারণ তুমি সমস্ত দানের প্রতিদান দেবে-এই ওয়াদা তুমি করছ।

আর এতকিছু বলারও দরকার নেই। আল্লাহ

সব দেখছেন এবং সব শুনছেন। আল্লাহ! তুমি আমার সব সমস্যা দূর করে দাও-এটা সংক্ষেপে ভাবলেই চলবে। সবসময় মনে রাখবেন, আপনি যা চিন্তা করছেন এটা আপনার প্রভুও একইভাবে বুঝতে পারছেন। তাকে অত ভেঙে বলার কোনো দরকার নেই।

প্রশ্ন : আমি নিজে মাটির ব্যাংকে দান করি। কিন্তু এর কথা অন্যদের কাছে বলার ব্যাপারে কিছু দ্বিধা-সংকোচ রয়েছে। এক্ষেত্রে কী করণীয়?

উত্তর : মাটির ব্যাংকে দানের টাকা রাখার ব্যাপারে অন্যদের উদ্বুদ্ধ করতে দ্বিধা-সংকোচ থাকার কোনো যুক্তি নেই। কারণ এর মাধ্যমে আপনি একদিকে ধর্মের নির্দেশ পালন করছেন, অন্যদিকে তার উপকার করছেন। সূরা ফজরের ১৬-২০ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে- ‘প্রতিপালক যখন পরীক্ষা করার জন্যে কারো রিজিক সংকুচিত করেন, তখন সে বলে, আমার প্রতিপালক আমাকে অসম্মান করেছেন। তখন আল্লাহ বলেন, না, একথা সত্য নয়। আসলে (এটা তোমাদের কর্মফল) তোমরা এতিমের প্রতি সম্মানজনক আচরণ করো না, অভাবী অসহায়কে অনুদানে পরস্পরকে উৎসাহিত করো না... ধনসম্পত্তির প্রতি তোমাদের আকর্ষণ আসক্তিতে পরিণত হয়েছে।’

অর্থাৎ শুধু নিজে দান করা নয়, এই দানে অন্যদেরকেও উৎসাহিত না করলে আপনার রিজিক সংকুচিত হবে, আপনি অভাবগ্রস্ত হবেন। ঋণবোঝে বলা হয়েছে, ‘এসো প্রভুর সেবক হই। গরিব ও অভাবীদের দান করি।’ অর্থাৎ গরিব ও অভাবীকে দান করা ঈশ্বরের সেবা করা।

আপনি আপনার কোনো ব্যক্তিগত লাভের জন্যে মাটির ব্যাংকের কথা অন্যকে বলছেন না বরং এর মাধ্যমে আপনি তারই উপকার করতে চান। সেটা কীভাবে-প্রথমত, আপনি তাকে সঠিকভাবে দান করার সুযোগ করে দিচ্ছেন ও তার বৈষয়িক সমৃদ্ধি আনয়নে সাহায্য করছেন। দ্বিতীয়ত, এর মাধ্যমে আপনি তার কাছে জীবনযাপনের বিজ্ঞানের বাণী পৌঁছে দেয়ার সুযোগ পাচ্ছেন।

আর এভাবে তার দৈহিক মানসিক পারিবারিক ও আত্মিক সমৃদ্ধিতেও আপনি ভূমিকা রাখছেন। যেমন, আপনি প্রথম কাউকে একটি মাটির ব্যাংক দিলেন এবং তাকে দান করতে উদ্বুদ্ধ করলেন। পরের বার তার সঙ্গে দেখা হলে তার স্বাস্থ্যের খোঁজখবর নিন, তার সমস্যার কথা শুনুন এবং জীবনযাপনের বিজ্ঞানের আলোকে তাকে পরামর্শ দিন এবং তা অবশ্যই আন্তরিকতা, মমতা ও সহানুভূতির সাথে। মূলত মাটির ব্যাংকের মাধ্যমে আপনি তাকে সংকোচ সম্পূর্ণ করছেন, আলোকিত করছেন।

কাজেই মাটির ব্যাংকের ব্যাপারে সমস্ত লজ্জা, সংকোচ ঝেড়ে ফেলতে হবে। কারণ একজন মানুষকে বালা-মুসিবত থেকে মুক্ত ও আলোকিত করার মতো পুণ্যময় কাজটিই আপনি করছেন।

এ মাসের অটোসাজেশন

আমি জানি, দাতার কখনো অভাব হয় না। দাতার জীবনেই আসে স্থায়ী সুখ।
আমি দাতা হবো।

সৃষ্টির সেবায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দান জমা করুন মাটির ব্যাংকে

আপনার কল্যাণ হোক ॥ কল্যাণ করুন মানুষের

মারাত্মক সড়ক দুর্ঘটনায় হাইওয়ের মাঝখানে আমার গাড়ি নিয়ন্ত্রণ হারায়। তিন বার ডিগবাজি খেয়ে উল্টে যায়। সাধারণত এমন দুর্ঘটনায় পেছনের গাড়ি এসে চাপা দেয়। অথচ, আমি সম্পূর্ণ অক্ষত এবং গাড়িরও তেমন কিছু হয় নি। আমার বিশ্বাস, মাটির ব্যাংকে দানের ফলেই স্রষ্টা অকল্যাণ থেকে বাঁচিয়ে দিলেন।

মো. ইয়াছিন আহমদ চৌধুরী • ব্যবসায়ী। ১০৮ ব্যাচের গ্রাজুয়েট

কোর্স করার পরে মনছবি করলাম ৩.৫ সিজিপিএ অর্জন করব। প্রতিটি পরীক্ষার আগে মাটির ব্যাংকে টাকা রেখে হলে যেতাম। এছাড়াও সেমিস্টার ফাইনালের জন্যে আলাদা করে দান করতাম। প্রত্যাশার চেয়েও আমার রেজাল্ট ভালো হলো। ৩.৫৫ সিজিপিএ নিয়ে বিবিএ পাশ করলাম।

মো. সাঈদুজ্জামান • শিক্ষার্থী। ৩২৯ ব্যাচের গ্রাজুয়েট

আমার মেয়ে হঠাৎ অ্যাপেনডিসাইটিসের তীব্র ব্যথায় আক্রান্ত হলো তার এসএসসি পরীক্ষার আগে। ডাক্তার অপারেশন করতে বললেন। মাটির ব্যাংকে মানত করলাম। হিলিংয়ে নাম দেয়া হলো। হাসপাতালে ভর্তি করানোর চার দিন পর অপারেশন ছাড়াই সে সুস্থ হয়ে বাসায় ফিরল এবং সবগুলো পরীক্ষাই দিল। স্রষ্টার অসীম কৃপায় সে এসএসসি-তে জিপিএ ফাইন পেয়েছে।

অপর্ণা রায় • গৃহিণী। ২৭৫ ব্যাচের গ্রাজুয়েট

আমার সহকর্মী ও বন্ধুদের অনেকেই বিভিন্ন শারীরিক মানসিক জটিলতায় ভুগছেন। চিকিৎসার পেছনে খরচ হচ্ছে লক্ষ লক্ষ টাকা। কোর্স করার পর থেকে আমি প্রতিদিন দান করি। এর বদৌলতে স্রষ্টা আমার পরিবারের সবাইকে সুস্থ রেখেছেন। এমনকি ৭৩ বছর বয়সেও আমার বাবা টেনশনমুক্ত, রোগমুক্ত। পারিবারিক প্রশান্তিও আগের চেয়ে বেড়েছে।

এশ্বিনী চয়ন অধিকারী • এল্লিকিউটিভ, স্কয়ার ইনফরমেটিভ লি। ৩২৪ ব্যাচের গ্রাজুয়েট

অনার্সের সার্টিফিকেটে নামের বানান ভুল এলো। রেজিস্ট্রার অফিস থেকে জানাল এফিডেভিট করতে হবে। নিয়ত করলাম এফিডেভিট প্রয়োজন না হলে সেই টাকা মাটির ব্যাংকে দান করব। দীর্ঘদিন ধরে ঝুলে থাকা কাজটি খুব সহজে হয়ে গেল।

জোহরা আক্তার সেবি • শিক্ষার্থী। ৩৭৫ ব্যাচের গ্রাজুয়েট

এক ভদ্রমহিলার ছেলে ১০-১২ দিন ধরে নিখোঁজ শুনে তাকে নিয়ত করে দানের পরামর্শ দিলাম। মাটির ব্যাংক নেয়ার ৫-৭ মিনিট পর তিনি হাসিমুখে জানালেন, তার ছেলে এইমাত্র ফোন করে জানিয়েছে, সে ভালো আছে। সৎদানের এত দ্রুত কার্যকারিতা দেখে সেদিন বিস্মিত হয়েছিলাম।

নাজমুন নাহার • গৃহিণী। ৩৬০ ব্যাচের গ্রাজুয়েট

চার তলা বিল্ডিং নির্মাণের জন্যে পাইলিংয়ের সকল প্রস্তুতি শেষ করলাম। কিন্তু টিউবওয়েলে পানি উঠছে না। মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ার অবস্থা। সাথে সাথে মাটির ব্যাংকে দান করলাম। একটু পরে ফোরম্যান জানাল, একটি বড় গর্তে বৃষ্টির পানি জমে আছে। তা দিয়ে কাজ শুরু হলো। প্রতিদিন যে পরিমাণ পানি খরচ হতো, রাতে বৃষ্টিতে তা পূর্ণ হয়ে যেত। নির্দিষ্ট সময়ের পাঁচ দিন আগেই কাজ সম্পন্ন হলো।

মো. আইয়ুব আলী • ঠিকাদার। ১৬৮ ব্যাচের গ্রাজুয়েট

গত বছর দুই সন্তানের ভর্তি পরীক্ষা ছিল। ভাইভা-তে ছেলেরা কোনো কথাই বলল না। মেয়েকে নিয়েও দুশ্চিন্তায় ছিলাম। তার ওপর লটারি সিস্টেম। দুই সন্তানের সাফল্যের নিয়তে ১০ হাজার টাকা মাটির ব্যাংকে দান করলাম। লটারিতে সবার আগে আমার ছেলের নাম উঠল। মেয়েও মনোনীত হলো। খবর শুনে আমার ভাগ্নি আমার দুই সন্তানকে ১০ হাজার টাকা উপহার দিল। অর্থাৎ যে টাকা দান করেছিলাম তার পুরোটাই আল্লাহ ফেরত দিলেন।

দেলোয়ার মো. নুরুল করিম • ব্যবসায়ী। ২৪২ ব্যাচের গ্রাজুয়েট

দেশের যে-কোনো প্রান্তে কোনো অসহায় অনাথ এতিম শিশুর সন্ধান পেলে এবং শিশুটির অভিভাবকত্ব কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশনের কাছে হস্তান্তর করতে চাইলে যোগাযোগ করুন এই নম্বরে :

০১৮৪৮-৩১৮৫০৫-৬, ০১৮৪৮-৩১৮৬১৩

সংযোগায়ন সেল, কোয়ান্টাম শিশুকানন, কোয়ান্টাম, লামা, বান্দরবান

আমার মা দুবছর ধরে রক্তক্ষতায় ভুগছিলেন। অনেক পরীক্ষা করেও রক্তক্ষতার কারণ ধরা পড়ল না। কিছুদিন পর অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হলেন। হিলিংয়ে নাম দিলাম ও মাটির ব্যাংকে দান করলাম। স্রষ্টার রহমতে এবার কারণ জানা গেল। পাকস্থলীতে ছোট ছিদ্র ও ডায়াবেটিস। চিকিৎসার পর এখন তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ, ডায়াবেটিসও নিয়ন্ত্রণে। তাকে আর রক্ত নিতে হয় না।

মো. রাজু আহমদ • খণ্ডকালীন প্রভাষক, খুলনা পাবলিক কলেজ। ৩৩৬ ব্যাচের গ্রাজুয়েট

আমার ছেলে স্কুলে যেতে ভয় পেত। তার মনোযোগ বৃদ্ধি ও স্কুলভীতি দূর হওয়ার নিয়তে মাটির ব্যাংকে নিয়মিত দান করতাম। ক্লাস ফাইভে নতুন স্কুলে ভর্তি হয়ে শিক্ষক ও সহপাঠীদের সাথে সে চমৎকারভাবে মানিয়ে নিল। ধীরে ধীরে দানের পরিমাণও বাড়িয়ে দিলাম। প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষার আগে আমার এক মাসের পুরো বেতন মাটির ব্যাংকে দান করলাম। জিপিএ ফাইন পেয়ে সে উত্তীর্ণ হলো।

আয়শা জুবায়রা আফরোজ • সিনিয়র ম্যানেজার, পদ্মা ইসলামী লাইফ ইন্সুরেন্স কোম্পানি লি। ১০০ ব্যাচের গ্রাজুয়েট

দুজন ছিনতাইকারী একদিন আমার ব্যাগ ছিনিয়ে নেয়। ব্যাগে আইপ্যাড ছিল। প্রাণে তো বেঁচে গেছি! এই শুক্রিয়া আদায় করে দানের পরিমাণ বাড়িয়ে দিলাম। ছয় মাস পরে ছিনতাইকারী নিজে ফোন করে বলল, আইপ্যাডটি ফেরত দিতে চায়। তার সহকারী মারা যাওয়ার পর সে ভুল বুঝতে পেরেছে! তাই সে এখন জিনিস ফিরিয়ে দিতে চাচ্ছে।

ডা. সাহিয়া শারমীন • ১০০ ব্যাচের গ্রাজুয়েট

বীমা প্রতিষ্ঠান থেকে দেয়া ১০টি চেক হারিয়ে ফেললাম। অনেক খুঁজেও পেলাম না। ফটোকপিও ছিল না। খোঁজ নিয়ে জানলাম টাকা পাব। তবে বছর দুয়েক লাগবে। তখন মানত করলাম, চেকগুলো ফেরত পেলে বড় অঙ্কের টাকা মাটির ব্যাংকে দান করব। কাগজপত্র জমা দিলাম। এর কিছুদিন পর চেক থেকে যা পেতাম তার চেয়েও বেশি অর্থ একটি কেস থেকে পেয়ে গেলাম। যা আমার ওকালতি জীবনের সর্বোচ্চ উপার্জন। সেখান থেকেই মানতের টাকা দান করলাম। আল্লাহর রহমতে সেদিনই চেকগুলো ফেরত পাওয়ার সংবাদ পেলাম।

মো. গোলাম রব্বানী • এডভোকেট, সুপ্রিম কোর্ট। ৩৪৩ ব্যাচের গ্রাজুয়েট

আমার ভাস্করের মেয়ে জন্মের ছয় ঘণ্টার মাথায় নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হলো। লাইফ সাপোর্টে ছিল তিন দিন। বাচ্চাটির সুস্থতার নিয়তে প্রতিদিন দান চালিয়ে গেলাম। ২২ দিন হাসপাতালে থাকার পরে স্রষ্টার রহমতে সে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরল। আমার বিশ্বাস দানের ফলেই এই বিপদ কেটে গেল।

রুফসানা করিম মুক্তি • নাট্যকর্মী, ৩৪৩ ব্যাচের গ্রাজুয়েট

আমার ছেলে অস্ট্রেলিয়ায় চিকিৎসাবিদ্যায় উচ্চতর পড়াশোনা করছে। সে ফোন করে জানাল পরীক্ষা ও কোচিংয়ের ফি মিলিয়ে সাড়ে পাঁচ হাজার ডলার লাগবে। এত টাকা কোথায় পাব! শুকে ধৈর্য ধরতে বললাম। আর মাটির ব্যাংকে সাধ্যমতো দান করলাম। দুদিন পর ছেলে ফোন করে বলল কোচিং থেকে তাকে বৃত্তি দিয়েছে। কোনো টাকা লাগবে না।

জামিলা আক্তার লিলি • গৃহিণী। ৩০০ ব্যাচের গ্রাজুয়েট

যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও টাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইএলটি কোর্সে ভর্তি হতে পারছিলাম না। নিয়মিত দান করতে লাগলাম। স্রষ্টার রহমতে শেষ মুহূর্তে মনোনীত হলাম। কিন্তু কর্মক্ষেত্রে স্টাডি লিভের অনুমতি আটকে গেল। কোর্স চলাকালে যে বেতন পাব, তা থেকে মাটির ব্যাংকে অগ্রিম দান করলাম। কিছুদিন পরই বেতনসহ স্টাডি লিভের অনুমতি পেয়ে গেলাম।

দিলারা আক্তার • সহকারী শিক্ষক, বিপিন রায় সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। ৭৫ ব্যাচের গ্রাজুয়েট

আমার মেয়ে তিন বছর ধরে একটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করত। কোনো কারণ দর্শানো ছাড়াই কর্তৃপক্ষ তাকে ক্লাস দেয়া বন্ধ করে দেয়। এই সমস্যার যেন সমাধান হয় এই নিয়তে দান অব্যাহত রাখলাম। গত মাস থেকে সে আবার নিয়মিত ক্লাস নিতে শুরু করেছে।

রাইসুল আমিয়া • গৃহিণী। ৩৩৭ ব্যাচের গ্রাজুয়েট



শেচ্ছা রক্তদান কার্যক্রম

ল্যাব প্রতিষ্ঠার ১৫ বছরে কোয়ান্টাম শেচ্ছা রক্তদান কার্যক্রম সরবরাহ করেছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা নির্ধারিত মানের ৭,৩৯,৫৫৭ ইউনিট বিশুদ্ধ রক্ত ও রক্ত উপাদান। কোয়ান্টাম গড়ে তুলেছে ৩৮,৪৩৪ জন আজীবন রক্তদাতাসহ ২,৬০,১৬৫ জন রক্তদাতার সুসংগঠিত ব্লাড ডোনর পুল। ২০১৪ সালে অগ্নিদগ্ধ রোগীদের চিকিৎসায় বার্ন ইউনিটে ২০,৮৮৪ ইউনিট ফ্রেশ ফ্রোজেন প্লাজমা সরবরাহ করেছে কোয়ান্টাম ল্যাব। সারা বছর দিনরাত ২৪ ঘণ্টা আন্তরিক সেবা, আধুনিক প্রযুক্তি ও আপোসহীন মান নিয়ন্ত্রণ কোয়ান্টাম শেচ্ছা রক্তদান কার্যক্রমকে পরিণত করেছে দেশের লাখে বিপ্লবের ভরসাস্থলে।



চিকিৎসাসেবা

এ পর্যন্ত মোট ১,২৫,২৪৮ জন কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশনের চিকিৎসাসেবা গ্রহণ করেছে। ১৯৯৯ সালে ফাউন্ডেশন ঢাকার মিরপুর, চানখাঁরপুল এবং শ্যাওড়াপাড়ায় সাপ্তাহিকভাবে বিনামূল্যে চিকিৎসাসেবা কার্যক্রম চালু করে। লামায় কোয়ান্টাম চিকিৎসাসেবা কেন্দ্রে ২০০০ সাল থেকে প্রতি বছর বিভিন্ন বয়সের পাহাড়ি-বাঙালিকে বিনামূল্যে চিকিৎসাসেবা ও ওষুধ দেয়া হচ্ছে। ২০১৪ সালে একটি ক্যাম্পে ৯৩ জন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের কাছ থেকে সেবা গ্রহণ করেন ৪,২১৯ জন রোগী। ঢাকার কুড়িল, মোহাম্মদপুর, মিরপুর, চট্টগ্রামের আশাবাদ, রাজশাহীসহ দেশব্যাপী মেডিকেল ক্যাম্পে সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের বিনামূল্যে চিকিৎসা পরামর্শ ও ওষুধ দেয়া হয়। এছাড়া মিরপুরে গৃহকর্মীদের নিয়মিত চিকিৎসাসেবা প্রদান করা হয় বিনামূল্যে।



দারিদ্র্য বিমোচন ও স্বনির্ভরায়ন কার্যক্রম

বঞ্চিত ও দুস্থ মানুষের দারিদ্র্য বিমোচনে ১৯৯৬ সালে কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন গঠন করে যাকাত ফান্ড। ২০১৪ সালে এ ফান্ডে জমা পড়েছে ৬,৫২,৪৮.৬৯৬ টাকা। যাকাত ফান্ডের অর্থে ২০১২-২০১৪ সালে ৬,১৯৭ জনকে পুনর্বাসিত করা হয়েছে। স্বনির্ভরায়ন কার্যক্রমের আওতায় কুমিল্লায় গত দেড় বছরে ১০টি ব্যাচে ২০০ জন মহিলাকে সেলাই প্রশিক্ষণ ও ১২০টি সেলাই মেশিন প্রদান করা হয়। তাদের পরিবার এখন হয়ে উঠেছে সচ্ছল। এছাড়াও পরিচালিত হচ্ছে বিভিন্ন ফলজ প্রকল্প (আম, কাঁঠাল, আনারস ও জলপাই), প্রাণী ও পশুসম্পদ প্রকল্প (বিভিন্ন প্রজাতির মাছ, হাঁস, মুরগি, গরু বেঙ্গল ও উন্নত জাতের ছাগল এবং ভেড়া), দরিদ্র শিক্ষার্থীদের শিক্ষাবৃত্তি প্রদান, ঋণমুক্তি, কর্মসংস্থান প্রকল্প।



দাফন কার্যক্রম

বেওয়ারিশ অথবা দাফনে অক্ষম দরিদ্রের মৃতদেহ পূর্ণ ধর্মীয় মর্যাদায় দাফন বা সংকারের জন্যে ২০০৪ সালে শুরু হয় দাফন কার্যক্রম। এ পর্যন্ত মমতাপূর্ণ শেষ বিদায় জানানো হয়েছে ৩৫১ জনকে।



বিশুদ্ধ পানি কার্যক্রম

১৯৯৯ সাল থেকে এ পর্যন্ত ৯২টি পানির ট্যাংক, ১৯৬টি টিউবওয়েল ও ২টি হাঁদারা স্থাপিত হয়েছে দেশের উপকূলীয় ও পাহাড়ি এলাকায়। বিশুদ্ধ পানি পান করতে পারছেন পথচারী ও স্থানীয় অধিবাসীসহ হাজারো মানুষ।



কোয়ান্টামে ভ্যালি হিকমানে গড়ে উঠেছে এক অনন্য শিক্ষাঙ্গন। হাইস্কুল শাখার জন্যে একাডেমিক ভবনে রয়েছে নয়টি বৃহৎ শ্রেণিকক্ষ, প্রশাসনিক ভবন ও কম্পিউটার ল্যাব। কলেজ শাখার কোয়ান্টাদের জন্যে নির্মিত নতুন ভবনে রয়েছে ছয়টি বৃহৎ শ্রেণিকক্ষ। এছাড়াও হিকমান ক্যাম্পাসে গড়ে তোলা হয়েছে ৪,৮০০ বর্গফুটের সুপারিসর ছাত্রাবাস, চার শিশুর একসাথে বসে খাবার গ্রহণের উপযোগী নেয়ামাতান এবং শিক্ষক-শিক্ষিকাদের জন্যে পৃথক পৃথক আবাসন।



২০০৫ সালে শুরু হওয়া মাতৃমঙ্গল কার্যক্রমে এ পর্যন্ত সেবা নিয়েছেন ২,১২০ জন দুস্থ সন্তানসম্ভবা মা। তাদের গর্ভকালীন পুষ্টি, কাউন্সেলিং, মেডিকেল চেক-আপ, ওষুধ ও সন্তান প্রসবের পরবর্তী ৪০ দিন পর্যন্ত প্রয়োজনীয় ব্যয়ভার বহন করা হচ্ছে।



২০০৫ সালে কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন শুরু করে খতনা কার্যক্রম। দরিদ্র শিশু-কিশোর ও আর্থিক অসচ্ছলতার কারণে খতনার সুযোগবঞ্চিত পূর্ণবয়স্ক পুরুষরাও এ সেবা পেয়ে থাকেন। এ পর্যন্ত খতনা সেবা দেয়া হয়েছে ১,২৭,৪০৭ জন দুস্থ অসহায় শিশু-কিশোর এবং পূর্ণ বয়স্ক মানুষকে।



রাজধানী ঢাকা শহরের পরিচ্ছন্নতা কর্মীদের সন্তানদের জন্যে প্রতিষ্ঠিত স্কুল 'রাজধানী আদর্শ বিদ্যাপীঠ'-এর সার্বিক পরিচালনার দায়িত্ব এ বছর থেকে গ্রহণ করেছে কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন। বর্তমানে এই স্কুলে পড়াশোনা করছে ১৮৮ জন শিক্ষার্থী।



আত্মীয়-পরিজনহীন অসহায় বৃদ্ধদের নিয়ে বান্দরবানের রাজবিলায় ২০১২ সালে স্থাপিত হয় 'আশ্রয়মম'। বর্তমানে তিন জন পুরুষ ও তিন জন নারী সেবাার্থীকে এখানে সার্বক্ষণিক সকল ধরনের প্রয়োজনীয় পরিচর্যা প্রদান করা হচ্ছে।